সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আমার জীবনানন্দ
আবিষ্কার ও অন্যান্য

আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য

যে-কোনও ধরনের গদ্যরচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে মায়ামুগ্ধ করে রাখতে পারেন। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের আশ্চর্য নির্মিতি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। বিপুল পরিমাণ কথাসাহিত্য ছাড়াও তিনি এ যাবৎ যেসব অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, সেগুলিও এক-একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিভিন্ন সময়ে লেখা, বিভিন্ন বিষয়ের সেইসব রচনা নামী-অনামী পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অগ্রন্থিত এইসব লেখা থেকে বাছাই করে বত্রিশটি ছোট-বড় রচনা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রচনাগুলি মূলত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কিংবা বিস্মৃত স্রষ্টা ও তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির বাণীরূপ। অন্তরঙ্গ স্মৃতির ছোঁয়ায় প্রতিটি রচনা প্রাণবন্ত। স্বচ্ছন্দ অনায়াস গদ্যের নিবিড় স্পর্শে আদ্যন্ত সুখপাঠ্য। একই সঙ্গে আবার বহু অজানা স্মৃতিরঙ্গের ঝলকে উদ্ভাসিত। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম চক্রবর্তী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কাজী নজরুল ইসলাম, জগদীশ গুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ আরও অনেকের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রীতি, ভাললাগা এবং ভালবাসার অকৃত্রিম আত্মকথন ধরা রইল এই ভিন্নস্বাদের গ্রন্থে।

ISBN 81-7215-960-9

আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে। ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

প্রয়াণ: ২৩ অক্টোবর ২০১২

প্রচ্ছদ □ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩

ISBN 81-7215-960-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

AMAR JIBANANANDA ABISHKAR O ANYANYO
[Essay]
by
Sunil Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

নিবেদিতা রায় ও
অমিতাভ রায়-কে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের

অন্যান্য বই

•

অর্ধেক জীবন

ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ

ছবির দেশে কবিতার দেশে

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা ও প্রবন্ধ লিখেছি, তার বেশিরভাগই অগ্রন্থিত হয়ে আছে। এই গ্রন্থে শুধু নানান লেখকদের সম্পর্কে রচনাগুলিই সংকলিত হয়েছে। তবে সেই সব লেখকদের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির বিশ্লেষণ এসব লেখায় নেই, সে কাজ আমার নয়। আমার রচনাগুলি কিছুটা স্মৃতিমূলক এবং আলোচ্য লেখক ও তাঁদের কিছু কিছু লেখা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতিফলন। একই লেখককে নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে একাধিকবার লিখেছি, যেমন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, কমলকুমার মজুমদার, সমরেশ বসু বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেইজন্য কিছু কিছু পুনরুক্তি থেকে গেছে, সেগুলি বাদ দিইনি, কেননা উক্ত লেখকদের সম্পর্কে ঐ কথাগুলিই হয়তো আমি জোর দিয়ে বলতে চাই।

রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, শুধু জগদীশ গুপ্ত-সতীনাথ-কমলকুমার-এর ছোটগল্প বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্মারক বক্তৃতা উপলক্ষে রচিত। নজরুল সম্পর্কে ক্ষুদ্র রচনাটি একেবারে শেষে স্থান দিয়েছি বিশেষ কারণে। এটি প্রবন্ধ বা আলোচনা বা স্মৃতিকথা, কিছুই নয়, অন্য লেখাগুলির সঙ্গে কোনও মিলই নেই, উদ্ভট ধরনের রম্যরচনা বলা যেতে পারে, ষাটের দশকে নজরুলের জীবদ্দশায় লিখেছিলাম। রচনাটি হারিয়ে যেতে দিতে চাই না বলেই এই বইতে যুক্ত রইল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার

আমার স্কুল জীবনে জীবনানন্দ দাশ নামে কোনও কবির রচনা পাঠ দূরে থাক, নামও শুনিনি। আমার কৈশোর ছিল প্রধানত গদ্যবিহারী, তার কারণও ছিল। পড়ার ক্ষুধা ছিল প্রবল। কিন্তু বই কেনার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং অতিমাত্রায় লাইব্রেরি-নির্ভর। তখনকার অধিকাংশ লাইব্রেরিতেই কবিতার বই রাখার রেওয়াজ ছিল না। নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্য দু'চারজন কবিকে স্থান দেওয়া হলেও সেই সব কবির মধ্যে নজরুল ইসলামই ছিলেন কনিষ্ঠতম। জীবনানন্দ দাশ নজরুলের সমবয়স্ক হলেও তখন প্রায় অজ্ঞাত।

আমাদের পরিবারে কবিতার কোনও আবহাওয়া ছিল না। সদ্য দেশবিভাগে বিপর্যস্ত শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় বাবা-জ্যাঠারা সব সময় ব্যতিব্যস্ত। এর মধ্যে কবিতার স্থান হবে কী করে ? অন্নচিন্তা চমৎকারা কা তরে কবিতা রুথঃ। আমার বাবার সংগ্রহে কয়েকখানি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ছিল, (তার মধ্যে টেনিসনের কাব্যসংগ্রহ অন্যতম, যে বইটি আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছে একসময়) তিনি বাংলা কবিতার ধার ধারতেন না। অন্য বইও পড়ার সময় পেতেন না বিশেষ। একমাত্র আমার মায়ের ছিল গল্পের বই পড়ার নেশা। তাঁর জন্য পাড়ার লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রতিদিন দু'খানি করে গল্প-উপন্যাস আমাকেই এনে দিতে হত। আমাদের স্কুলে যে ছোট লাইব্রেরিটি ছিল তার সমস্ত শিশু-কিশোর-পাঠ্য বই ততদিনে আমি একাধিকবার পড়ে শেষ করে ফেলেছি। তখনও খিদে লকলক করছে, তাই মায়ের জন্য আনা বইগুলিও পড়তে শুরু করি। ছোট বয়েসেই বড়দের বই পড়তে কোনও অসুবিধে বোধ করিনি, বরং যেন নিষিদ্ধ গোপন আনন্দের স্বাদ পাই। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় থেকে প্রবোধকুমার সান্যাল পর্যন্ত কোনও লেখককেই বাদ দিইনি। স্কুলজীবন শেষ করার আগেই আমি বুদ্ধদেব বসুর অনেকগুলি উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। কিন্তু তিনি যে প্রধানত একজন কবি, তা আমাকে বলে দেয়নি কেউ।

অবশ্য একেবারে কবিতা-বর্জিত ছিল না সে বয়েস। শৈশবে একজন মাস্টারমশাই কেন যেন মনে করেছিলেন, আমার মধ্যে এক আবৃত্তিকার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। তিনি ছিলেন নজরুলের ভক্ত, প্রায় জোর করেই নজরুলের বেশ কয়েকটা কবিতা মুখস্থ করিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। বিভিন্ন পাড়ায় জলসায় তিনি আমাকে মঞ্চে উপস্থিত করাতেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবৃত্তিকার হিসেবে আমার বেশ খ্যাতি হয়েছিল। দু'একটা মেডেল টেডেলও পেয়েছিলাম। তা আমার প্রতিভার গুণে নয়, শিশুশিল্পী হিসেবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটা আট-ন'-বছরের গুটগুটে ছেলে হাত-পা ছুঁড়ে লম্বা লম্বা কবিতা মুখস্থ বলে যাচ্ছে, এতেই শ্রোতারা হাততালি দিত।

দু'এক বছরের মধ্যেই ও ব্যাপারে আমার উৎসাহ চলে যায়। সেই মাস্টারমশাই ডাকতে এলে ছাদে জলের ট্যাঙ্কের পাশে লুকিয়ে থাকতাম। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হতেই দারুণ লাজুকতা আমাকে পেয়ে বসে। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে কোথাও কোনও বই আছে কিনা খুঁজে নিয়ে সেই বইতে বিভোর হয়ে বসে থাকতাম এক কোণে। সেই রকমই কোনও একটা বাড়িতে পেয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'। স্কুলে প্রত্যেক বছরই পাঠ্যবইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থাকত কয়েকটি, তার বাইরের রবীন্দ্র-পাঠ সেই আমার প্রথম, তখন খুব সম্ভবত আমার ক্লাস এইট-বয়েস। কেন যে সঞ্চয়িতাকে প্রথমেই অত ভাল লেগে গেল জানি না। মনে হল, এ একটা মণি-মাণিক্যের খনি। এই বই আমার চাই-ই চাই। সাত-আট টাকা দিয়ে বই কেনার সাধ্য আমার ছিল না। হাতখরচ পেতাম মাত্র চার পয়সা।

চুরি করে কিংবা কারও কাছ থেকে ফেরত দেব বলে নিয়ে এসে না দিয়ে কিংবা যে প্রকারেই হোক সঞ্চয়িতা একটি সংগ্রহ করেছিলাম ঠিকই। তারপর পাগলের মতন কবিতাগুলি মুখস্থ করতে শুরু করি। পুরো সঞ্চয়িতাই আমার অনেকদিন মুখস্থ ছিল। অতখানি রবীন্দ্র-আসক্তির অন্য একটি কারণও ছিল। পরের বছর যে কিশোরীটির সঙ্গে আমার প্রণয়সখ্য হয়, সে ছিল খুবই রবীন্দ্র-অনুরাগিণী। কথায় কথায় বা চিঠিতে সে প্রচুর রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিত, তার উদ্ধৃতির পরের লাইনগুলি বলে দিতে পেরে আমি পৌরুষের শ্লাঘা বোধ করতাম।

স্কুলে আমার সহপাঠী দীপক মজুমদার সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে আমার চেয়ে অনেক বেশি অবহিত ছিল। আমি যাদের চিনি না এমন লেখক, যেমন জগদীশ গুপ্ত, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামও তার মুখে আমি শুনেছি। (দীপকও এরকম আরও অনেকে নামই ভাল জানত, বই বিশেষ পড়ত না) কিন্তু জীবনানন্দ দাশের কথা সে কখনও বলেনি। আধুনিক কবিতা ব্যাপারটাই যেন ছিল কোনও গোপন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংকেতিক প্রচার-পত্রের মতন। অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে ঠাট্টা- তামাশার বিষয়। কলেজে এসেও কিছু কিছু ছাত্রর কাছে বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র কথা শুনেছি, জীবনানন্দের নাম সেই তুলনায় কম উচ্চারিত। অধ্যাপকরা আধুনিক কবিতা বিষয়ে মশকরা করার সময় জীবনানন্দ দাশ নামে এক কবির দু'এক লাইন উদ্ধৃতি দিতেন। এমনকী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতন তৎকালে অত জনপ্রিয় লেখক এবং অধ্যাপকও 'সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস', এই উদ্ধৃতি দিয়ে ছাত্রদের হাসাতেন খুব।

সেই ১৯৫১-'৫২ সালে জীবনানন্দ দাশ থাকেন কলকাতার বাইরে, খড়্গপুরের কলেজের একজন লেকচারার। তাঁর বইগুলি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাকুল্যে বই বেরিয়েছে মাত্র পাঁচটি (তার মধ্যে একটি ষোলো পৃষ্ঠার), সেই সময় 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' এর কোনওটিই ছাপা নেই, শুধু পাওয়া যায় 'সাতটি তারার তিমির'। অর্থাৎ তিনি একখানি বইয়ের কবি।

জীবনানন্দের কবিতাকে প্রথম প্রকৃত মর্যাদা দেয় সিগনেট প্রেস। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত বাংলা

কবিতার জন্য যেসব অসাধারণ কাজ করেছেন, তার ইতিহাস একদিন লেখা হবে নিশ্চিত। সেই সময়ের শিশুরা সুকুমার রায়ের কবিতাও পড়ত না, তার কারণ, সুকুমার রায়ের কোনও বই-ই পাওয়া যেত না, কোনও প্রকাশক পুনর্মুদ্রণের কথা চিন্তাও করেননি। সিগনেট প্রেস থেকে 'আবোল-তাবোল'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরেই সুকুমার রায় প্রত্যেক বাংলাভাষীর অবশ্যপাঠ্য। সুকুমার রায়ের অগ্রন্থিত কবিতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর নতুন বই 'খাই খাই'। সেইসঙ্গে 'পাগলা দাশু' ও নাটকগুলি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও এইভাবে পুনরাবিষ্কৃত হন।

ছাত্রবয়েসে দিলীপকুমার গুপ্তর গৃহশিক্ষক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এই শিক্ষক পাওয়া ক'জন ছাত্রের ভাগ্যে ঘটে? সেইজন্যই দিলীপকুমার গুপ্তর, সংক্ষেপে যাঁকে ডি-কে বলে সবাই ডাকত, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চরুচি ছিল। বিশেষ ভালবাসতেন কবিতা, আধুনিক কবিতাকে সসম্মানে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তিনি।

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কবিতার বইও প্রকাশ করতেন তাঁর সমসাময়িক কবিদের। মাত্র ষোলো পৃষ্ঠার চটি বই, দাম চার আনা বা ষোলো পয়সা। অর্থাৎ এক পাতার দাম এক পয়সা, সেইজন্যই সিরিজটির নাম 'এক পয়সায় একটি'। সেইভাবে বেরিয়েছিল জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। ছিল মাত্র ১২টি কবিতা। ছাপা বাঁধাই কিছুই ভাল নয়। যথারীতি কিছুদিনের মধ্যেই সে বই অবলুপ্ত হয়ে যায়। ডি-কে সেই বইটি খুঁজে বার করে তার সঙ্গে আরও ১৮টি কবিতা জুড়ে, অসাধারণ মুদ্রণ-সৌকর্যে, সত্যজিৎ রায়-কৃত প্রচ্ছদপটে প্রকাশ করলেন 'বনলতা সেন'-এর নতুন সংস্করণ। দাম দু' টাকা। পাতা-জোড়া জোড়া বিজ্ঞাপন দিলেন পত্রপত্রিকায়। অনেকেই জীবনানন্দ দাশকে সেই প্রথম চিনল। এই বইয়ের বিজ্ঞাপনের কপিতে এই কবির কবিতাকে যে রবীন্দ্রনাথ চিত্ররূপময় বলেছিলেন, সেই সার্টিফিকেট জুড়তে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত, কল্লোলের কবিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্র-প্লাবনে আচ্ছন্ন ছিল বাংলা সাহিত্য। তার মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো ছিল কোনও কবির পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমাকে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রথম দীক্ষা দেয় আমার কলেজের দুই সহপাঠী, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং শিবশম্ভু পাল। ইদানীংকালের সার্থক নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তখন ছিল কবি। শিবশম্ভুও প্রচুর কবিতা লিখেছে। দু'জনেই খুব পড়ুয়া। তখন বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-ই আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়, দু'জনে দুটি গোষ্ঠীর অধিপতি, যাদের বলা হয় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এমনকী প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত প্রমুখর লেখা নিয়েও তর্কাতর্কি হত। সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' প্রকাশের আগে পর্যন্ত জীবনানন্দই ছিলেন সবচেয়ে কম আলোচিত। মোহিত-শিবশম্ভু একদিন আমায় বলেছিল, তুমি জীবনানন্দ পড়োনি? পড়ে দেখো। আমি তখন সর্বভুকের মতন যাবতীয় বাংলা বই গোগ্রাসে গিলি, আমাকে কেউ 'এইটা পড়োনি' বললে খুব আঁতে ঘা লাগত, সেইদিনই সেই বই বা সেই লেখকের রচনা যে-কোনও উপায়ে সংগ্রহ

করে পড়ে নিতাম। সেইভাবে 'সাতটি তারার তিমির' আমার হাতে আসে।

কী করে সেই বইটি সংগ্রহ করেছিলাম, তার একটি কাহিনী আছে।

তখন সপ্তাহে একদিন রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো ছিল কলকাতার নাগরিক জীবনের অঙ্গ। রেশনের দোকানের বাইরে চাল-ডাল-গম-চিনি মানেই ব্ল্যাক মার্কেট। অনেক দাম। আমাদের বাড়িতে 'কাজের লোক' ছিল না। বাজার করা, রেশন আনা ইত্যাদির ভার ছিল আমার ওপরে। মনে আছে সেই দিনটি, উত্তর কলকাতায় একটা রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় দশ-বারোজনের পেছনে, অনেকটা সময় লাগবে। এই সময়টা খুবই বিরক্তিকর, অন্যমনস্ক হতে না পারলে বিরক্তি আরও বাড়ে। হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমি আপন মনে কী যেন বিড়বিড় করছি। কয়েকটি কবিতার লাইন :

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হ য়েছে;
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর;
বিলোচন গিয়েছিল বিবাহ ব্যাপারে;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্ বিভূতিকে গালাগাল।

এক এক সময় নিজের ব্যবহারে আমরা নিজেরাই খুব বিস্মিত হই। এ কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গেল কী করে? সচেতনভাবে চেষ্টা করিনি, খুব একটা পছন্দও করিনি। তবু মনের মধ্যে গেঁথে গেল।

সেই গরম, ঘাম, লোকজনের কর্কশ চ্যাঁচামেচি, অসততার গন্ধ, তার মধ্যেই আমি ওই কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিতে মগ্ন হয়ে রইলাম। সেই কবিতা থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আলো, প্রত্যেকটি শব্দ বাজতে লাগল অন্যরকম সুরে। যেমন, 'ঢের' শব্দটি অতি সাধারণ, কিন্তু জীবনানন্দই ব্যবহার করেন বেশি, 'অনেক'-এর চেয়ে 'ঢের' তাঁর কবিতায় অন্য একটি মাত্রা পেয়েছে যেন! 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে', এটা না বোঝার কী আছে? এরকম অসাধারণ পঙ্‌ক্তিটা আগে খেয়াল করিনি? এ তো সারাজীবন স্মরণযোগ্য। 'সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর', এখনও খানিকটা ধোঁয়াটে থেকে গেছে বটে। কিন্তু তখনই আমার একটি উপলব্ধি হল। একটি কবিতার সব ক'টি পঙ্‌ক্তি এবং শব্দের পারম্পর্য মিলিয়ে অর্থ খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের ছেলেমানুষী ছাড়া কিছুই নয়। কবিতা কি সব কিছু বুঝিয়ে দেয়, না একটা অনুরণন জাগিয়ে তোলে? জীবনানন্দ তো ঠিকই বলেছেন, 'কবিতা কী? কবিতা অনেক রকম'। কিছু কিছু রচনা স্পষ্টভাষী হয়েও সার্থক কবিতা হতে পারে, আবার কিছু কিছু কবিতার রহস্যময় অনুরণনই স্মৃতিকে আলোড়িত করে।

তখনই একটা ব্যাকুলতা বোধ করি, জীবনানন্দের একটি কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, তাঁর একটা কবিতার বই নিজের কাছে রেখে বারবার

পড়তে হবে। কিন্তু বই কেনার পয়সা পাব কোথায়? হাত খরচ পাই দৈনিক মাত্র চার পয়সা, জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির'-এর দাম দু' টাকা।

মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। রেশন থেকে চুরি করলে কেমন হয়? চাল আর চিনি যদি কিছু কিছু কম নিই, বাড়িতে ধরতে পারবে না। ধরলেও বলব, আমাকে ওজনে ঠকিয়েছে। সেরকম তো অহরহ ঠকায়। একটা যুক্তিও খাড়া করলাম। ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। শুধু ভাত রুটি খেয়ে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। কবিতাও পড়তে হবে। একটু কম ভাত খেয়ে, চায়ে একটু কম চিনি দিয়ে, সেই পয়সা বাঁচিয়ে একটা কবিতার বই অবশ্যই কেনা যেতে পারে।

সেইদিনই সন্ধেবেলা কবিতার বইটি কিনে বাড়ি ফিরে, পাগলের মতন কতবার যে পড়তে লাগলাম তা কে জানে!

স্কুলজীবনে আমি কবিতা রচনা করার কথা কল্পনাই করিনি। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একটাই, জাহাজের নাবিক হওয়া। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের ছুটিতে খেলাচ্ছলে দু-তিনটি কবিতা লিখেছিলাম, তার একটি 'দেশ' পত্রিকায় পাঠাতে ছাপাও হয়ে গেল। ছেলেবেলায় বন্ধুদের মধ্যে দীপক মজুমদারই ছিল একমাত্র কবি, প্রথম থেকেই সে বেশ জোরাল কবিতা লিখত। বলতে গেলে দীপকের অনুসরণেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করি। সেই সঙ্গে শুরু হয় নতুন করে কবিতা পাঠ। কল্লোল যুগের কবিদের বহু কবিতা বারবার পড়া সত্ত্বেও বেশি ভাল লেগে গেল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, কিন্তু জীবনানন্দের কবিতা প্রথম পড়ার পর কেউ যেন দু'-চোখে ঘুসি মেরেছিল। বিমূঢ় হয়ে বসে থাকার মতন অবস্থা। এ কী! এসব কবিতা আগে পড়িনি? এ যে সম্পূর্ণ নতুন ভাষা:

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে
একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে...

এর মধ্যে প্রথম লাইনটিতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটি? 'অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে'? হাইড্র্যান্ট উপচে উঠেছিল, তাকে কবি লিখলেন 'ফেঁসে'? এই শব্দ তাঁর মাথায় এল কী করে?

পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি

এর মধ্যে 'কাগজের খনি' লেখার সাহস আর কারও হত? দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরির মন অত্যন্ত প্রশান্ত হতেই পারে। কিন্তু পরবর্তী দুটি লাইনে, 'ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে/ ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিলো মুখ আচমন', কল্লোল যুগের আর কোনও কবির সঙ্গে এর একেবারেই মিল নেই। 'জলিফলি ছাড়া/চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ। এমন কি হতো জাঁহাবাজ?' ঠিক মানে বুঝি না, তবু যেন স্তম্ভিত করে দেয়, নিয়ে যায় এক রহস্যময় দেশে, যা শুধু কবিতারই নির্মাণ।

মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্ন ভাবে চলে গেছে

এর মধ্যে রয়েছে অনেক বঞ্চনার করুণ কাহিনী, তাতে 'পরিচ্ছন্ন' শব্দটি একেবারে অভাবনীয় এবং অসাধারণ। এরকম একটি-দুটি শব্দের ব্যবহার আমাদের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নতুন। তাতেই কবিতাগুলির যেন ফট করে রূপ খুলে যায়।

আমি পাগলের মতন জীবনানন্দ দাশের ভক্ত হয়ে গেলাম। ভক্ত কিংবা ক্রীতদাসও বলা যেতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিং-এর পুরনো বইয়ের দোকান থেকে একদিন মাত্র চার আনায় এক কপি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কিনে মনে হয়েছিল যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধরে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর
চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ...

এমন আবেশময়, এমন মায়াবী কবিতা পাঠ যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার মনে হয়েছিল সেই বয়েসে। ইংরিজি 'সেনসুয়াস' শব্দটি যেন এই রকম কবিতা সম্পর্কেই সঠিক ব্যবহার করা যায়। কেন এত সেমিকোলন, কেন হঠাৎ একটা লাইনে, অকারণ চারটে ড্যাশ? জানার প্রয়োজন নেই। জীবনানন্দ দাশ কখনও উচ্চকিতভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেননি। কল্লোলের অন্যান্য কবিরা যতই চ্যাঁচামেচি করুন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই স্বাভাবিক উত্তরসূরি, কিন্তু জীবনানন্দের ভাষারীতিই রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক দূরের। ফসলের স্তন থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের জল পড়ার বর্ণনা লেখার সাধ্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের।

অচিরকালের মধ্যেই আমরা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করি। তখন সবাই জীবনানন্দ দাশে আচ্ছন্ন। কফি হাউসে তরুণ কবিদের আড্ডার বিষয় হিসেবে বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে ক্রমশ স্থানচ্যুত হয়ে সেখানকার সিংহাসনে বসানো হয় জীবনানন্দ দাশ-কে। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এ কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। কৃত্তিবাসের দলবলই যে প্রথম প্রকাশ্যে জীবনানন্দকে নিয়ে একটা হইচই শুরু করে, এটাও দাবি করা যেতে পারে।

আমরা অবশ্য লেখায় জীবনানন্দকে অনুসরণ করিনি। এক একজন কবি বা লেখক হন আউটস্ট্যান্ডিং, যেমন জীবনানন্দ, যেমন কমলকুমার মজুমদার, এঁরা থাকেন মূল

ধারা থেকে দূরে, এঁদের অনুকরণ বা অনুসরণ আত্মঘাতেরই সমান। শক্তি অল্প কিছুদিনের জন্য জীবনানন্দীয় ফাঁদে পা দিয়েছিল, আবার চট করে বেরিয়েও এসেছে। আমি জীবনানন্দের অত ভক্ত হয়েও তাঁর ভাষারীতির একটি ব্যাপার অপছন্দ করতাম। তিনি অধিকাংশ কবিতাই লিখেছেন পয়ারে, তাতে অনেক সময়ই যুক্তাক্ষরকে দু'-মাত্রা ধরেছেন, যেমন 'অতীত নিস্তব্ধতা', 'অবিনশ্বর পথে ফিরে', 'মনে হবে পরস্পরের প্রিয় প্রতিষ্ঠ মানব', 'অগণন নার্সের ভাষা', 'আস্তাবলের ঘ্রাণ', 'ভয় পায় ভ্রান্তিবশত', 'কৃতকর্ম নবীন' ইত্যাদি এরকম এলানো ব্যবহার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তবু মানিয়ে যায়, কিন্তু পয়ার ছন্দ কথ্য ভাষার কাছাকাছি এসে আরও সংবদ্ধ হয়েছে, সেখান থেকে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

সৌভাগ্যবশত এই সময়টায় সিগনেট প্রেস ও দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে আমার বেশ যোগাযোগ ঘটেছিল। শুধু 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সূত্রেই নয়, ডি-কে একটা থিয়েটারের দল খুলেছিলেন, আমি তার সেক্রেটারি, সুতরাং ওই বাড়িতে প্রায় সন্ধ্যাতেই যাতায়াত করতাম আমি। জীবনে সেই প্রথম আবু সয়ীদ আইয়ুব, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ মহারথীদের সামনাসামনি দেখে চক্ষু সার্থক করি। জীবনানন্দ দাশকেও দু-তিনবার দেখেছি। নতুন সংস্করণ 'বনলতা সেন' দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন, তবে শুনেছি, মলাটের ছবিটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, রাজকুমারী অমৃত কাউরের মতন দেখতে হয়ে গেছে। রাজকুমারী অমৃত কাউর খুবই রোগা পাতলা মহিলা, তখন ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

সিগনেট প্রেসের বাড়িতে জীবনানন্দকে দেখেছি, কথা বলিনি। সাহস পাইনি। কৃত্তিবাস ছিল প্রথম যুগে তরুণতম কবিদের মুখপত্র। প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান কবিদের কাছে লেখা চাইতাম না, তাঁদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করাও অভ্যেস ছিল না। সেই সব কবিদের সম্পর্কে এমনই সম্ভ্রমের ভাব ছিল যে মনে হত, ওঁদের সঙ্গে কথা বলার মতো কী যোগ্যতা আছে আমার? শুধু একবারই শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নিয়ে গিয়েছিল জীবনানন্দ দাশের বাড়িতে, ল্যান্সডাউন রোডের কাছাকাছি কোথাও থাকতেন। দরজা খুলেছিলেন তিনি নিজে, ঘরে নিয়ে গিয়েও বসিয়েছিলেন, ঘরের মেঝেতে অনেক পুরনো খবরের কাগজ ছড়ানো ছিল, কবি ছিলেন খালি গায়ে, আমাদের দেখেও গায়ে জামা দেননি। আমরা গিয়েছিলাম দল বেঁধে, অন্যরাই বেশি কথা বলেছে, আমি ছিলাম পেছনের দিকে, নীরব।

আমরা কৃত্তিবাসের দল বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব কোনও ক্যাম্পেই যোগ দিইনি। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে আমি গেছি অবশ্য, সে বাড়ির জামাই জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের তর্কই হত বেশি।

জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে এক মঞ্চে কবিতা পাঠ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল এক কবি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল সেই সময়ে। প্রকাণ্ড সিনেট হলে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। মূর্খরা সেই ঐতিহ্যপূর্ণ সিনেট হলটি পরে ভেঙে ফেলেছে। সেই কবি সম্মেলনের আহ্বায়ক

ছিলেন যদিও নীহাররঞ্জন রায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব, কিন্তু প্রধান উদ্যোক্তা ও সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিগনেটের দিলীপকুমার গুপ্ত। পরিকল্পনা ও ব্যয়ভার তাঁরই। সে সময় কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার একমাত্র মান ছিল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় স্থান পাওয়া। আমার গোটা দু'এক কবিতা তখন ওই পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাই ওই কবি সম্মেলনে মনোনীত হয়েছিলাম। তালিকার শীর্ষে নাম ছিল জীবনানন্দ দাশের, একেবারে শেষে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে আমার নাম। মনে আছে, মাইকের সামনে কী করে সুষ্ঠুভাবে কবিতা পাঠ করতে হয়, ডি-কে অনেক কবিকে আগে দু'একদিন তার রিহার্সাল দিইয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র।

জীবনানন্দ রিহার্সাল দেননি। তাঁর পাঠ করার ভঙ্গিটি ছিল অদ্ভুত। হলে কয়েক হাজার দর্শক। তিনি তাদের দিকে একবারও তাকাননি। বইতে আবদ্ধ চোখ। যাঁর কবিতায় এত কমা, সেমিকোলন ও ড্যাশ, তিনি কিন্তু পাঠের সময় একটুও যতি দেন না, পড়েন অতি দ্রুত, যেন শেষ করার জন্য ব্যস্ত। শ্রোতাদের অনুরোধে তিনি সাত-আটটি কবিতা পড়েছিলেন। অনুরোধকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উইংসের আড়ালে দাঁড়ানো দিলীপকুমার গুপ্ত স্বয়ং।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রধান পঞ্চ কবির মধ্যে সবচেয়ে ভাল কবিতা পাঠ করতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যেমন সুপুরুষ, তেমনই সুললিত কণ্ঠস্বর। একটু টেনে টেনে সুর করে পড়তেন, মোহিত করে দিতেন একেবারে।

সে সময়ে 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' বলে একটা বাৎসরিক ব্যাপার ছিল, যাতে শুধু রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য এইসব হত কয়েকদিন ধরে। খুব জনপ্রিয় ছিল সেই উৎসব। নতুন 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হবার পর সেই সম্মেলন কর্তৃপক্ষ এই বইটিকে ১৩৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করে কবিকে পুরস্কার দেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল একশো টাকা। যতদূর জানি, জীবদ্দশায় ওই একবারই পুরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি। উনিশশো চুয়ান্ন সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সেটাও একটা পুরস্কার বলা যেতে পারে। প্রকাশক নাভানা। তাঁরা সিগনেট প্রেসেরই অনুসারী, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কবিতার বই প্রকাশ করতেন, ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিরাম মুখোপাধ্যায়, যিনি নিজেও এক সময় কবিতা লিখতেন। সিগনেট ও নাভানা, দুটিরই আজ প্রায় অস্তিত্ব নেই বলা যায়।

এই শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় জীবনানন্দের একটি কথা আমাকে বিস্মিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, 'বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির।' যার কবিতা পড়ে মনে হয় সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন, সেই কবিও পাঠকের কথা চিন্তা করেন। আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, ওই গ্রন্থে ছাপা তাঁর পাণ্ডুলিপির নমুনা। আমার ধারণা ছিল, তিনি চিন্তার স্রোতের মধ্যে কোনও যুক্তির জাল না ছড়িয়ে সাবলীলভাবে লিখে যান। অটোমেটিক রাইটিং-এর মতন। সুররিয়ালিস্টরা যেরকম চেষ্টা করতেন। অথচ, জীবনানন্দের লেখায় এত কাটাকুটি, অর্থাৎ অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি প্রতিটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। 'এখানে বনের ধারে ক্যাম্প আমি

ফেলিয়াছি' ধরনের লাইন মনে হয় বেশ দুর্বল ধরনের, কিন্তু এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত, এটা তাঁর স্টাইল। এই মৌলিক স্টাইলের উদ্ভাবন মৌলিক প্রতিভার মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে পূর্বে অগ্রন্থিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু অসাধারণ পঙ্‌ক্তি, যেমন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে'। কিংবা 'কোথাও পরের বাড়ি এখনি নিলাম হবে—মনে হয়, /জলের মতন দামে।/সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছোবে/ সকলের আগে সকলেই তাই'...।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশের পর জীবনানন্দের খ্যাতি অনেক বেড়ে যায় কিন্তু সেই খ্যাতি তিনি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি। বইটি বেরোল এপ্রিলে, অক্টোবর মাসে সেই ট্রাম দুর্ঘটনা। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কয়েকদিন জীবনমরণের লড়াই চলেছিল, দেখতে যাবার সুযোগ হয়নি। জীবনানন্দের প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দ গুহ গেছেন দু'একবার, তাঁর মুখে খবর শুনতাম।

শবানুগমনে খুব বেশি লোক হয়নি। আমাদের অল্পবয়েসি কাঁধ বেশ শক্ত, আমরা কয়েকজন কাঁধ দিয়েছিলাম পালা করে। জীবনে একবারই মাত্র সেই কবির শরীর আমি স্পর্শ করেছি, তখন নিস্পন্দ। ক্যাওড়াতলায় তখনও বিদ্যুৎচুল্লি হয়নি, তাঁকে চিতায় পোড়ানো হয়েছিল। কবির শরীর যখন চিতায় জ্বলছে, কিছুদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে আমরা কয়েকজন অনর্গল তাঁর কবিতা বলছিলাম। কার ক'টা মুখস্থ আছে, যেন তার একটা প্রতিযোগিতা চলছিল। জীবনে সেদিনই প্রথম আমি সিগারেট খাই। অনভ্যাসের জন্য কাশছিলাম খুব, আর ধোঁয়ায় চোখে জল এসে গিয়েছিল।

প্রজ্বলন্ত সূর্য এবং সাতটি তারার তিমির

ধরা যাক তিরিশের দশকের কাছাকাছি সময়ের কথা। কী করছেন তখন রবীন্দ্রনাথ? বিশ্ববিখ্যাত তো বটেই, বিষম ব্যস্ত, অনেক রকম ভূমিকা, কবি বলে চেনাই যায় না। শান্তিনিকেতনের তিনি গুরুদেব, যে-শান্তিনিকেতন আর শুধু ব্রহ্মচর্য আশ্রম নয়, বিশ্বভারতীর রূপ নিচ্ছে, তার অর্থ সংগ্রহের প্রধান দায়িত্বও তাঁর। দেশের যে-কোনও সংকটে দেশবাসী তাঁর মতামত জানতে চায়। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসে, যেখানেই যান তাঁকে প্রদর্শিত হয় রাজকীয় সম্মান। জার্মানি ভ্রমণের সময় অমিয় চক্রবর্তী সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের। তিনি লিখেছেন, "সম্রাটের মত জারমেনি পরিক্রমা করেচি—শ্রেষ্ঠ যা কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়েছে।" গান্ধীজির লবণ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথই পৃথিবীর সব দেশে সবচেয়ে পরিচিত ভারতীয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতির শুরু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকেই। সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল। এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি যেন কবির চেয়ে বেশি দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে, সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে, এমনকী ভারতের এক প্রসিদ্ধ পরিবারের প্রতিভূ হিসেবে। আমেরিকা-ভ্রমণের সময় নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাত সাপ্তাহিক 'স্যাটার্ডে রিভিউ'-তে তাঁর এক সংবর্ধনা সভা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, "নিমন্ত্রিতের তালিকাটিতে ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের অনেক দেখা গেল, একজনও কবির নাম তো পেলাম না—এমনকী একজন লেখকেরও নাম নয়। এমন ব্যাপার কি ফ্রান্সে হতে পারত?"

তাঁর এই সময়কার একটা ভ্রমণসূচি দেখা যাক:

অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছেন। অনেক আগে আগেই পরিবারের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন ইউরোপের দিকে। ১৯৩০ সালের মার্চের গোড়ায়। প্রথমে ফ্রান্সে, তারপর ইংল্যান্ডে, সেখান থেকে জার্মানিতে, তার নানা প্রান্তে ঘোরাঘুরি করে এলেন ডেনমার্কের এলসিনোরে শহরে, ওখান থেকে কোপেনহেগেন হয়ে ফের বার্লিন। পরের মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনিভায়, সেখান থেকেই প্রথম সোভিয়েত রাশিয়ায় যাত্রা। তারপরেও দেশে না ফিরে চললেন আমেরিকায়। মাস তিনেক সে দেশে কাটিয়ে পৌঁছলেন লন্ডনে। দেশে ফেরা হল প্রায় এক বছর পরে।

এত ঘোরাঘুরি যখন করছেন, তখন কবির বয়েস সত্তর।

এ সময় তাঁর কবিত্বশক্তি প্রায় শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু' একটা যা লিখছেন, তাও অকিঞ্চিৎকর। নিজেও অনুভব করছেন তা, সেজন্য বেদনাবোধও আছে।

এতগুলি দেশ পরিভ্রমণে প্রচুর ভাষণ দিতে হয়েছে তাঁকে, অধিকাংশই, যাকে বলে বাগাড়ম্বরপূর্ণ। এরকমই দিতে হয়, এরকমই মানায়। কবিকে মনীষী সাজতে হয়।

এই দীর্ঘ প্রবাসে দু' একটি ব্যাপারে ব্যর্থতাবোধ মেনে নিতে হলেও, কয়েকটি ব্যাপারে গভীর তৃপ্তিও পেয়েছেন। এই সময়কালে কবিতা তাঁকে ছেড়ে গেলেও তাঁর সৃজনক্ষমতা আকস্মিকভাবে বিকশিত হয়েছিল অন্য এক দিকে। কিছুকাল ধরে তিনি মনের খেয়ালে ছবি আঁকছিলেন, কোনও নিয়ম না মেনে, সেইসব ছবি যেন অন্য এক স্রষ্টার, যা রবীন্দ্র অনুরাগীদেরও অচেনা। স্বদেশে এইসব ছবির সমঝদার পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সন্দিহান ছিলেন, কোথাও প্রদর্শন করেননি। চিত্রশিল্পের পীঠস্থান ফরাসি দেশ, সেখানে সবরকম নতুন পরীক্ষাও চলে, সেখানে চিত্রশিল্প অনেকগুলি স্তর পার হয়ে পরাবাস্তবতায় পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল, প্যারিসেই তাঁর ছবিগুলি প্রথম দেখানোর। কিন্তু প্যারিসে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার।

সৌভাগ্যবশত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন দুই ধনবতী মহিলা, প্যারিসের কঁতেস দ্যনোআই এবং আর্জেন্টিনার সেই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। এর পর বার্লিনেও তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল ডক্তর সোলিনা নামে এক বিদূষী মহিলার আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের বান্ধবী ভাগ্য বরাবরই ভাল। ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিগুলির শিল্প-স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। আর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দর্শনও বিরাট অভিজ্ঞতা। সমবায়, সমবণ্টন ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন দেশগঠনের পরীক্ষা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আবার তাঁর সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিলোপ এবং একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনার বিপদের ইঙ্গিতও ধরা পড়েছিল।

কিন্তু প্রধানত যিনি কবি এবং রোমান্টিক কবি, তিনি কবিতা থেকে দূরে থাকছেন কী করে? তাঁর জীবনে যখনই কবিতার উৎস কিছুটা শুকিয়ে গেছে, তখনই যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। জলপ্রাণী যেমন ডাঙায়, কবিতা বর্জিত জীবন তাঁর কাছে তেমনই যন্ত্রণাময়। সেই যন্ত্রণারই প্রকাশ ছবিগুলিতে?

এই পশ্চিম দেশ সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন দু'জন প্রতিভাবান আধুনিক কবি। অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এঁদের সঙ্গে তাঁর নানা সময়ে আলোচনা হয়, কিন্তু তিনি কবিতার আধুনিকতার লক্ষণগুলি ধরতে পারছেন না কিছুতেই। এক এক সময় তিনি ভাবছেন, নিছক ছন্দ-মিল পরিত্যাগ করার নামই বুঝি আধুনিকতা। 'রাজা ও রানী' নাটকটি সংস্কার করতে গিয়ে এই ধরনের একটি কথা বলে ফেলেছিলেন। নাট্য-কাব্য 'রাজা ও রানী'র পরিবর্ধিত রূপটি হয়ে গেল গদ্য 'তপতী'। এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি জানালেন, "নেড়া ছন্দে 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স'এ নাটক লেখা থেকে গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। সাহিত্যে পদ্যটা প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে...গদ্য রচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত।...ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ।" এই ব্যাখ্যা মানতে পারেননি

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি মন্তব্য করেছেন, "ইহা ছন্দোবদ্ধ নাটক ও নাট্যকাব্য রচনার অক্ষমতার কৈফিয়ৎ কিনা জানি না। গ্যেটে বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর ফাউস্ট-এর উত্তরার্ধ লেখেন, রবীন্দ্রনাথকে সেরূপ কোনও বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় না।" জীবনীকারের পক্ষে এহেন মন্তব্য বিস্ময়কর, আবার এই পর্বে গ্যেটের সঙ্গে তুলনা ভ্রান্তও বটে। শতাব্দীর ব্যবধান আছে, এরকম দুই লেখকের আঙ্গিকের বিচার চলে না। শেক্সপিয়ার বিংশ শতাব্দীতে জন্মালে সম্ভবত তাঁর নাটকগুলি গদ্যেই লিখতেন। আবার, গদ্য শক্তিশালী হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে মায়ের কোলে চড়া শিশুর সঙ্গে তুলনা নেহাত উপমার ঝোঁকেই উপমা, ছন্দের আরও গভীর সঞ্চারী হবার কথা।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতা সম্পর্কে তাঁর মত আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তখন ছন্দ ভাঙার জন্য অত্যুৎসাহী। সারা জীবন ছন্দে রাশি রাশি কবিতা লিখে এসে তিনি সত্তর বছর বয়েসে ছন্দ বর্জন করতে উদ্যত হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও অনুরোধ করলেন বিনা ছন্দে লিখতে (সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য সেই গুরুবাক্য অনুসরণ করেন নি, ছন্দকেই আঁকড়ে থেকেছেন)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে লিখিয়েছেন কয়েকটা, তারপর নিজেই লিখতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর এতকাল ব্যবহৃত পদ্য ভাষাকে তিনি 'সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা'য় আবদ্ধ বলতেও দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস।'

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক বই-ভরা কবিতা
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামলো এসে কবিতা
সেইটেই পড়ে রইলো পিছনে।
(পত্র: পুনশ্চ)

এবারে দেখা যাক, ওই সময়ে আর এক কবির কী অবস্থা। কবি হিসেবে অবশ্য তাঁকে চেনে অল্প লোকে। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম যদিও, কিন্তু তাঁর তুলনায় অন্যরা এর মধ্যেই অনেক বেশি পরিচিত এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে'র চেয়ে বয়েসে বড়, কিন্তু তখনও তাঁর কবিতা পত্র-পত্রিকা থেকে ফেরত আসে, নতুন কবিতা সংকলনে তাঁর স্থান হয় না।

আধুনিক কবিদের বিষয়ে রচিত প্রবন্ধে তাঁর নামের উল্লেখ থাকে না।

ব্যক্তিগত জীবন তখন অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। বিবাহিত, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে চরম অসুখী, থাকেন কলকাতার এক মেসে, উপার্জনহীন সম্পূর্ণ বেকার, চাকরি পাবার জন্য তিনি 'কুকুর বেড়ালের কাছেও মাথা নুইয়েছেন'।

জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহর ভাষায়: "এই সময়ে তিনি কর্মহীনতার দৈনন্দিন বিড়ম্বনায় অত্যন্তই বিস্রস্ত ছিলেন; দারিদ্র্যের ও পরমুখাপেক্ষিতার কারণে হতাশাগ্রস্ত, অপমানাহত, বিক্ষুব্ধ, আত্মধিক্কার পীড়িত, এবং কল্পনা কখনও কখনও সামান্য পরশ্রীকাতর এবং ঈর্ষান্বিত।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক অবস্থানের একটা তুলনা কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে।

দু'জনেই ব্রাহ্ম, কিন্তু জীবনানন্দ ব্রাহ্মদের সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। ব্রাহ্মদের ছুঁৎমার্গ ও নীতি-কঠোরতা তিনি পছন্দ করতে পারছেন না। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, ব্রাহ্ম নীতিবাগীশদের জন্যই তিনি চাকরি হারিয়েছেন এবং অন্য কোনও ভাল চাকরি পাননি। ব্রাহ্ম হলে সেই সময় অনেক সুবিধে পাওয়া যেত, কারণ তখন বহু স্কুল-কলেজ, শিক্ষা বিভাগে ছিল ব্রাহ্মদের আধিপত্য। সেই হিসেবে, ইংরেজিতে এম এ পাস করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম পরিচালিত সিটি কলেজে সহজেই চাকরি পেয়েছিলেন। সেই চাকরি রক্ষা করতে পারলে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারতেন জীবনানন্দ। গণ্ডগোল বাধে সরস্বতী পুজো নিয়ে। বাংলার প্রায় সব স্কুল-কলেজেই সরস্বতী পুজো হয়, সিটি কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই হিন্দু, তারাও সরস্বতী পুজো করতে চেয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষের তাতে ঘোর আপত্তি। এখনকার সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষ অতখানি কট্টর না হয়ে যদি ছাত্রদের বুঝিয়ে বলতেন, কলেজ কম্পাউন্ড বাদ দিয়ে একটু বাইরে গিয়ে পুজো করো না বাপু, তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্ররা জেদ ধরে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের ধিক্কার দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। সুভাষ বসু এসে ছাত্রদের 'বেশ করেছ' বলে যান। অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন, জীবনানন্দ সমেত, ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, এই অভিযোগ ওঠে। সেই কয়েকজন অধ্যাপকের চাকরি যায়। কিছু ছাত্রও কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়। পরে আর একবার জীবনানন্দ এই সিটি কলেজেই চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁর কবিতা অশ্লীল, এই ছুতো দেখানো হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বান্ধবী ও অনুরাগিণী ভাগ্য ঈর্ষণীয়। জীবনানন্দের স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই বনিবনা হয়নি, আর একটি মাত্র রমণীর প্রতি তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর নামটি এখনও কেউ জানে না, দিনলিপিতে Y অক্ষরে চিহ্নিত। অধরা এই রহস্যময়ী নারী হতভাগ্য কবিটির সঙ্গে কৌতুক করেছেন বলেই মনে হয়।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খুঁতখুঁতে, রুপোর থালা-বাসনে তাঁর অন্ন পরিবেশিত হত। আর মেসে থাকার সময় জীবনানন্দের আহার বাবদ ব্যয় দৈনিক তিন পয়সা থেকে ছ' পয়সা।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে অনেক রকম ব্যবসাও করেছেন, পাট থেকে পশু চামড়া পর্যন্ত। জীবনানন্দও ছাতার বাঁটের ব্যবসা করবেন ভেবেছিলেন, পারেননি। জীবনবীমার দালাল হতে চেয়েছিলেন, পারেননি। রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজের হকারি করতেও চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে অক্লান্ত। বিশ্বপর্যটন করেছেন কয়েকবার, বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত। একাত্তর বছর বয়েসে পারস্যের শাহেনশাহ্‌-এর আমন্ত্রণে প্লেনে চেপেছেন, তারও পরে একবার অসুস্থ শরীর নিয়েও এলাহাবাদ থেকে মোটরগাড়িতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যান লাহোরে। আর জীবনানন্দ একেবারেই ঘরকুনো, বাংলা ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। আত্মীয়স্বজনরা তাঁর জন্য পঞ্জাবে কিংবা শিলং-এ চাকরি ঠিক করে সেখানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন, বেকার জীবনের অত কষ্ট সত্ত্বেও জীবনানন্দ যাননি। একবার বাধ্য হয়ে দিল্লির এক কলেজে কাজ নিয়েছিলেন, কয়েক মাস পরেই ছুটির সময় পালিয়ে এসে আর ফিরে যাননি।

অন্য কোনও দেশে পা দেননি জীবনানন্দ, কিন্তু তাঁর কবিতায় মিশর থেকে লিবিয়া পর্যন্ত অনেক দেশের নাম পাওয়া যায়। আর পৃথিবীর যে-প্রান্তে বসেই লিখুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শুধু বাংলার কথা।

তিরিশ বত্রিশ বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ রীতিমতন প্রতিষ্ঠিত, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, আর এ বয়েসে জীবনানন্দর মাত্র একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, তাও বিশেষ কেউ পাত্তা দেয়নি, পত্র-পত্রিকা থেকে তাঁর কবিতা ফেরত আসে।

এই দুই কবি সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মেরুর, প্রকৃতপক্ষে এঁদের কোনও তুলনাই চলে না।

জীবনানন্দর একমাত্র সম্বল আত্মবিশ্বাস। কবিতার জগতে নতুন কিছু ঘটাবার জন্য তিনি সচেতন। হন্যে হয়ে অধ্যাপনার চাকরি খুঁজেছেন, বাধ্য হয়ে শেষজীবন পর্যন্ত ওই চাকরিই করেছেন। কিন্তু কলেজে পড়ার কাজ তাঁর কোনওদিনই পছন্দ ছিল না। সদ্য আবিষ্কৃত ডায়েরিতে তাঁর স্বগতোক্তি: Very often I think that instead of frittering away my energy, I ought to just do that for what I stand and in which I excel & delight & which is my true vocation: literature (Poems & Publication) through a profession or calling which nourishes it...। (বিভাব: জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা)

বেকার অবস্থায়, অমন দারিদ্র্য ও হীনম্মন্যতার মধ্যে বিশেষ কিছু লিখতেও পারছেন না জীবনানন্দ। মাঝে মাঝে পুরনো লেখাগুলো গুছোন। বুদ্ধদেব বসু কবিতা ছাড়াও গল্প-উপন্যাস-নাটক লিখছেন বলে কিছুটা ঈর্ষান্বিত। হয়তো সেই দৃষ্টান্তেই তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন ওই সময়ে। (যদিও একটি চিঠিতে জানা যায়, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাস লেখার ইচ্ছে ছিল।) রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর মতন খ্যাতি অর্জনেরও বাসনা ছিল, দিনলিপিতে তার প্রতিফলন আছে। যাই হোক, এক দেড় বছরের মধ্যে তিনি প্রবল বেগে লিখেছেন অন্তত চোদ্দটি গল্প

ও একটি উপন্যাস। অনেক পেশাদার গদ্য লেখকের পক্ষেও এত লেখা সম্ভব নয়। জীবনানন্দ ওর একটা লেখাও ছাপতে দেননি। আজীবন তিনি কবি হিসেবেই পরিচিত রয়ে গেলেন, জীবৎকালের মধ্যে একটাও গল্প বা উপন্যাস মুদ্রিত হয়নি, অথচ মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত (এখনও শেষ হয়নি) সংখ্যায় ও পরিমাণে এত গল্প ও উপন্যাস দেখে আমরা স্তম্ভিত।

বাংলা তিরিশের দশকের গোড়ায় 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়, যাতে ছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমের প্রয়াস। একে রবীন্দ্রবিদ্রোহ বলা যায় না, ব্যক্তিগতভাবে এইসব তরুণ কবি ও গল্পকাররা রবীন্দ্র অনুরাগী এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। তবে রবীন্দ্ররচনা রীতিকে অনুসরণ করার বদলে নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টির চেষ্টাও স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব তরুণরা ঘোষণায় যতখানি রবীন্দ্র-উত্তর সাহিত্যের কথা বলেছেন, তাঁদের রচনায় তার তেমন প্রতিফলন নেই। জীবনানন্দ এই দলের গৌণ সদস্য, কিন্তু আন্দোলন-প্রবণতা তাঁর ছিল না, প্রকাশ্যে রবীন্দ্ররীতিকে অস্বীকার করার কথাও বলেননি। তিনি বলেছিলেন, নতুন ধারা সৃষ্টি হতে পারে ভাষার নতুন ব্যবহারে। কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর আঙ্গিক বদলাতে চাইছিলেন। সেইজন্য বলেছেন ছন্দ বর্জনের কথা। কিন্তু তিনি তখনও ঠিক ধরতে পারেননি যে, গদ্যে লেখাই আধুনিকতা নয়, ছন্দ থাকা বা না থাকাতেও কিছু আসে যায় না। কয়েক বছর পরেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আবার বেশ কিছু অসাধারণ ও স্মরণযোগ্য কবিতা লিখেছেন।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি অকিঞ্চিৎকর। পরের কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়তে পড়তে মনে হয়, আগের বইটি, 'ঝরা পালক' যেন একই নামের অন্য কোনও কবির লেখা। এত আকস্মিক পরিবর্তন কী করে হল, তা জানা সম্ভব নয়। তবে সচেতনভাবেই যে তিনি এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয় 'ক্যাম্পে' কবিতাটি। বিষ্ণু দে হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই কি কবিতাটি ছাপা হয়? কারণ, উচ্চ-ভুরু সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দের কবিতা পছন্দ করতেন না। এর আগে ডাকে পাঠানো কবিতা ফেরত দিয়েছিলেন। কোন কবিতাটি ফেরত গিয়েছিল, তা জানতে পারলে বড় ভাল হত!

'ক্যাম্পে' কবিতাটি সম্পর্কে নাকি অশ্লীলতার অপবাদ উঠেছিল। এ এক মহাবিস্ময়। তন্নতন্ন করে খুঁজেও এ কবিতায় তথাকথিত অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠার মতন কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু এরকম একটি লাইন আছে: 'মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে'। 'নোনা মেয়েমানুষ' দোষের? বলতে ইচ্ছে করে, হা কপাল! ওইখানে ওই 'নোনা' শব্দটা ব্যবহার করে জীবনানন্দ অপর কবিদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

এই কবিতায় কোনও বক্তব্য নেই। আঙ্গিকহীন আঙ্গিক। ছন্দ আছে খুব অলস ভাবে, অনেক পুনরুক্তি, সব মিলিয়ে এক ব্যর্থ প্রেমের বিষণ্ণতা। ক্রোধহীন, অভিযোগহীন, পড়তে পড়তেই অনুভব করা যায়, এ এক নতুন কাব্যভাষা। 'এখানে

বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', এরকম একটা অতিশয় দুর্বল পঙ্‌ক্তি লেখার দুঃসাহস আর কোনও শিক্ষিত কবি দেখিয়েছেন কি? ইচ্ছে করেই তিনি সাধু, চলতি ক্রিয়াপদ মিশিয়েছেন, যেমন এই কবিতাতেই:

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে
জেগেছে বিস্ময়
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্নস্ফুট হয়ে
উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নকটার্ন—।

এই কাব্যভাষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনুধাবন করা হয়তো সম্ভব ছিল না। তিনি জীবনানন্দর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন। বিভিন্ন লেখক-কবিকে উদারভাবে সার্টিফিকেট দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক শব্দ বানাতে হয়েছিল, এটাও সেরকম সার্টিফিকেটের ভাষা। কিছুই বোঝায় না। জীবনানন্দ নিজেও এই বিশেষণ মেনে নেননি।

কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা:

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।

এই পঙ্‌ক্তিগুলিই বরং চিত্ররূপময়। কারুকার্য আছে, ব্যঞ্জনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বেশ কিছু বৎসর কবিতায় হাত মকশো করেছেন বলা যায়। উল্লেখযোগ্য বা স্মরণযোগ্য সৃষ্টি বিশেষ নেই। যৌবন থেকে মধ্যজীবনই তাঁর কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সময়। একাই তিনি বাংলা কাব্যকে তুলে নিয়েছেন বিশ্বস্তরে। বিশ্ববাসী পরবর্তীকালে তাঁর রচনা তেমনভাবে মনে রাখুক বা না রাখুক, এই পর্বের কবিতা বাঙালিকে আজও মাতিয়ে রেখেছে। যখন তিনি সত্তর-উত্তীর্ণ, তখনও লিখে যাচ্ছেন প্রচুর, অভ্যেসবশত, কিন্তু 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই'—এইসব কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত কবিতাগুলিতে আর সে সুর বাজেনি, বারবার পাঠযোগ্য বা স্মরণযোগ্য কবিতা এই শেষ দশকে খুবই কম। নিজেও তিনি হয়তো সচেতন, তাই এরকম লেখা বেরিয়ে আসে:

পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠতো জেগে
কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় নাড়া
ধাক্কা খেয়ে যে-জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি কভু তার অশোক ফুলের সাথে...

মধ্য জীবনেও তিনি সম্পাদকের তাড়ায় কিংবা নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ফরমায়েশি কবিতা লিখেছেন, তবু তা হয়ে উঠেছে অসামান্য। স্বতস্ফূর্ত। এখন এসে যাচ্ছে কষ্টকল্পনা। আধুনিক কবিদের ধারা থেকে তিনি পিছিয়ে পড়তে চান না, যে-কোনও কবির পক্ষেই তা বেদনাদায়ক। এত যশ, এত সার্থকতার পরও একথা তিনি ভুলতে পাচ্ছেন না। সেইজন্যই 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করলেন তাঁর বন্ধুপুত্র ও আধুনিক কবিদের অন্যতম পুরোধা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উৎসর্গপত্রে লিখলেন, 'তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে, এই আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম, তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।'

লক্ষণীয়, কিছুদিন আগে তিনি ছন্দকে বর্জন করে গদ্যকে কবিতার ভাষার উপযোগী বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, পরে তার অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন। আবার ফিরে এসেছিলেন প্রথাগত ছন্দমিলে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, আধুনিকরা বাস্তবতার নামে কুৎসিত কদর্য বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে তা কিছুতেই মেলে না, তবু দু'একবার পাল্লা দেবার চেষ্টা করে এরকম লেখেন:

কাঁঠালের ভূতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ
রান্নাঘরের পাশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান বাদন জমায়।
শেষ রাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদগদ ভাষায়...
(অনসূয়া: সানাই)

বলাই বাহুল্য, এরকম পঙ্‌ক্তি আধুনিকও নয়, কবিতাও নয়।

আধুনিকতা মানে শুধু বাস্তবতা নয়, তা ক্ষণে ক্ষণে পৌঁছে যায় পরাবাস্তবতায়। অনুভবের নানান স্তর এসে পড়ে সেখানে। পশ্চিমী দেশগুলির চিত্রকলার বিবর্তনে আমরা দেখতে পাই, অনেক শিল্পী অত্যুৎসাহে পরাবাস্তবতার স্তরও পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ বিমূর্ততায়, যার ফল সুখকর হয়নি। সম্পূর্ণ বিমূর্ততায় স্রষ্টার সঙ্গে দর্শক-পাঠকদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই নষ্ট হয় তাতে। অনেক সময় বিমূর্ততা পর্যবসিত হয়েছে উদ্ভটপনায় কিংবা পাগলামিতে। কবিতাতেও এমন হয়েছে। সেই সব কবি ও শিল্পী আবার ফিরে এসেছেন কিছুটা বাস্তব আঙ্গিকে।

জীবনানন্দ দাশ তা আগেই বুঝেছিলেন। তাই তাঁর কবিতা কখনও বাস্তবচ্যুত নয়, মাঝে মাঝে বিমূর্ততার ছায়া এসে রহস্যের বাতাবরণ দিলেও আবার ফিরে আসে চেনা জগতে। তাই পাঠককে বিমুখ করে না। যেমন:

হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—

মোরগফুলের মতন লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন
জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই
আর
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ
ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমলে শিশিরে চারিদিকের
বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল
করছে...

সহজ, বর্ণনাময় কবিতা। 'মোরগফুলের মতন লাল', 'কুঙ্কুমের মতো', কিংবা 'ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো', এই উপমাগুলি উপভোগ্য এবং স্বস্তিকর। কিন্তু 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' উপমা ভূ-ভারতে কেউ আগে শোনেনি। ওই পঙ্‌ক্তিটিই কবিতাটির দিকে আমাদের বারবার আকৃষ্ট করে।

এ গেল একটা দিক। জীবনানন্দর কোনও কবিতাতেই আঁটোসাঁটো বাঁধন নেই। একই পঙ্‌ক্তি বা একই শব্দ বারবার ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলে সৃষ্টি হয় এক আবেশের তন্ময়তা। জীবনেরই মতন, এইসব কবিতায় কোনও মানচিত্র নেই, চেনা পথ নেই। এক পঙ্‌ক্তি থেকে আর একটি পঙ্‌ক্তি যেন বিচ্ছিন্ন, যেন পারম্পর্যহীন, সেই মাঝখানের ফাঁকগুলিতে রয়ে গেছে অনেক ইশারা ও ইঙ্গিত। সেইজন্যই এইসব কবিতা বারবার টানে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে জীবনানন্দর এই কবিতার আঙ্গিক অনেক দূরে। তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকেও দূরে। সেইজন্যই, অল্প বয়েসে অকালমৃত্যুর পরেও জীবনানন্দর কবিতা আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। একটা বয়েস পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রচুর পাঠ করে, আপ্লুত হয়ে, জীবনানন্দে পৌঁছবার পর রবীন্দ্রনাথকে একপাশে সরিয়ে রেখেছি।

এহ বাহ্য। শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের প্রতিতুলনা দিয়ে। দুই কবির মধ্যেই সত্যিই কি তুলনা হয়? জীবনানন্দের সৃষ্টির জগৎটি বেশ ছোট। তাঁর প্রতি আমাদের মুগ্ধতা অনেকটা মোহগ্রস্তর মতো। যাঁরা অকালমৃত, জীবিতকালে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত, কিংবা নেশাগ্রস্ত বোহেমিয়ান হয়ে নিজেই জীবনকে ক্ষয় করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের বিশেষ সহানুভূতি থাকে, কিন্তু কীটসের কবিতার ভক্ত হয়েও কি তাঁকে শেক্সপীয়ারের চেয়ে বড় কবি বলা যায়? জীবনানন্দর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত, অপ্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসগুলি অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পর জীবনানন্দর যে-সব অপ্রকাশিত কবিতাগুলি পাওয়া যাচ্ছে, মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই সেগুলি প্রকাশ করেননি। অধিকাংশই বেশ দুর্বল, যেন

একই কবিতার বিভিন্ন খসড়া, নতুন কোনও বিস্ময়কর ঝলক নেই। গবেষকদের কাছে প্রয়োজনীয় হতে পারে, পাঠকদের নয়। তাঁর সীমাবদ্ধতাও আমাদের জানা হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ, গ্যেয়টে, শেক্সপীয়ার বা ভিক্টর হুগোর মতন কবিদের সৃষ্টিক্ষমতা অনেক ব্যাপক। এঁরা নিছক কবির মতন লাজুক, নিভৃতচারী হন না, হন দারুণ বাস্তবতা জ্ঞানসম্পন্ন, পরিশ্রমী, ভোগী, অণু থেকে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে কৌতূহলী। সাহিত্য ছাড়াও অন্য অনেক দিকে ছড়িয়ে থাকে এঁদের আগ্রহ, গ্যেয়টে যেমন বহু রমণীচর্চা করেছেন, তেমনই গবেষণা করেছেন গাছপালা নিয়ে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবেও তাঁর স্বীকৃতি আছে, রাজনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথ যেমন ছবি এঁকেছেন, ব্যবসা করেছেন, সারা দেশের বিবেক-প্রতিভূ হয়েছিলেন, একটি সাধারণ ছোট্ট বিদ্যালয়কে পরিণত করেছেন মহীরুহে, আবার অত ব্যস্ততার মধ্যেও শেষ জীবনেও রচনা করেছেন অসামান্য কিছু গান, লিখেছেন 'যোগাযোগ'-এর মতন গভীর উপন্যাস, অনবদ্য গদ্যে 'চার অধ্যায়'।

রবীন্দ্রনাথকে আঘাত বা অস্বীকার করা পরবর্তী লেখকদের ব্যসন। কিছুটা প্রয়োজনীয়ও বটে। লেখার সময় আত্মবিশ্বাস খানিকটা নড়বড়ে হয়ে গেলে এটা কাজে লাগে। তা ছাড়া রবীন্দ্রভক্তদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্যও এরকম প্রতিক্রিয়া হয়। কোনও প্রাজ্ঞ সমালোচক যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর কোনও কবিতাই লেখা হয়নি, তখন অনেকে বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দ বড় কবি। কখনও কখনও এরকম আমিও বলেছি, তা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ছাড়া কিছুই নয়। জীবনানন্দ আমাদের অন্যরকম কবিতার স্বাদ দিয়েছেন, সেখানেই তাঁর সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। দুধের দাঁত পড়ার বয়েস থেকে শেষ নিশ্বাসগুলি খরচ করা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন জুড়ে আছেন।

ধানসিড়ি নদীর সন্ধানে

অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে আমার জন্ম। কিন্তু বাল্যকালে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় অনেকবার এসেছি বটে, কিন্তু ওদিকে, আরও পুবে কখনও যাওয়া হয়নি। এমনকী ঢাকা শহরও দেখিনি। আমার প্রথম ঢাকা-দর্শন পাকিস্তান আমল শেষ হবার পর, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসে।

তারপর বাংলাদেশে যাওয়া আসা করেছি অনেকবার, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই আটকে গেছি ঢাকায়। বার দু'এক চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ভ্রমণ করেছি যদিও, কিন্তু অন্য জেলাগুলি দেখার সুযোগ ঘটেনি। ঢাকার বন্ধুরা অন্য অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বটে, কিন্তু আড্ডার নেশায় মেতে প্রতিবারই ঘনিয়ে এসেছে ফেরার দিন।

একবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন গণতন্ত্রের দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বহু দেশ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারত থেকে দশজন, সেই ভারতীয় দলটির মধ্যে কী করে যেন দৈবাৎ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল পর্যবেক্ষক হিসেবে। এই দলে আরও দু'জন বাঙালি ছিলেন বটে, প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী, দু'জনেই দিল্লি প্রবাসী, পশ্চিমবাংলা থেকে আমিই একমাত্র।

নির্বাচনের পর্যবেক্ষক, তাই সরকারি ভাবে দারুণ খাতির যত্নের ব্যবস্থা। বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক বিভাগীয় ব্যক্তিরা ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন, তারপর তুললেন ঢাকার সর্বোত্তম হোটেলে। সর্বক্ষণের ব্যবহারের জন্য ড্রাইভার সমেত গাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই। কে বলবে যে এক দরিদ্র দেশে এসেছে আর এক দরিদ্র দেশের মানুষ!

ইউরোপ-আমেরিকা-জাপান থেকেও পর্যবেক্ষকরা এসেছেন, সকলকে শুধু ঢাকায় বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। তাই প্রস্তাব নেওয়া হল যে, পর্যবেক্ষকদের ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলায়। আমাদের আপ্যায়নের ভার যাঁরা নিয়েছেন, বাংলাদেশের সেইসব কর্তাব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে চেনাশুনো, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনও বিশেষ জেলা আমার পছন্দ কিনা। তা হলে তাঁরা সেখানেই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা

করে দেবেন। প্রায় কিছু না ভেবেই আমি বললাম, বরিশাল।

তাঁরা বেশ অবাক হয়েছিলেন। অনেকেই জানতেন যে, আমার জন্মস্থান ফরিদপুর তথা মাদারিপুরে। আগে মহকুমা ছিল, এখন মাদারিপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা। আমি তো ইচ্ছে করলেই মাদারিপুর বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ পেতাম। কিন্তু সেখানে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

আরও তো জেলা ছিল, তবু বরিশাল আমি বেছে নিলাম কেন? বরিশালে আমার তেমন চেনাশুনো কেউ নেই। আলাদা কোনও আকর্ষণ নেই। তবে কিছুদিন আগে তপনমোহন রায়চৌধুরীর লেখা স্মৃতি-রম্যকাহিনীতে বরিশাল সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছিলাম, সেইজন্য কি বরিশাল নামটা প্রথমে মনে এসেছিল?

আর একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর একজন যে পর্যবেক্ষককে আমার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল, সে আমার পূর্ব পরিচিত তো বটেই, আমার প্রিয় ও বিশেষ স্নেহভাজন ইমদাদুল হক মিলন। মিলন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার, অল্প বয়েস থেকেই সে দারুণ জনপ্রিয়, তা ছাড়াও তার মতন পড়ুয়া আমি খুব কম দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় রচনা তার পড়া, তার স্মৃতিশক্তিও ভাল। মিলনের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য পররাষ্ট্র দফতরের এক তরুণ অফিসারকেও সঙ্গে দেওয়া হল, তার নাম আনোয়ার। বয়েস বেশ কম, প্রথম প্রথম তার ব্যবহার বেশ আড়ষ্ট মনে হয়েছিল। সে আমাকে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করছিল, কোনও বাঙালির মুখে এ রকম সম্বোধন শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এ ছেলেটি মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট হতে চায়, সাহিত্যের ধার ধারে না, আমি যে কিছু লিখি টিখি তা সে জানেও না। একদিন পরেই ভুল ভেঙেছিল, আনোয়ার আসলে বেশ লাজুক, রোমান্টিক, সাহিত্য প্রেমিক, নিজেও কিছু কিছু লেখে। আমি তার তুলনায় অনেক বয়স্ক লেখক বলেই সে প্রথমে স্বাভাবিক হতে পারেনি। এক সময় মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি আপনাকে সুনীলদা বলে ডাকতে পারি?

নির্বাচনের দু'দিন আগে আমরা গাড়িতে যাত্রা করলাম বরিশালের দিকে। গাড়িতে বরিশাল? পুরনো আমলের মানুষেরা একথা শুনলে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলবেন। বরিশাল অনেক নদী ও জলাভূমি ঘেরা জেলা, ট্রেন লাইন নেই, স্থলপথে যাবার কোনও উপায়ই ছিল না বহুকাল। নৌকো বা স্টিমারই ভরসা। পরাধীন আমলে সাহেবরা খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত যাত্রিবাহী স্টিমার চালাতেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী স্টিমার সার্ভিস চালু করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পথঘাটের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না। সর্বত্রই মসৃণ রাস্তা। এত নদী, সব জায়গায় এখনও ব্রিজ তৈরি হয়নি, কিন্তু গাড়ি কিংবা বড় বড় যাত্রিবাহী বাস ফেরিতে পার করে দেবার সুন্দর ব্যবস্থা। ফেরিঘাটে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মোট ন'বার ফেরিতে নদী পার

হতে হয়েছে, তার মধ্যে এক জায়গাতে সময় লেগেছে পৌনে দু'ঘণ্টা।

ঢাকা থেকে এদিকে আসতে গেলে দুটি ঘাট দিয়ে পদ্মা পার হতে হয়। আরিচা আর মাওয়া। আমরা এসেছিলাম বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে মাওয়া ঘাটে। এই বিক্রমপুরে ইমদাদুল হক মিলনের পৈতৃক বাড়ি। সে চলন্ত গাড়ি থেকে হাত তুলে কিছুদূরে তার বাড়িটা দেখালো। আমি ওই ভাবে আমার নিজের বাড়ি দেখাতে পারব না। আমাদের মতন যাদের বাড়ির অস্তিত্ব এখনও ওই অঞ্চলে আছে, সেগুলি নাকি 'শত্রু সম্পত্তি'। আমি কী করে আর একজন বাঙালির শত্রু হয়ে গেলাম, তা জানি না।

মাওয়া ঘাট থেকে যে স্টিমারে ওঠা হল, সেটি মস্ত বড়, প্রায় জাহাজের মতন। দিগন্ত বিস্তৃত পদ্মা। এখানকার ক্যান্টিনে খাওয়া হল ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত। খুব যে আহামরি লাগল তা নয়। সাধারণ রান্না। এককালে এইসব স্টিমারের খালাসিদের রান্নার খুব খ্যাতি ছিল। গরম গরম ঝাল ঝাল মুর্গির ঝোল ছিল অনবদ্য। আজকাল পূর্ববাংলার রাঁধুনিরাও ঝাল দিতে ভুলে গেছে। পদ্মার ইলিশের চেয়ে এদিককার কোলাঘাটের গঙ্গার ইলিশের স্বাদ যে অনেক বেশি ভাল, তা শুনলে ওদিকে অনেকে চটে যান। পদ্মায় অনেক বেশি ইলিশ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাদে এদিককার গঙ্গার ইলিশ যে উত্তমতর, তা অনেকে স্বীকার করেন না।

পদ্মা পার হবার একটু পরেই আবার একটি নদী পার হতে হল। আড়িয়াল খাঁ। আমার ছোটবেলার নদী। 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভাল!' আমার চোখ জ্বালা করে উঠেছিল। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কী এক দুর্দান্ত, গর্জমান, অনবরত পাড়-ভাঙা নদীর ছবি আছে স্মৃতিতে, তার বদলে এখন চুপচাপ বয়ে চলেছে নিরীহ, সাধারণ এক নদী। হয়তো আগেও এরকমই ছিল, বাল্যকালে সব কিছুই বড় বড় লাগে। ইস্কুলের মাঠটাকে মনে হয় প্রকাণ্ড, বাড়ির পাশের দিঘিটার ওপারও যেন ছিল রহস্যময় জঙ্গলে ঢাকা, এক একটা রাস্তাকে মনে হত অনন্তের পথ। তা ছাড়া আড়িয়াল খাঁ-কে আমি হয়তো স্মৃতিতে ধরে রেখেছি ভরা বর্ষার সময়কার রূপে। এখন প্রবল গ্রীষ্ম, সব নদীই শীর্ণ। এবং আছে ফরাক্কা বাঁধের সমস্যা, যে জন্য বাংলাদেশের নদীগুলিতে জল কম আসে। বাঁধ বেঁধে বেঁধে পৃথিবীর সব দেশের নদীগুলিই যৌবন হারিয়েছে। কলকাতার গঙ্গার মাঝখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হেঁটে বেড়ায়, বেলুড়ের কাছে আমি নিজে দেখেছি।

রাস্তার ধারে ধারে গ্রাম ও শহরগুলির নাম লেখা। ফরিদপুর, মাদারিপুর পেরিয়ে গেলাম। একটা জায়গার নাম দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল একবার। ট্যাকের হাট! এর খুব কাছেই আমার মামাবাড়ি আমগ্রাম। ওই মামাবাড়িতেই আমার প্রথম যৌবন-উন্মেষ হয়েছিল। ওইখানে সাঁতার শিখি। যখন তখন ইজের আর গেঞ্জি খুলে নিয়ে ল্যাংটো হয়ে এক হাত উঁচু করে ধরে, আর এক হাতে সাঁতার কেটে খাল পার হয়ে গেছি। ওইখানেই প্রথম সামনাসামনি দেখি মৃত্যু, আমার দাদামশাইয়ের। এখানেই প্রথম হাতেখড়ি। ওখানেই প্রথম দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠাবলি দেখে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাদের এক কোণে বসে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম।

গাড়িটা একটু ঘোরালেই আমার সেই মামার বাড়ি—আমবাগান-আটচালা-পুকুর এখন কী অবস্থায় আছে দেখে আসতে পারি। না, যাব না, কিছুতেই যাব না।

বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বরিশাল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরিশাল শহরে আমাদের আগমনবার্তা রটে গেল, যদিও কারুকেই আগে থেকে খবর দেওয়া হয়নি। আত্মগোপন করে থাকা মুশকিল। মিলন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, তা ছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে তার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হয়, সে নিজেও অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় সশরীরে। সুতরাং পাঠকদের কাছে তার মুখ বিশেষ পরিচিত। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকেও কেউ কেউ দেখেই চিনতে পেরে যায়।

পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। নিয়মমাফিক আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের এস.পি., পোলিং অফিসার কয়েকজনের কাছে খোঁজখবর নিতে গেছি। এইসব আমলারাও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, আমি নিজে অবশ্য আপনার লেখা কিছু পড়িনি। কিন্তু আমার বউ আপনার ভক্ত, বাড়িতে আপনার বই আছে। আবার কেউ কেউ আমাদের অবাক করে দিয়ে আমার কবিতার দু'চার লাইন মুখস্থ বলে দেয়, কিংবা মিলনের কোনও উপন্যাসের কাহিনী।

সাংবাদিকদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে পরদিন যেতে হল স্থানীয় প্রেস ক্লাবে। অনেকেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চান। তাতে কিছুতেই রাজি হই না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এক বাড়িতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আরও অনেক বাড়িতে যেতে হবে, তারপর বত্রিশ ব্যঞ্জন খেতে খেতে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে। বাংলাদেশের মানুষদের মতন এত অতিথি পরায়ণ মানুষ আর কোথাও দেখিনি।

বরিশাল শহরে হিন্দুদের সংখ্যা এখনও নগণ্য নয়। অশ্বিনী দত্ত এককালে ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা। এখানকার টাউন হলটি এখনও তাঁর নামে। বরিশালের আর একজন স্বনামধন্য পুরুষ ফজলুল হক। ভারতীয় কংগ্রেস যদি এক সময় তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা না করত, তা হলে বোধহয় এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হত।

এককালের সুখ্যাত ব্রজমোহন কলেজ বা বি এম কলেজ এখনও সগৌরবে চলছে। সম্প্রতি এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব উঠেছে।

সন্ধেবেলা হোটেলের ঘরে বসে আড্ডা দিতে দিতে মিলন বলল, সুনীলদা, এই শহরে জীবনানন্দ দাশ কোন বাড়িতে থাকতেন, তা খুঁজে বার করলে হয় না?

মিলন কবিতা লেখে না, শুধুই গদ্যকার, কিন্তু অন্যান্য অনেক গদ্যকারের সঙ্গে তার তফাত এই যে, সে খুব কবিতা ভালবাসে। অনেক সময় তার সঙ্গে আমার গল্প-উপন্যাসের বদলে কবিতা নিয়েই কথা হয়।

বরিশালে এলে জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়বেই, তাঁর বাড়িটি দেখার ইচ্ছে আমারও মনে উঁকি দিয়েছিল।

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙরায়ে

নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—শাদা স্তন ধরে
করবীর: কোন্ এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে: নরম ব্যাকুল।

জিজ্ঞেস করলাম, সে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে কি এতদিন পর? ওঁদের কেউ তো এখানে নেই শুনেছি।

মিলন বলল, লোকাল কারুর সাহায্য নিতে হবে। শহরটা আমিও ভাল চিনি না।

পরদিন একজন সাংবাদিককে পাকড়াও করা হল। সুবিধের মধ্যে এই যে, আমাদের সঙ্গে একটি গাড়ি আছে। পেট্রোলের চিন্তা নেই, এবং ড্রাইভার ভদ্রলোকটি গোমড়ামুখো নন। বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে, তার নাম বগুড়া রোড। সেই রাস্তার এক বাঁকের মুখে খুঁজে পাওয়া গেল সেই বাড়ি। আশেপাশে বড় বড় হর্ম্য উঠে গেছে, কিন্তু এ বাড়িটি ছিমছাম একতলা। গেট পেরিয়ে ছোট্ট একটি উঠোন, অনেকটা বাগানের মতন, এদিক ওদিকে কয়েকটি ঘর, পাকা দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। বাড়িটিতে এখনও বেশ একটা শান্তশ্রী আছে। বর্তমানে এক মুসলমান পরিবার এখানে থাকেন, তাঁরা যত্ন করে আমাদের দেখালেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, এ বাড়ি একই রকম থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুটা অদলবদল ও সংস্কার হয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু একেবারে খোল নলচে বদলে যায়নি। একদিকের একটি ঘর দেখিয়ে একজন জানালেন যে, সেটি প্রায় আগের মতনই আছে। কল্পনা করা যায়, জীবনানন্দ দাশ ওই ঘরে বসে লিখতেন।

কতদিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে; সন্ধ্যার ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে...

সে বাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ থাকিনি। একটা বাড়ি অত দেখবার কী আছে? এক ঝলক দেখলে বেশি মনে থাকে।

গেটের পাশে সে বাড়ির নাম লেখা আছে 'ধানসিড়ি'। জীবনানন্দের আমলের নয়, বর্তমান মালিকেরা এই নাম দিয়েছেন। তাঁরা ওই কবির অনুরাগী।

তখন মনে হল, তা হল ধানসিড়ি নদীটাও খুঁজে দেখলে হয়। ওই নামে সত্যি কোনও নদী আছে?

বরিশালের বেশ কয়েকজন তরুণ লেখক ও সাংবাদিক জানাল যে, ওই নামে নদী একটি নদী অবশ্যই আছে, তারা সবাই শুনেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা কেউ জানে না নদীটা ঠিক কোথায়, কেউ দেখেনি। দেখার আগ্রহও হয়নি?

ধানসিরি নামে একটি নদী আছে আসামে। ওখানে সুবনসিরি, ধানসিরি এই রকম নদীর নাম হয়, কিন্তু বানান আলাদা। জীবনানন্দ লিখেছেন ধানসিড়ি, চন্দ্রবিন্দু দেননি।

পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে

ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাবো ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলো রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে...

জীবনানন্দ নিশ্চিত আসামের নদীটির কথা লেখেননি, তাঁর নদীটি একান্তই বাংলার গ্রাম্য নদী। এক নামে একাধিক নদী থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইছামতী ও যমুনা নামে বহু জায়গায় আলাদা আলাদা নদী আছে। বৈতরণী নামে নদীও একাধিক।

বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে 'কীর্তনখোলা' নদী। বেশ নামটি।। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর কোনও কবিতায় 'কীর্তনখোলা' নামটি ব্যবহার করেননি, অথচ দূরবর্তী ধলেশ্বরীর কথা এসেছে বারবার।

'কীর্তনখোলা' নদীটির রূপ উপভোগ করা যায় না। এককালে বরিশাল শহরটি নাকি সুন্দর ছিল, নদীর ধার দিয়ে বেড়াবার রাস্তা ছিল, এখন তা বোঝার উপায় নেই। নদীর ধারে কলকারখানা ও বড় বড় গুদামঘর নদীকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, নদী দেখাই যায় না প্রায়। জনসংখ্যার চাপে শহরটি শ্রীহীন।

নির্বাচনের দিনটিতে আমাদের কাজ বিভিন্ন পোলিং বুথ ঘুরে ঘুরে দেখা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। কোথাও কোনও কারচুপি বা জোর জবরদস্তি চললে, বা সেরকম কোনও অভিযোগ শুনলে লিখে নিতে হবে। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ভোট চলছে, অনেক পোলিং বুথের সামনে লম্বা লাইন, সুতরাং আমাদের করণীয় তেমন কিছু নেই। আমি ও মিলন ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে লাগলাম ধানসিড়ি নদীটি।

আগেকার বরিশাল এখন অনেক ভাগ হয়ে গেছে। মহকুমাগুলি এখন ছোট ছোট জেলা। যেমন ঝালকাঠি (উচ্চারণ ঝালোকাঠি), পটুয়াখালি এগুলোও এখন জেলা, সব মিলিয়ে এখনও বলা হয় বৃহত্তর বরিশাল। এই বৃহত্তর বরিশালই আমাদের পরিদর্শন এলাকা। আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরছি অনবরত। শহরের ছেলেরা কেউ ধানসিড়ি নদীর সন্ধান দিতে পারেনি, আমরা যে-কোনও নদীতে খেয়া পার হবার সময় স্থানীয় লোকদের কাছে ধানসিড়ির খোঁজখবর নিই। কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না। একটা নদীর অস্তিত্ব আছে, অথচ দেখা যায় না, এ কী মায়া-নদী নাকি?

ঝালকাঠির দিকে যাবার জন্য প্রায়ই আমাদের একটি নদী পার হতে হয়। এদিকের অনেক নদীর নামই বেশ সুন্দর। যেমন, একটি নদীর নাম সন্ধ্যা! কিন্তু এই নদীটির নাম মোটেই সুন্দর নয়, বরং অদ্ভুত, মানে বোঝা যায় না। ডাবখান। কেউ কেউ বলল, এটা নদী নয়, কাটা খাল, যদি তাও হয়, তা হলেই বা একটা খালের নাম ডাবখান হবে কেন? সমুদ্রের কাছাকাছি এই নদী-মাতৃক দেশে ডাব পাওয়া যায় সর্বত্র। এখানকার ডাবের আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, বরং এখানকার সোনালি মর্তমান কলার স্বাদ অপূর্ব! কলা নয়, যেন ক্ষীর।

যাই হোক, এই ডাবখান পারাপারের সময় একজন মাঝি জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ধানসিড়ি নদী আছে ওই তো ওদিকে। ওদিকপানে অনেকগুলো নদী মিলেছে।

ডাবখান নদীর ধার দিয়ে বাঁধানো সড়ক নেই, মাঝিটি যেদিকটায় হাত তুলে

দেখাল, সেদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নৌকো ভাড়া নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খেয়ার লঞ্চ ছাড়া শুধু যাত্রী পারাপারের জন্য খেয়ার নৌকোও আছে, সে নৌকো ভাড়া নেওয়া যাবে না। অন্য কোনও নৌকো নেই, বহু নৌকোই নির্বাচনের ডিউটি দিচ্ছে। কোনওক্রমেই কি ওই অনেক নদীর সঙ্গমস্থানটিতে যাওয়া যাবে না? খেয়ার ঘাটে অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞেস করলে সকলেই মাথা নেড়ে বলে, মুশকিল, এখান থেকে যাওয়া খুব মুশকিল। কেউ কেউ বিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা অকিঞ্চিৎকর নদী দেখার জন্য আমাদের এই ব্যাকুলতার কারণ বুঝতে পারে না। কী আছে সেখানে?

তা হলে, ধানসিড়ি নদীটি জীবনানন্দের স্বকপোল কল্পিত নয়, একটা ওই নামের বাস্তব নদী কাছেপিঠে আছে ঠিকই। সচরাচর যাতায়াতের পথে পড়ে না। ডাবখানের তীরে আমরা বেশি সময় কাটালে আমাদের সঙ্গী আনোয়ার বিনীতভাবে আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখনও অনেক পোলিং বুথ দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমরা ফিরে যাই। কিন্তু যদি মারামারি না হয়, বুথ দখল বা বোমা ছোঁড়ার ঘটনা না ঘটে, তা হলে আর দেখার কী আছে? ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে আমরা অন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিই। যেমন ফজলুল হকের বসতবাড়িটি দেখা হয়ে গেল। বেশ বড়, অনেকখানি ছড়ানো বাড়ি, এখনও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা বোঝা যায়। সে বাড়ির একটি অংশে ফজলুল হকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি সংগ্রহশালা করে রাখা হয়েছে। আমি ফজলুল হককে স্বচক্ষে দেখিনি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের মতন চেহারাটিও যে বিশাল ছিল, তা তাঁর ব্যবহৃত চটিজুতো ও জল খাবার গেলাসের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

ফজলুল হকের এক ছেলেও রাজনৈতিক নেতা, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী। জীবনানন্দ দাশের ছেলে ও মেয়ে দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বংশে আর কেউ নেই। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দ যখন নিহত হন, তখন কবি হিসেবে ক'জনই বা চিনত তাঁকে। তাঁর বাড়িটি সংরক্ষণের কথা কেউ চিন্তা করেনি, এমনকী কলকাতাতেও কত হেঁজিপেঁজি লোকের নামে রাস্তা আছে, জীবনানন্দ দাশের নামে কোনও রাস্তার নাম রাখা হয়নি। অন্তত ট্রাম কোম্পানি তো তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করলে পারত।

যেন চুম্বকের টানে আমরা ডাবখানের তীরে ফিরে যাই বারবার। ঝালকাঠির দিকে কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, এই উড়ো কথা শুনে আমরা নদী পেরিয়ে সেদিকে গেলাম তৃতীয় বার।

ধানসিড়ি নামে নদী আছে, এটা জেনেই আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু মিলন নিরুদ্যম হতে রাজি নয়। তার বয়েস কম, জেদী স্বভাব, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সে ধানসিড়ি আবিষ্কার করবেই। এক জায়গায় একটা ছোট দোকানে সিগারেট কেনার জন্য থেমেছি, মিলন সেখানেও জিজ্ঞেসাবাদ শুরু করেছে। হঠাৎ একজন লোক বলল ধানসিড়ি যাবেন? এই পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে যান না। মাইল দেড়েক যেতে হবে।

সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে? হ্যাঁ, যাওয়া যাবে অনেকখানি। এরকম একটা রাস্তা রয়েছে, তা আগে কেউ আমাদের বলেনি কেন? এ লোকটি কি সত্যি কথা বলছে? বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়ে এগোলাম সেই গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ধরে। শেষ পর্যন্ত রাস্তাটা এসে নামল এক নদীর কিনারে। একটা খাটিয়ার ওপর কয়েকজন লোক বসে ছিল, তাদের জিজ্ঞেস করা হল, এটা কী নদী? তারা বলল, ধানসিড়ি!

এমন কিছু আহামরি রূপ নয় সে নদীর, তবু কেন নাম শোনামাত্র রোমাঞ্চ হল?

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধে ভরা জলে ভেসে ভেসে...

এককালে এই ধানসিড়ি তীরেও খেয়াঘাট ছিল, এখন ডাবখানের বুকে ফেরি লঞ্চ চলে, ওদিকে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, তাই এখানে বিশেষ কেউ আসে না। এক সময় এ নদীও বেশ চওড়া ছিল, এখন মজে গেছে, একদিকে চরা পড়ে যাওয়ায় সেদিকে উঁচু বাঁধ দেওয়া। তবু এখনও এই নদী নাব্য, কিছু নৌকো চলাচল করে।

নদীর ঘাটে দাঁড়ালেই কি নদীকে চেনা যায়? নদীর সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক হওয়া দরকার। সাহেবরা সেইরকমই মনে করে। একবার জামশেদপুরের দিক থেকে সুবর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে এসেছে নদীর ওপর, পশ্চিম আকাশের সূর্য থেকে সত্যিই অনেকগুলি সুবর্ণরেখা নেমে এসেছে জলে, আমরা প্রথাগত ভাবে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছি, আমাদের সঙ্গী ছিলেন কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ, তিনি প্যান্ট-শার্ট খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নেমে গেলেন জলে। আর একবার একজন বেলজিয়াম কবি ভ্যারনার ল্যামবারসিকে নিয়ে কাকদ্বীপের দিকে বেড়াতে গিয়ে হারউড পয়েন্ট থেকে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় ভ্রমণ করছিলাম, মাঝ গঙ্গায় ভ্যারনার হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। আমিও একবার, সেটা খুব সংগোপনে, মানসের জঙ্গলে মধ্যরাত্রিতে মানস নদী দেখে এমনই উতলা হয়েছিলাম, শরীর কাঁপছিল যৌন আবেগে, আর কেউ কোথাও নেই, রুপোলি জ্যোৎস্নায় নদীটিকে মনে হয়েছিল নারী, সম্পূর্ণ পোশাক খুলে সাঁতার কাটার ছলে সঙ্গম করেছিলাম সেই নদীর সঙ্গে।

এখানে তা সম্ভব নয়। একটা নৌকো এসে থামতেই সেটি ভাড়া করা হল। মাঝির নাম ফারুক, তার খালি গা, লোহা-পেটা শরীর। সঙ্গে একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটিও ওর নিজের নয়, অনাথ। আমরা কোথায় যাব? কোথাও যাব না, শুধু এই নদীতে কিছুক্ষণ ঘুরব শুনে ফারুক চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইল।

এ নদীর প্রস্থ, বড়জোর বাগবাজারের খালের দেড়গুণ, কোনওদিকেই ধানখেত নেই। একদিকে গ্রাম। কিছু কিছু বাড়ি ও গাছপালা। 'কাঁঠাল-ছায়া' আছে কিনা বোঝা গেল না, অন্যদিকে বাঁধের ওপর বাবলা গাছের ঝাড় লাগানো হয়েছে। ওই বাবলা

গাছগুলি ফারুক মাঝির ঘোর অপছন্দ, তার ধারণা, ওর জন্য হাওয়া গরম হয়, বারবার বলতে লাগল, যা হাওয়া গরম, দেখেন না ঘাম হচ্ছে, এ বাতাস ভাল নয়। অনাথ ছেলেটির জন্য ফারুকের খুব মায়া, নিজের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে তাকে ঘাম মুছে নিতে বলে।

আমরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ফারুককে জিজ্ঞেস করি, তুমি ভোট দিতে যাবে না?

সে বলল, আলবাত যাব। ভোট নষ্ট করব কেন? ভিড় কমুক, বিকেলে যাব। সকালে গিয়ে লাইন দিলে রোজগার করব কখন?

আবার জিজ্ঞেস করা হল, কাকে ভোট দেবে ফারুক মিঞা?

সে চোখ ঘুরিয়ে বলল, আপনাদের বলব কেন? আমার প্যাটের কথা কেউ জানতে পারবে না!

তার নৌকোর ছইতে এক নেত্রীর ছবি সাঁটা আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করতে সে হি হি করে হেসে বলল, ছবি থাকলে চক্ষে ধুলো দেওয়া যায়। প্যাটের কথা তবু প্যাটেই থাকে। বলাই বাহুল্য, ফারুকের মুখের ভাষা একেবারে অন্যরকম। সে ভাষা আমি বুঝলেও অবিকল লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত। এই নিরক্ষর মাঝিটি তার গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন।

কথা বন্ধ করে আমি সতৃষ্ণ নয়নে নদীর দু'দিকে চেয়ে থাকি। এককালে হয়তো এর ধারে ধারে ধানখেত ছিল। জীবনানন্দ কি কোনওদিন সত্যিই এই নদীর বুকে নৌকোয় ঘুরেছেন? কিংবা শহরের অন্য লোকদের মুখে শুধু নামটাই শুনেছেন!

নদীগুলো খুব বদলে যায়। ধানসিড়ি এখন একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ছোট নদী। আমি কপোতাক্ষ নদীতেও নৌকো চেপেছি, তার জল এখন কোনও মৃত পাখির চোখের মতন বিবর্ণ।

ক্রমশ ধানসিড়ি চওড়া হয়। সামনের দিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলরাশি। ফারুক জানাল যে, ওইখানে সাতখানা নদী এসে মিশেছে, ওইখানে গেলে ঘূর্ণিতে পড়তে হবে। সুতরাং আমরা আবার নৌকো ঘোরাতে বললাম।

এই নদীর নামটি জীবনানন্দের এমনই ভাল লেগে গিয়েছিল যে, তিনি বেশ কয়েকটি কবিতায় এই ধানসিড়ির উল্লেখ করেছেন:

এ সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা,
চালতার পাতা থেকে টুপটুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির,
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর...

ফারুক মাঝির কথাবার্তা এমনই চিত্তাকর্ষক যে, এর পর আমরা নদীটিকে ভুলে গিয়ে তার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই। সে কবিতা কাকে বলে জানেই না। তবু সে বলে যে, যখন বাতাস থাকে না, তখনই বাবলা গাছগুলোর ভেতর থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে...এই নদীর জল বড় গম্ভীর...ভোটের ঝগড়াঝাঁটি শেষ না হলে বৃষ্টিধারা নামবে না...ভোটের রেজাল্ট দেখার জন্য মেঘ চুপ করে বসে আছে...

এই ফারুককে নিয়ে কবিতা লেখা কত শক্ত!

নতুন করে দেখা

পর পর দুটি কবিতার স্তবক উদ্ধৃত করে ধাঁধার মতন প্রশ্ন করা যায়, কোনটি কার লেখা।

১.
বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের
কিনারায়
মনের চাতক হারিয়ে গেল দূরের
কুয়াশায়।
ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার
ক্ষোভে,—
সে কোন বোঁটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা
মদের লোভে
বনের চাতক-মনের চাতক কাঁদছে
অবেলায়!

২.
কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয় সংগীত স্বরে।
নগ্ন শিমূলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

এর মধ্যে প্রথমটি এক তরুণ কবির রচনা, দ্বিতীয়টি এক প্রবীণ কবির। বলাই বাহুল্য, প্রথম স্তবকটি অতি দুর্বল, নিরেস। প্রায় অকবিতাই বলা যায়। বনের চাতক, মনের চাতকের তুলনা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর, ছন্দ এবং মিলেও বেশ দোষ আছে। যারা কবি, তারা জানে, ‘কুয়াশায়’-এর সঙ্গে ‘অবেলায়’ সঠিক মিল হয় না। অন্ত্যমিল মানে দুই পঙ্‌ক্তির শুধু শেষ অক্ষরের মিল নয়, পুরো শব্দটির ধ্বনিগত মিল থাকা আবশ্যিক তো বটেই, অন্য অক্ষরগুলির বর্ণ-গত মিল থাকলেও ভাল হয়। মাঝখানে

একটি অকারণ মিলের লোভে ভুল শব্দও প্রয়োগ করা হয়েছে। 'বোঁটের' মানে কী? 'ঠোঁটের' সঙ্গে মেলাবার জন্য 'বোঁটা' থেকে 'বোঁটের' করা হয়েছে, এটা অসঙ্গত। যতি চিহ্ন ব্যবহারও ত্রুটিপূর্ণ, ষষ্ঠ লাইনে 'ক্ষোভে'র পর কমা এবং ড্যাশ দুটোই দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে', এতে কোনও কবিত্ব নেই, অনায়াসেই বলা যেতে পারে ক্লিশে। অন্য কবির দ্বিতীয় স্তবকটি নিখুঁত। মাত্রা ও মিল সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই নেই, অনুপ্রাস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ অনুপ্রাস উচ্চাঙ্গের কবিতার রস নষ্ট করে, কিন্তু অনেকগুলি 'র' ও 'ল'-এর ব্যবহারে ধ্বনি-মাধুর্য পাওয়া যায়। সমস্ত শব্দই অতি সাবলীল, বোঝা যায় বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফসল, চেনা যায় রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য এক নবীন কবির অতি তরল ও দুর্বল একটি স্তবক উদ্ধৃত করার কারণটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এই কবির নাম জীবনানন্দ দাশ, দুটি কবিতাই একই সময়ে লেখা, ১৩৩৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তিটি 'মহুয়া'র অন্তর্গত, 'বোধন' কবিতার অংশ, জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর 'বনের চাতক-মনের চাতক'-এর শুরু। এই কাব্যগ্রন্থটি পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্র অনুসারী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিবৃন্দের আর একটি সংখ্যাবৃদ্ধি হল মাত্র।

অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হল জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। নামের মিল থাকলেও এই দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা যে একই ব্যক্তি তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। প্রথমদিকের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্তের অনুকরণ করতে চেয়েছেন প্রাণপণে, হঠাৎ যেন কোনও মায়া সরোবরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্মান্তর ঘটে গেল। তাঁর হাতে সম্পূর্ণ নতুন কাব্যভাষা। শব্দ ব্যবহারে তিনি বেপরোয়া।

> পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে
> রূপশালি-ধানভানা
> রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ
> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে
> আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে
> তার,—
> শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।
> আজো তবু ফুরোয়নি বৎসরের নতুন
> বয়স,
> মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা
> রোদ,—ভাঁড়ারের রস।

একমাত্র কমা ও ড্যাশ একসঙ্গে ব্যবহারের দুর্বলতা ছাড়া এই কবির সঙ্গে পূর্বতন কাব্যগ্রন্থের কবির কোনও মিল নেই।

এখানে তিনি তোয়াক্কা করছেন না ছন্দ-মিলের, লাইনগুলি যেন স্বতোৎসারিত। 'বিয়োবার' কিংবা 'ভাঁড়ার'-এর মতন শব্দ ব্যবহার করছেন অক্লেশে, চাক্ষুষ দৃশ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন রহস্য। পল্লী প্রকৃতিকে নারীর রূপ দেওয়া এমন কিছু নয়, সব কবিরই প্রিয় এই উপমা, কিন্তু জীবনানন্দ লিখলেন, আসন্ন শীতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে সে এক গর্ভিনী, 'নুয়ে আছে নদীর এপারে'। এ যেন ইম্প্রেশনিস্টদের আঁকা ছবির মতন, চোখের সামনে উদ্ভাসিত অথচ পুরোপুরি বাস্তব নয়, তাতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে 'ভাঁড়ারের রস'।

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি
ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে।

এই কবিতার যে প্রথম পঙ্‌ক্তি, 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', আমার মতে রবীন্দ্র যুগোত্তীর্ণ সবচেয়ে দুঃসাহসিক লাইন। তিরিশের দশকে বাংলা কবিতা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছিল, সেখানে এরকম কাঁচা, নড়বড়ে একটি লাইন সদ্য হাত মকশো করা কোনও নবীন কবিও লিখবে না!

বাংলা কবিতায় তখনও সাধু ক্রিয়াপদ চালু রয়েছে বটে, কিন্তু গদ্যে চলতি ক্রিয়াপদ কারও কারও রচনায় ব্যবহার শুরু হয়েছে। চলতি ক্রিয়াপদ অর্থাৎ মুখের ভাষায় কবিতা হয় কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা ছিল। প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্য একেবারে পরিত্যাগ করলেও কবিতায় এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি, একেবারে শেষ জীবনেও তিনি কবিতায় সাধু এবং চলতি দু'রকম ক্রিয়াপদ মিশিয়ে দিয়েছেন:

কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান...

এখানে তিনি 'রচি তুলে', 'করিছ' এরকম সাধু ক্রিয়াপদের সঙ্গে মিশিয়েছেন 'এসে', 'হল'। কাছাকাছি সময়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন:

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চলা গতি...

এখানে সুধীন্দ্রনাথের ঝোঁক ক্রমশ চলতি ক্রিয়াপদের দিকে হলেও মাত্রা ঠিক রাখার জন্য সুবিধে মতন 'করেছিল' এবং 'থামিল' দু' রকমই ব্যবহার করছেন। বুদ্ধদেব বসুও সে রকম:

দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী
করিছে খাঁ খাঁ
(আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার,
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার;
তবু চলে এসো, মোর হাতে হাত দাও
তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

এখানেও মাত্রা-সমতা রক্ষার কারণে 'করিছে' এবং 'মোর' ব্যবহার করা সত্ত্বেও কবিতার মূল ঝোঁক চলতি ভাষার দিকেই। আর এক দশক পরেই দেখা গেছে যে বাংলা ভাষায় যাঁদের বলা হয় আধুনিক কবি, তাঁরা সাধু ক্রিয়াপদ একেবারেই বর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য কেউ ব্যবহার করছেন বেশি পরিমাণে আভিধানিক শব্দ, যেমন সুধীন্দ্রনাথ, আবার কেউ কেউ কামার-ছুতোর-মুটে-মজুরের মুখের ভাষা খুঁজছেন।

জীবনানন্দের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি এমন একটা কাব্যভাষা আনতে চাইলেন, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সচেতনা নেই। বাংলায় ক্রিয়াপদের সংখ্যা বড়ই কম। বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে একঘেয়েমি এসে যায়, কবিতায় সেই জন্য শেষ শব্দে ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু জীবনানন্দ যেন জোর করেই 'ফেলিয়াছি'র মতন একটা এলানো ক্রিয়াপদ বসালেন। একটু পরে আবার লিখলেন, 'বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে', এখানে ক্রিয়াপদটি অনায়াসে ভেতর দিকে চালান করা যেত, কিন্তু তিনি যেন কিছুই খেয়াল করছেন না, স্বগতোক্তির মতন পঙ্‌ক্তিগুলি বলে যাচ্ছেন। (বলাই বাহুল্য, স্বগতোক্তি কখনও কবিতা হয় না। কবিতা অত্যন্ত সচেতন শিল্প, বিশেষ ধরনের নির্মাণ। প্রতিটি শব্দ ওজন করে ব্যবহার করা কাব্য রচনার প্রাথমিক শর্ত। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি দেখলেই বোঝা যায়, তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থেকে, অনেক কাটাকুটি করে পঙ্‌ক্তি নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করা এটাই তাঁর নিজস্ব শৈলী।) ছন্দ-মিলের রীতি মানা কোনও আঁটসাঁট বাঁধুনি তাঁর নেই। (সেরকমও যে তিনি পারেন, আগের বইতে কিছু কবিতায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন) সেই জন্যই যেন হঠাৎ এসে পড়া কোনও শব্দ বা উৎপ্রেক্ষা ব্যাখ্যা করার দায়ও তাঁর নেই।

চারিপাশে বনের বিস্ময়
চৈত্রের বাতাস
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন।
ঘাই মৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—সেইখানে
জ্যোৎস্না আর নাই

'জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ', ঠিক এমনভাবে কেউ আগে লেখেননি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা দুর্বোধ্য নয়। সেই সময়কার পাঠক ও সমালোচকরা মনে করেছিলেন ধোঁয়াটে, অশরীরীর শরীর তখনও অনেকের ধাতস্থ হয়নি। কিন্তু এখানে আসল বিস্ময়কর শব্দ হচ্ছে 'অনেক'। 'গভীর' কিংবা 'নিবিড়' লেখার কোনও অসুবিধে ছিল না, মাত্রা ঠিক থাকত, তার বদলে 'অনেক'-এর মতন একটা সরল শব্দ তাঁর মাথায় কী করে এল? এ একেবারে নতুন বাংলা ভাষা। 'গভীর' কিংবা 'নিবিড়' শব্দের ব্যঞ্জনা কিছুটা ক্ষয়ে গেছে, তার বদলে 'কোথাও অনেক বনে'। ক্রমশই তিনি শব্দের এই বিপর্যয় ঘটাতে লাগলেন। 'মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে।' 'নোনা মেয়েমানুষ'?

কিংবা আরও পরে, 'বিপন্ন বিস্ময়', 'এক মাইল শান্তিকল্যাণ', 'প্রগাঢ় পিতামহী', 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়', 'সুপক্ক রাত্রির গন্ধ', 'সোনার পিত্তল মূর্তি', 'মেধাবী নীলিমা'...এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব।

'ঝরা পালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এমন চমকপ্রদ উত্তরণ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো বটেই, আজও রহস্যময় মনে হয়।

প্রত্যেক বড় মাপের কবিই ভাষাকে কিছু না কিছু সমৃদ্ধ করে যান। জীবনানন্দকে শুধু সে কৃতিত্ব দিয়ে থেমে থাকা যায় না, তিনি বাংলা কবিতার আকৃতিটাই বদলে দিলেন। এমন শব্দের পাশে শব্দ বসাতে লাগলেন, যা উপমা বা রূপক নয়, অবচেতনের বহিঃপ্রকাশ। অনেক পঙ্‌ক্তি পারম্পর্যহীন, যেন কোনও অর্থের সংযুক্তি নেই, অথচ বিনি সুতোর মালাও মনে হয় না, সুতোটি অদৃশ্য কিন্তু অনুভব করা যায়। এই সব কবিতা নিছক উপভোগের জন্য নয়, উপলব্ধির, বারবার পড়লেও পুরনো হয় না। অনেক প্রতিকূলতা, অনেক নিন্দামন্দ, অনেক সমালোচনার ঝড় সামলে জীবনানন্দের কবিতা যখন প্রতিষ্ঠা পেল, তার পর থেকে বাংলা কবিতার একটি বড় অংশ জীবনানন্দীয় ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল।

গদ্য সাহিত্যে, পৃথিবীর গদ্য সাহিত্যে তখন ন্যারেটিভ স্টাইলকে বিদায় দেওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফ্রানৎস কাফ্‌কার স্বীকৃতির পর উপন্যাসে নিছক কাহিনী বর্ণনা অনেকটা অবান্তর হয়ে যায়। চিত্রশিল্পেও অবয়ব ও বাস্তবতা বিদায় নিতে নিতে বিমূর্ততাই প্রধান হয়ে ওঠে। এরই প্রভাবে আর কিছুদিন পর এমনকী চলচ্চিত্রেও কোনও কোনও পরিচালক সাহিত্য-নির্ভরতা বা কাহিনীকেও বাদ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। শিল্পের সব শাখার মধ্যেই কিছু না কিছু যোগসূত্র থাকে। এক একটা যুগের বিশেষ প্রবণতা সামগ্রিকভাবেই শিল্পের ওপর পড়ে। সচেতনভাবেই হোক, অথবা বিশ্ব-আবহাওয়ার প্রভাবে, জীবনানন্দ দাশই প্রথম বাংলায় এই বিমূর্ত কাব্যরীতির প্রবর্তন করেন। পুরোপুরি নয়, অর্ধেক মতন।

পরবর্তী বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব পড়তে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। তাঁর সমসাময়িকরা তো বটেই, অব্যবহিত পরবর্তী কালেও সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-অরুণকুমার সরকার

প্রমুখ জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজস্ব রীতি খুঁজেছেন, তাঁদের মাথায় ছিল রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিন্তা।

বামপন্থীরা বিমূর্ত ধারাকে অপছন্দ করতেন একসময়ে। বিমূর্ত শিল্পে পরিষ্কার কোনও বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নেই। যে জন্য ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার জন্মস্থান চেকোশ্লোভাকিয়াতেই তাঁর রচনা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাশিয়াতে ডস্টয়েভস্কিকে অনেকদিন সুনজরে দেখা হয়নি। চিত্রশিল্পে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, জ্যাজ সংগীতকে বলা হত ডিকাডেন্ট। অর্থাৎ বিমূর্ততাকে প্রতিরোধ করারও একটা শক্তিশালী ধারা ছিল পাশাপাশি।

কিন্তু বিমূর্ততার একটা মোহ্ আছে। হয়তো যুদ্ধকালীন নারকীয় বাস্তবতার পর, সবরকম বাস্তবতার প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী কালে লেখক-শিল্পীরা অনেকেই বিমূর্ততার দিকে ঝুঁকে পড়ে। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতাতেও পড়ে এর প্রভাব, জীবনানন্দ দাশের মাধ্যমে। জীবিতকালে জীবনানন্দ দাশ প্রধান কবি ছিলেন না, কয়েক দশক পরে দেখা গেল যে, একমাত্র তিনিই তরুণ কবিকুলের আরাধ্য। এই প্রভাব অবশ্য পুরোপুরি সুখকর হয়নি।

জীবনানন্দের কবিতার প্রতি মুগ্ধতার ফলে তাঁর অনুসারীরা ধরে নিলেন যে, ইচ্ছেমতন যে-কোনও শব্দ ব্যবহারে আর কোনও বাধা নেই, কাব্যশরীরের নিখুঁত বাঁধুনি রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই, বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থ পরিস্ফুট করারও কোনও দায় নেই। এটা যেমন একদিকে সত্যি, আবার অন্যদিকে বিপজ্জনকও বটে। যিনি সত্যিকারের কবি, তিনি এই পথে সার্থক কবিতা রচনা করতে পারেন, আবার বহু অকবিও কাব্য-রচনা ব্যাপারটা খুব সোজা ভেবে ছাপার অক্ষরের জঞ্জাল বাড়িয়ে যায়। জীবনানন্দীয় ধারায় সবচেয়ে সার্থক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়; অসার্থক কবির সংখ্যাও অনেক। বিমূর্ত শিল্পে কোনও বক্তব্য থাকে না, এ কথাটাও ঠিক নয়। চড়া বক্তব্য কিংবা প্রচারমূলক কিছুর স্থান নেই। কিন্তু একথাও ঠিক, কবি বা শিল্পীর যে-কোনও চিন্তাই তাঁর বক্তব্য। বিশেষ কোনও চিন্তা ছাড়া শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। এবং শিল্পীর সেই চিন্তা যদি পাঠক বা দর্শককে একেবারেই স্পর্শ না করে তবে সে শিল্পসৃষ্টিও ব্যর্থ। পঞ্চাশের দশকে ছবির জগতে সমস্তরকম অবয়ব এবং আয়তনকে বর্জন করে যখন শুধু রঙের কারিকুরিই একমাত্র ব্যাপার হয়ে উঠল, তখনই বিমূর্ত শিল্পের পতন সূচিত হল। কবিতাতেও এমনকী মনস্ক পাঠকও যদি পরপর পঙ্‌ক্তিগুলির যোগসূত্র খুঁজে না পায়, তা হলে সে ক্রমশ কবিতার দিকে পিঠ ফেরাতে শুরু করে।

বাংলায় বিমূর্ত কবিতার বদলে বিশুদ্ধ কবিতা নামে একটি আখ্যা চালু হয়েছিল। বিশুদ্ধতা অর্থে কবিতায় কোনও বক্তব্য বা চিন্তার প্রকাশ পাবে না, কোনও কাহিনীর আভাস থাকবে না, কোনও নারী-পুরুষের জীবন্ত চরিত্র রাখা চলবে না। এটা আবার বিশুদ্ধতার বাড়াবাড়ি। জীবনানন্দের অনেক কবিতায় কাহিনীর আভাস আছে তো বটেই, জীবন্ত চরিত্রেরও ছড়াছড়ি। তা ছাড়া সত্তরের দশকের পর পৃথিবীর কাব্য ও চিত্রশিল্পে যে আবার একটি পালাবদল ঘটে গেছে, তা অনেকে লক্ষ করেননি। ছবিতে

এখন আর শুধু রং নয়, ফিরে এসেছে রেখা ও অবয়ব, গল্প-উপন্যাসে ফিরে এসেছে কাহিনী, কবিতাতেও নিছক শব্দের খেলার বদলে তার আড়ালে ঝিলিক দিচ্ছে কবির জীবনযাপন, এই পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর নিভৃত চিন্তা। সাহিত্য-শিল্পে ঢেউয়ের মতন মাঝেমধ্যেই এইরকম আকৃতি, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা যারা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা এখন প্রাচীনপন্থী।

পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশে একই ভাষায় কবিতা রচিত হলেও দুটি পৃথক ধারা বেশ স্পষ্ট। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বারবার বড় ধরনের আলোড়ন আসার ফলে তার প্রতিফলন দেখা গেছে সেখানকার কবিতায়। এরকম অবস্থায় কবিদের পক্ষে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাব্যরচনা সম্ভব নয়, কবিরা গলা মিলিয়েছেন জনসাধারণের সঙ্গে। তাঁদের কবিতা সেইজন্যই কিছুটা উচ্চকণ্ঠ এবং সোজাসুজি। পশ্চিমবাংলায় শব্দের খেলার দিকে ঝোঁক বেশি, বারবার বাজিয়ে বাজিয়ে শব্দের নিখুঁত ধ্বনিটা খোঁজা হয়েছে। অর্থের দিকে জোর না দিয়ে। এই খেলার একটা মাদকতা আছে, তবু কোথাও একটা সীমারেখা টানতে হয়।

কবিকে কখনও কখনও সোজাসুজি কথাও বলতে হয়, দেশে যদি একটি দাঙ্গা বাঁধে, তখনও যদি কোনও কবি শব্দের ধ্বনিমাধুর্য খোঁজেন, তখন সেই প্রক্রিয়াটাকেই অশ্লীল মনে হবে। তবে, যিনি শব্দচর্চা করেছেন, একটি শব্দের পাশে আর একটি ঠিক কোন শব্দ বসালে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠবে যিনি জানেন, তিনি সোজাসুজি কথা বললেও তা গদ্য হবে না। কোনও বড় শিল্পী যখন পোর্ট্রেট আঁকেন, তখনও তিনি শিল্পীই থাকেন, ফটোগ্রাফির অনুকারক হন না যেমন।

একমাত্র সংগীত, বিশেষত যন্ত্র-নির্ভর সংগীত ছাড়া আর কোনও শিল্প সম্পূর্ণ বিমূর্ত অবস্থায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। ভোরের কুয়াশায় পৃথিবী ছেয়ে যায়, সব কিছুই মনে হয় অস্পষ্ট, রহস্যময়; আবার কিছুক্ষণ পরেই ঝকঝকে রোদ ওঠে। কখনও জমজমাট কপিশ মেঘে দিনের আলোয় নেমে আসে অন্ধকার; ঝড়বৃষ্টির পর ঝকঝকে তারাভরা আকাশ, এক একদিন এমন ঝকঝকে জ্যোৎস্না, যাতে অনায়াসে চিঠি লেখা যায়। প্রকৃতির এই যে লীলা বৈচিত্র্য, তার ছাপ যেমন পড়ে পৃথিবীর মানুষের জীবনে, তেমনি বিভিন্ন শিল্প-আঙ্গিকে।

বাংলা কবিতায় বিমূর্তধারা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আরও প্রয়োজনীয় ছিল তাকে অতিক্রম করার। রবীন্দ্রনাথ যেমন শেষ কথা নন, তেমনই জীবনানন্দও শেষ কথা হতে পারেন না। একবার ছন্দ ভাঙার স্বাধীনতা পাবার পর যেমন অনায়াসেই আবার ছন্দে ফেরা যায়, সেইরকমই মানুষের কথা, জীবনের কথা, সমাজের কথা বর্ণনার মাঝে মাঝেও আনা যায় বিমূর্ততার ছোঁয়া। কবিকে সত্যদ্রষ্টা বলাটা হয়তো বাড়াবাড়ি, কবিতা লিখে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাও অবাস্তব, তবু, কেউ মানুক বা না মানুক, কবিকে এই পৃথিবীর বিশুদ্ধকরণের কথা বলে যেতেই হয়। সেই জন্যই কবিরা, শুধু শব্দ ঝংকার বা সংগীত-প্রভাবের মোহ কাটিয়ে বারবার ফিরে আসেন সোজাসুজি কথা বলার দিকে। বিভিন্ন যুগে সেটাই আধুনিকতা। বাংলা কবিতার এখনকার ঝোঁকও সেইদিকে। বর্তমান দশকের তরুণ-তরুণীদের কবিতা পড়লে

বোঝা যায়, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় যেরকম কবিতা রচিত হচ্ছে, তার চেয়ে বাংলা কবিতার মান কোনও অংশে কম নয়। পূর্ববর্তী কবিরা শব্দচর্চার যে উন্নত স্তর তৈরি করে গেছেন, তার নীচে নেমে আর সম্ভব নয় কবিতা রচনা করা। শব্দের সেই বিশুদ্ধতার মধ্যেও ফুটে ওঠে তাদের জীবন-ছবি, চিরকালীনের পটভূমিকায় সমসাময়িকের এক একটি বিন্দু, রাত্রি এবং দিন, স্বপ্ন ও জেগে থাকা দিনের রূঢ়তা। বাস্তবের পাশাপাশি বিমূর্ত, অতি সরলও নয়, নিছক দুর্বোধ্যও নয়।

কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা*

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন শুধু কবিদের কবি। এখন তিনি সমস্ত মানুষের। সমস্ত মানুষের কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হল। কোনও দেশেই কোনও কবি আক্ষরিক অর্থে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন না। কিংবা, যিনি পারেন, তিনি বিশুদ্ধ কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কবির সমাদর শুধু হৃদয়সংবাদীর কাছে।

কিন্তু বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে জীবনানন্দের নাম পৌঁছে গেছে। কবিতা পাঠে যাঁদের আগ্রহ নেই, তাঁরাও এখন জানেন জীবনানন্দ দাশ বাংলা ভাষায় একজন প্রধান কবি। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর তাঁর নাম স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। কিছুকাল আগেও আধুনিক কবিতাকে নিন্দা করার জন্য জীবনানন্দ দাশের লাইন উদ্ধৃত করা ছিল প্রচলিত প্রথা, এখন আস্তে আস্তে তিনি পেয়েছেন শ্রদ্ধার আসন।

যদিও পশ্চিমবাংলার জীবনে বা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব এখনও তেমন দেখা যায় না। উনিশ শো পঞ্চাশ সালের পর থেকেই জীবনানন্দ খাঁটি অর্থে আবিষ্কৃত হয়েছেন, তৎকালীন ও পরবর্তী কবিরা রবীন্দ্রনাথের বদলে জীবনানন্দেরই অধমর্ণ। গদ্য লেখকদের কাছে জীবনানন্দ এখনও প্রায় অনুপস্থিত, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখনও তাঁর বিশেষ স্থান হয়নি। তাঁর জন্ম তারিখে উৎসব করার রীতি নেই, পৌরসভা রাস্তার নাম বদলাবার সময় তাঁর নাম মনে করতে পারেন না। এসব অবশ্য আফশোস করার বিষয় নয়, কারণ কবির প্রকৃত সম্মান কবিতা পাঠকদের কাছে, জীবনানন্দ তা পেয়েছেন—বাদ বাকি সবই অবান্তর।

অথচ, পাশের বাংলাদেশের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির লড়াইয়ের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ জড়িয়ে গেছেন। সেখানকার মুক্তিকামী মানুষ প্রেরণা পেয়েছেন এই কবির কাছ থেকে—জননেতারা প্রকাশ্য সভায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর কবিতার। বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বাংলার রূপ বর্ণনা তিনি যেভাবে করেছেন, তা সাহিত্যের নানা ব্যাখ্যার মতো, কে কোন রচনা থেকে কীরকম ভাবে প্রেরণা পায় তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। এডগার অ্যালান পো আমেরিকাতে তেমন মূল্য পাননি, কিন্তু তাঁর রচনার সূত্র ধরেই ফরাসি দেশে শুরু হয়েছিল নতুন সাহিত্যধারা।

আমার কাছে জীবনানন্দ দাশের এখনও সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি কবিদের কবি। তাঁর কবিতায় সুর সংযোজন করে গান করা হবে, কিংবা নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য রচিত হবে তাঁর কবিতা অবলম্বনে—এমন আশঙ্কা করি না। সে রকম দুর্দৈব ঘটার দরকার নেই। বিশুদ্ধ কবিতার রস আস্বাদন করার জন্য যাঁদের আগ্রহ, জীবনানন্দ

দাশের রচনা সংগ্রহ তাঁদের শিয়রের কাছে রেখে দেবার মতন।

এ রকম কবি যে কোনও দেশেই বিরল, যিনি প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরন প্রবর্তন করে যেতে পারেন। এবং যাঁর কবিতা বারবার পড়লেও পুরনো হয় না।

এই বারবার পড়ার বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। কবিতায় প্রতিফলিত হবে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সর্বসাধারণের সুবোধ্য হয়ে তা জীবনাশ্রয়ী বক্তব্যের বাহন হবে—এরকম একটা মত প্রচলিত আছে। এই মত মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পাঠক হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, বক্তব্যভারাক্রান্ত কবিতার দুর্বলতা এই, তা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না। অল্পক্ষণেই তার আকর্ষণ চলে যায়। বক্তৃতায় বা ইস্তাহারে যে বক্তব্য আমাদের উত্তপ্ত করে, কবিতার মধ্যে অচিরেই তা আমাদের ক্লান্ত করে দেয়। কোনও একটি রচনা শিল্প হিসেবে তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে বারবার আকর্ষণ করার মতন কোনও সাবলীল রহস্য জন্মায়। আমাদের সাধারণ মুখের কথায় নির্বাচন ও যোজনার কৃতিত্বে কবিরা রহস্যধ্বনি করে তোলেন 'মায়াবীর মতো জাদুবলে'। এবং জীবনানন্দ দাশ একজন অতুলনীয় মায়াবী।

এই সংগ্রহে আছে জীবনানন্দের জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'। এবং তাঁর মধ্যজীবনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 'সাতটি তারার তিমির'। একসঙ্গে পাওয়ার ফলে, দেখার সুবিধে হবে এই কবির ক্রমিক পরিণতির ইতিহাস। 'ঝরা পালক'-এর কবিতাগুলি পড়লে বিশ্বাসই হতে চায় না, এই কবি কোনও একদিন 'বেলা অবেলা কালবেলা'র ভাষ্যকার হবেন। 'ঝরা পালকে' আবেগময় কিশোর কবিজীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে অনেক ভাবগর্ভ কথা উচ্চারণ করেছেন—যা আসলে চিরাচরিতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কবির নিজস্বতা নেই, শব্দের মায়া নেই, ভাবালুতায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। জীবনানন্দের তুলনায় অনেক অপ্রধান কবিরও প্রথম কবিতার বই এত কাঁচা নয়। তবু 'ঝরা পালকে'র একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই কবিতাবলী দেখে বোঝা যায়, উল্কাপাতের মতন এই কবি বাংলা কবিতার জগতে আবির্ভূত হননি। তিনি ট্রাডিশনের অন্তর্গত, এক সময় প্রথাসিদ্ধ কবিতার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। শব্দ নির্বাচনে নজরুলের এবং ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। এই প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে নিজস্ব ধারার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব আরও বিস্ময়কর। নজরুল বা সত্যেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু জীবনানন্দ এই তিনজনের থেকে অনেক আলাদা হয়ে সরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই জীবনানন্দের কবিতা এখনও নবীন কবিদের রচনার আকর।

'সাতটি তারার তিমিরে' তিনি সেই পরিপূর্ণ নতুন কবি। 'ঝরা পালকে' তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, দুর্বল পঙ্‌ক্তি সত্ত্বেও সংস্কৃতঘেঁষা গম্ভীর শব্দের পাশে চলিত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক। পরবর্তী কালের কবিতায় সেই সব শব্দ অনিবার্যভাবে এসেছে। বাংলা কবিতার পাঠক প্রথম দেখল এই ধরনের লাইন, 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে' কিংবা 'জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা ব্যবহার করে

নিতে গেল সোঁদা ফুটপাথে বসে' কিংবা 'শ্বেতাঙ্গ দম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো সময় পোহায়ে যায়।'

'বেলা অবেলা কালবেলা'র শেষ কবিতার কয়েকটি লাইন এই রকম:

দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা নীলাকাশ...

এই লাইনগুলির মধ্যে যে একটা অপার বিস্ময়বোধ আছে, আমার মনে হয় সেটাই জীবনানন্দের কবিতার শেষ কথা।

---

*এই রচনাটি শ্রাবণ ১৩৭৮-এ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ (২য় খণ্ড)-এর ভূমিকা হিসেবে লেখা হয়েছিল। কেন আমার মতন একজন তৎকালের তরুণ কবিকে এই ভূমিকা লিখতে বলা হয়েছিল, এবং কেনই বা আমি লিখতে রাজি হয়েছিলাম, তা আজ আর মনে নেই।

আমাদের ঋণ

'তাঁর অনতিবর্ধ শরীরে বজ্রকঠিন দার্ঢ্য লেখা আছে'—অনেকটা এইরকম ভাষায় বর্ণনা পড়েছিলাম কল্লোল যুগ গ্রন্থে। একটু শক্ত কথা, চট করে মানেটা বোঝা যায় না, তা ছাড়া তখনও বুদ্ধদেব বসুকে চোখে দেখিনি। চোখে দেখার পর বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ। লাজুক এবং সাহসী। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। যে-কোনও সময়ে গলার আওয়াজ উঁচুতে উঠে যায়। এবং মাঝে মাঝেই, কিংবা প্রায়ই তিনি অসম্ভব জোরে হেসে ওঠেন। তিনি সেই হাসি সঞ্চারিত করে দেন অন্যদের মধ্যে।

না, আমার ভুল হচ্ছে। ওঁর সম্পর্কে আমি বর্তমান ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু আর বেঁচে নেই। মৃত্যু এই পৃথিবীর একটি সরল সত্য ঘটনা, তবু বিশ্বাস হয় না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কল্লোল যুগ' যখন প্রকাশিত হচ্ছিল 'পূর্বাশা' পত্রিকায়, আমরা দুর্দান্ত আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। যে-সমস্ত লেখকরা তখন আমাদের দেবতা, যাঁদের তখনও চোখে না দেখেও পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন মনে হয়, তাঁদের জলজ্যান্ত জীবনের কথা কী আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে ওই গ্রন্থে। আমরা তখন সদ্য কলেজীয় যুবক, একটু লেখালেখি শুরু করেছি, চায়ের দোকানে বসে বন্ধুবান্ধবদের কবিতা শোনাই। কিন্তু কোনও চিত্রতারকা বা রাজনৈতিক নেতা কিংবা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবন সম্পর্কে তেমন আগ্রহ বোধ করিনি, বরং অদম্য কৌতূহল ছিল সেইসব লেখকদের সম্পর্কে, যাঁরা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধবৎ করে রেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুকে চাক্ষুষ দেখার আগেও তাঁর সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি আমাদের সংগ্রহে এসে যায়। এর মধ্যে সবকিছুই যে গৌরবজনক, তা নয়। একটা বয়েস থাকে যখন সম্মানিত ব্যক্তিদেরও খানিকটা হেয় করে একধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত—তাঁদের নামে নানারকম সত্যিমিথ্যে গল্প জুড়ে একটু ছোট করতে পারলে অহংকারে বাতাস লাগে। তাছাড়া, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক রকম গুজব প্রচলিত থাকেই। আমরা শুনেছিলাম, বুদ্ধদেব বসুর মতন অহংকারী মানুষ নাকি আর দুনিয়ায় দুটি নেই, বাড়িতে কেউ গেলেই উনি বিলিতি কুকুর লেলিয়ে দেন। পরে দেখেছি, ওঁর মতন খাঁটি অর্থে ভদ্রলোক খুব কমই আছে এবং ওঁর বাড়িতে কেউ গেলে সচরাচর উনি নিজেই দরজা খুলতেন। বিলিতি কুকুর কখনও দেখিনি। তবে একটা শান্ত ও কবি-কবি মুখের দেশি কুকুর আছে, প্রতিভা বসুর পোষ্য। এই কুকুর প্রসঙ্গে একটি লম্বা গল্প আছে, যার শেষ দিকটা মর্মান্তিক

রকমের।

বুদ্ধদেব বসু সারাজীবন বহু নিন্দেমন্দ সহ্য করেছেন। প্রায় বালক বয়েসেই বিখ্যাত হয়েছেন এই কারণে—এবং শেষ জীবন পর্যন্ত বহু কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে তাঁর দিকে। এই নিন্দুকদের মধ্যে একদল বলাই বাহুল্য, ঈর্ষাপরায়ণ অক্ষম, আর এক দল রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আর একটি দল, আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁরা বুদ্ধদেব বসুকে ঠিকমতন চিনতে পারেননি এবং নানারকম গুজবে বিশ্বাসী হয়েছেন।

যখন বুদ্ধদেব বসুকে চিনতাম না, তখন থেকেই অন্যদের সঙ্গে প্রায়ই দারুণ তর্ক করতাম বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে। আমাদের মনোভাব অনেকটা এরকম ছিল, আমরা নব্য লেখক, আমরা পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে যা-খুশি বলতে পারি, কিন্তু অন্যরা কেন বলবে? সেই সময়ে ছাত্র মহলে সাম্যবাদের দিকে দারুণ ঝোঁক, আমরাও ছিলাম—কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা কেউই স্পষ্ট ভাবে বোঝাতে পারেননি। এক একজন এক-এক রকম কথা বলতেন, অতি উগ্ররা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া, তারাশঙ্করকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুদ্ধদেব বসুকে উন্মার্গগামী কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দিয়েছেন। একজন লেখক নিজেদের দলে নয় বলেই তাঁর সাহিত্যমূল্য খর্ব করার চেষ্টা আমার কাছে বরাবরই ন্যক্কারজনক মনে হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, বুদ্ধদেব বসু একজন প্রকৃত সাহসী লেখক—কোনও হীনতার কাছে মাথা নিচু করেননি কখনও। একবার মাত্র তিনি ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তারপর আর জীবনে কখনও কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নাম জড়াননি। তিনি সাম্যবাদী দলে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে কখনও ক্ষমতাসীন শাসক দলের ছত্রছায়াতেও গিয়ে দাঁড়াননি। সুবিধে ভোগের চেষ্টা করেননি কোনওদিন, হাওয়া বুঝে মত বদলাননি। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, একজন লেখকের পক্ষে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই যে সম্মানজনক, তিনি তা দেখিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগেই তাঁর বিষয়ে তর্ক করতাম কেন বিরোধীদের সঙ্গে? তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি সব সময়ে আমাদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বেশি প্রিয়, কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশকে অনেক বেশি ভালবেসেছি হয়তো—কিন্তু সব মিলিয়ে, সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুদ্ধদেব বসু আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। তিনি সব সময়েই কিছু না কিছু একটা কাণ্ড করেছেন। এবং তিনি কখন কী লিখছেন—তার দিকে লক্ষ না রেখে উপায় নেই। তাঁর যে-কোনও নতুন লেখাতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনও না কোনও উপায়ে নতুন। তারাশঙ্কর তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে আমাদের অনাগ্রহী করে তুলেছিলেন—ভাল বা খারাপের প্রশ্ন নয়, নতুনত্ব ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর কল্লোলের বন্ধুরা প্রায় তো লেখা থামিয়েই দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত সজীব থাকতে পেরেছিলেন বলেই স্থবির হননি। অকস্মাৎ এক সময় তিনি কবিতা উপন্যাস ছেড়ে মন দিলেন অনুবাদে, বোদলেয়ার, রিলকে, হেল্ডার্লিন, এদিকে কালিদাস—অনুবাদের জন্য যে কতখানি

নিষ্ঠা লাগে, স্থাপন করলেন তার দৃষ্টান্ত। অনুবাদ ছেড়ে আবার উপন্যাসে, বাধালেন একটা হইহই কাণ্ড। ফের শুরু করলেন নাটক ও কাব্যনাটক। সেই নিয়ে কিছুদিন কাটল। কাব্যনাটকগুলি সবেমাত্র একঘেয়ে হতে শুরু করেছে, আমরা বুদ্ধদেব বসুকে খরচের খাতায় লিখবো লিখবো করছি, এমন সময় দুম করে আরম্ভ করলেন মহাভারতের কথা—ওই দুর্ধর্ষ বাংলা গদ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় আছে! এবং প্রায়ই এক সঙ্গে লিখতে লাগলেন পর্বে পর্বে তাঁর আত্মজীবনী, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতির পর—এই ধরনের এমন মধুর রচনা আমি আর পড়িনি।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন পুরোপুরি সাহিত্যিক। তিনি আমাদের দেখিয়ে গেলেন যে অন্যান্য পেশার মতনই সাহিত্যও একটি অতি পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং একজন লেখককে পাঠক হিসেবেও কত খাঁটি হতে হবে।

দিনের মধ্যে ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি পড়াশুনো ও লেখালিখির মধ্যে ডুবে থাকতেন, বিদেশি সাহিত্যের প্রচণ্ড অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও খবর রাখতেন সাম্প্রতিকতম বাংলা রচনার। আমাদের মতন ক্ষুদ্র লেখকদেরও তিনি ডেকে ধমক দিতেন, লেখার ত্রুটি নির্দেশ করতেন, তাতে আমাদের শ্লাঘার বিষয় এই ছিল যে, আমরা একেবারে মনোযোগের অযোগ্য হইনি।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমার মতের মিল না হওয়ার কথা। সাহিত্য কিংবা জীবন বিষয়ে আমরা ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছি, ওঁর নির্দেশ অধিকাংশ সময়েই মানিনি। তবু, কখনও মুখে মুখে তর্ক করতে পারিনি—কারণ, আমার দুর্বলতা এই, যে লেখকের রচনা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়ে থেকেছি, তাঁর মুখোমুখি এসে কখনও স্বাভাবিক হতে পারিনি, আড়ষ্টতা থেকেই যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার তেমন সাক্ষাৎ-পরিচয়ই হয়নি, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে কখনও জানাবার সুযোগ পাইনি যে, একসময় ওঁদের রচনা আমাকে কত পাগল করেছে। বুদ্ধদেব বসুও শেষ পর্যন্ত আমাকে একটি অবাধ্য যুবক হিসেবেই জেনে গেলেন।

অথচ, 'অন্য কোনোখানে' কিংবা 'মৌলিনাথ' প্রভৃতি উপন্যাস যখন প্রথম পড়েছি, কয়েকটা দিন বিহ্বল হয়ে থাকতাম—হাতখরচের সামান্য পয়সা বাঁচিয়ে সেইসব বই কিনে বন্ধুবান্ধবদের পড়াতাম—যে-কোনও সুন্দর জিনিস যেমন সবাই মিলে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয়, আমি যা পেয়েছি, আমার প্রিয় কেউও যদি সেটা না পান, তা হলে যেমন আশ মেটে না। 'মৌলিনাথ' বইখানি আমি তিন কপি কিনেছিলাম। পরবর্তীকালে কারুর কারুর মুখে শুনেছি, ওটা উপন্যাসই নয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সমস্ত উপন্যাস সম্পর্কেই এরকম মন্তব্য করেছেন কোনও-কোনও সমালোচক। সমালোচকরা এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই ভাল জানেন, কিন্তু আমি কী করে অস্বীকার করব, বুদ্ধদেব বসু যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমাদের বুদ্ধিনির্ভর এক স্বপ্নের জগৎ, যেখানে উদ্ভাসিত হয় সুন্দরের এক-একটি অংশ—হয়তো খুবই রোমান্টিক, কিন্তু ভাষাশিল্পের যে এক-একটি সুন্দর প্রতিমা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজকাল দাবি উঠেছে, উপন্যাসকে সমাজসচেতন হতে হবে, তার মধ্যে মানুষের

মঙ্গল কিংবা শ্রেণী বৈষম্য দূর করার কথা থাকা উচিত—এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে লেখক শিল্পীদের রোমান্টিকতার ওপরে এবং এতেই যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জানি, বুদ্ধদেব বসু তাঁর মধ্যবয়েস পর্যন্ত যেসব উপন্যাস ও গল্প রচনা করে গেছেন, সেই ধারায় এখন আর কেউ লিখবে না—তিথিডোর বা নির্জন স্বাক্ষরের সেই চুপচাপ, মন্থর গতি, সেইসব স্পর্শকাতর ভাবুক মানুষরা হারিয়ে যাবেন, তবু সেজন্য আমার অন্তত দুঃখবোধ থাকবেই। অনেক সার্থক উপন্যাস পড়ব ভবিষ্যতে, বাহবাও দেব, কিন্তু ওই সৌন্দর্যের স্বাদ আর পাব কি?

বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঋণ কবিতার জন্য। যাকে আমরা এখনও আধুনিক কবিতা বলি, সেই আধুনিক কবিতাকে তিনি একাই জিতিয়ে দিয়ে গেছেন। আরও অনেক বড় বড় কবি এসেছেন রবীন্দ্রনাথের পরে, কিন্তু সকলের হয়ে লড়াই করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'আধুনিক কবিতা' ছাড়া অন্য যে কবিতার ধারা, সাধু ক্রিয়াপদ ইত্যাদি—সেটি এখন হেরে গেছে নিশ্চিত ভাবে। এটা বুদ্ধদেব বসুর একক কৃতিত্ব যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জীবনানন্দ দাশ যখন প্রায় অপরিচিত, তখন বুদ্ধদেব বসু অবিরাম প্রবন্ধ ও আলোচনায় লোকসমক্ষে এনেছেন তাঁকে। একজন কবি আর-একজন জীবিত কবি সম্পর্কে এরকম উৎসাহ নিয়ে লিখেছেন, এ দৃষ্টান্ত বিরলের চেয়েও বিরল। শুধু জীবনানন্দ নয়, তিনি ওইরকমই লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে। অন্যরা অবশ্য বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে প্রায় কিছুই লেখেননি, অথবা যৎসামান্য, কিন্তু তিনি তো সে বিষয়ে চিন্তা করেননি কখনও।

তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন নবীন কবিরা। কবিতা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীদের যে কত ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত। একজন নবীন কবি কী করে জানবেন যে তার কবিতা সক্ষমতার সীমারেখাটা স্পর্শ করেছে কিনা? কবিতা পত্রিকা ছিল সেই মানদণ্ড। বুদ্ধদেব বসুর মতন একজন কবির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার পর আত্মবিশ্বাস অনেক দৃঢ় হয়।

কবিতা পত্রিকা সম্পাদনার সময় তাঁর নিষ্ঠা ছিল তুলনাহীন। প্রত্যেকটি চিঠি তিনি নিজের হাতে উত্তর দিতেন। এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতভাবে। আমরা একটা কবিতা তাঁর ঠিকানায় ডাকবাক্সে ফেলে পরের দিনই উত্তর পেয়ে যেতাম। কবিতা ভবনের ছাপ আঁকা খামে তাঁর খয়েরি কালিতে লেখা হাতের লেখা দেখলেই আমাদের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠত।

এই প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠানো আমার প্রথম কবিতাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটুখানি বদলে। সেই বদলটুকু আমার পছন্দ হয়নি। পরে আর একটি সংকলনে সেটি অন্তর্ভুক্ত হলে আমি আবার সেটি নিজের মতন করে দিই। এর দু'তিন বছর বাদে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় এক সভায়—সেখানে তিনি আমার পরিচয় পেয়েছিলেন অন্যভাবে, আমি ওঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের

মেয়ের প্রাইভেট টিউটর ছিলাম। পরে জিজ্ঞেস করলেন, ও, তুমিই কবিতা লেখো? তোমার চেহারা দেখলে তো তা বোঝা যায় না। এই বলে তিনি এত জোরে হাসলেন, যে-রকম আমরাও সহজে হাসতে পারি না। তারপর, আমার সেই কবিতাটিতে ওঁর সংশোধন আমি মানিনি কেন সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। আসলে সেটা আমার গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছু না। এর পরে আমি আর একটা কবিতা পাঠাবার পরেই তিনি সেটা ফেরত দিয়ে জানালেন, এই কবিতাটিতে কিছু কিছু বদল দরকার।

আমি চুপচাপ চেপে গেলাম। এর বছরখানেক পরে আবার এক জায়গায় দেখা, উনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, তুমি আর লেখা পাঠাও না কেন? আমি ব্যগ্র হয়ে বললাম, পাঠাব? আপনি অনুমতি দিলেই পাঠাতে পারি। উনি আবার সেইরকমভাবে হাসলেন। বাড়ি ফিরেই আমি আবার সেই পুরনো কবিতাটাই একটুও না বদল করে পাঠালাম। এই রকম ভাবে সেই একই কবিতা আমি 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এটা আমার একটা নিতান্ত ছেলেমানুষি জেদ। এই ঘটনাটার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, কতখানি উদারতা থাকলে এই ধরনের ঔদ্ধত্য এবং মূর্খামি সহ্য করা যায় তা বোঝা যাবে। উনি তো আমার কবিতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দিলেই পারতেন। উনি আমাদের প্রতি মনোযোগ দিতেন বলেই আমরা মনোযোগ দিয়ে ওঁর কথা শুনতাম। এ রকম ব্যবহার তো আর কারুর কাছে পাইনি। পরবর্তীকালে ওঁর কথা শুনে আমি অনেক কবিতা সংশোধন করেছি। একই ক্রিয়াপদ দিয়ে যে পর পর দুটি বাক্য শেষ করা উচিত নয়, এটা ওঁর কাছ থেকেই প্রথমে শিখি। খুবই সামান্য ব্যাপার—কিন্তু নবীন লেখককে তো কারুর এটা বলে দেওয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর স্থান নেবার মতন কেউই রইলেন না। পরবর্তীকালের লেখকদের পক্ষে এটা এক বিরাট ক্ষতি। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যাদর্শে কারুর বিশ্বাস থাক বা না থাক, যে বুদ্ধদেব বসুর সব রচনা পড়বে না, সে বাংলা ভাষার অনেক কিছুই শিখবে না। সে দরিদ্র থেকে যাবে।

বুদ্ধদেব বসু

হাওয়াই থেকে একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু আমাকে লিখেছিলেন যে সেখানকার প্রকৃতি তাঁকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে, অতিশয় গাঢ় রঙের আকাশ এবং সুসজ্জিত বৃক্ষরাজি থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন, আমার মুশকিল হচ্ছে এই যে, এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখলেও আমার কোনও না কোনও বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ে, আমি ভুলতে পারি না, বিশ্ব সাহিত্যের রত্নরাজি আমার মধ্যে ভিড় করে আসে। আমি শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সবকিছু উপভোগ করি, এ ছাড়া নিছক সাদা চোখে কিছু দেখার ক্ষমতা আমার চলে গেছে। (এটা তাঁর চিঠির অবিকল ভাষা নয়।)

আমার মনে হয়, এটাই বুদ্ধদেব বসুর সঠিক পরিচয়। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা সাহিত্যের মধ্যেই বেঁচে থাকতেন, কখনও লেখায়, কখনও অন্যদের রচনায়। তিনি ব্যক্তি-জীবনে মোটেই নীরস মানুষ ছিলেন না। বরং সদা ছটফটে এবং হাস্যময়, কিন্তু তাঁর রসিকতা এবং উপভোগের ব্যাপারগুলিও ছিল সাহিত্য সংক্রান্ত, অন্য কোনওরকম অসমীচীন কথাবার্তা তাঁর পছন্দ ছিল না। কখনও উৎসাহ দেখাতেন বটে মাছ বিষয়ে, বাঙালি রন্ধন প্রণালী সম্পর্কেও তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু এই সব কিছুই সাহিত্যমনস্ক আগ্রহ। তিনিই একবার বলেছিলেন, মৌরলা মাছ কখনও শিশু, তরুণী বা বৃদ্ধা হয় না—সব মৌরলা মাছই কিশোরী।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মতের মিল ছিল খুব কম। প্রায়ই বেশ ঝগড়াঝাঁটি হত। যখন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, ডাকে কবিতা পাঠাতাম 'কবিতা' পত্রিকায়, তিনি প্রতিবার সযত্নে উত্তর দিতেন, কিছু কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিতেন—এতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

এরপর যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁর বাড়িতে যাবার একটা অধিকার জন্মায়, আমরা যে-কোনও সময় হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হতাম। একবার আমরা কয়েকজন মিলে গিয়েছিলাম রাত সাড়ে এগারোটার বা তারও একটু পরে।

একবার রাত দুটোর সময় শরৎ ওঁকে টেলিফোন করেছিল, ঝোঁকের মাথায়।

কেন এরকম যেতাম? গেলেই তো ঝগড়া। উনি বরাবর অভিযোগ করতেন, আমরা ছন্দ জানি না। তখন ওঁর 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' বেরিয়েছে—সেখানে তিনি ছন্দকে একটু আলগা করে দিয়েছেন, পয়ারের কোনও কোনও পর্ব সাত মাত্রায় ছেড়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর ঝোঁক সুরেলা করার দিকে। আর আমরা চাইছি কবিতাকে আরও আঁট করতে, কথ্যভাষায় ধ্বনি সরাসরি ঢুকিয়ে দিতে, হসন্তগুলি অগ্রাহ্য করে প্রথম পর্বে ন' মাত্রাতেও নিয়ে যেতে। আমরা বলতাম,

আমরাও আপনার এই নতুন ছন্দ মানি না। তারপরেই বেঁধে যেত তুমুল তর্ক।

তবু কেন যেতাম? তার কারণ, এখন বুঝতে পারি, বর্ষীয়ান কবিদের মধ্যে আর এমন কেউ ছিলেন না তখন, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করার ব্যাপারেও আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে। যাঁর কাছে আমরা নিজেদের কথাগুলি খোলাখুলি বলতে পারি। যিনি আমাদের যুক্তি না মানলেও আমাদের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করবেন না। আর সবাই ছিলেন বড় দূরে, দেখা হলে বড়জোর একটু ভদ্রতার হাসি, কিংবা প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আমাদের মধ্যে সব সময় জীবন্ত।

শেষ জীবনে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরই শেষ জীবনে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বেশ একটা হৃদ্যতা হয়েছিল। স্বভাব-কুঁড়ে বুদ্ধদেবকে প্রায়ই দেখা যেত সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আড্ডায়। যেহেতু সংযোগকারী হিসেবে অনেক সময়েই থাকত আমাদের বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্ত, তাই কয়েক বার সেই আড্ডায় যোগদান করার সুযোগ পেয়েছি। এই দুই কবির আলাপচারি, একই সঙ্গে পরিহাস ও রঙ্গরসের সমন্বয়, আমাদের বহু সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার অনুরাগী নই, বুদ্ধদেব বসুরও কবিতার চেয়ে গদ্য রচনাই আমার বেশি পছন্দের—তবু, এঁদের কাছে গিয়ে মনে হত খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে এসেছি। সামান্য লেখালেখি শুরু করার পর, নিজের বাবা-কাকা-মামা-জ্যাঠাদের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে, দেখাসাক্ষাৎ অনেক কমে গেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে অনুভব করেছি, অদৃশ্যভাবে রয়েছে একটি বিশাল পরিবার, সেই পরিবারে আমরা কেউ খুব ছোট, অনেকে বড়, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

দুশো দুইয়ের বাড়ি থেকে একদিন বেশ রাত্রে ফিরছি, উনি সিঁড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, যে-কোনও কারণেই হোক সিঁড়িতে আলো ছিল না। উনি বললেন, অন্ধকারে—

কথাটা মনে আছে, কারণ উনি 'অন্ধকারে' এই পর্যন্ত বলে একটু থেমেছিলেন, আমি সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—উনি তখনও থেমে আছেন দেখে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা যাই! উনি আবার বলেছিলেন, অন্ধকারে দেখে দেখে যেও!

অতি সাধারণ সামান্যই কথা, তবু মনে আছে এইজন্য যে উনি 'অন্ধকারে—' বলে থেমেছিলেন।

টুকরো টুকরো স্মৃতি

কবিতা পত্রিকায় আমরা রচনা পাঠাতুম ডাকযোগে, তারপর দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা। অতি তরুণ কবিদের অধীরতার কথা সম্পাদকমশাই বুঝতেন, তাই তাঁর স্বহস্তে লেখা চিঠি আসতে মোটেই বিলম্ব হত না। এখন অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, ব্রিটিশ আমলে তো বটেই, এমনকী পঞ্চাশের দশকেও কলকাতায় সকালবেলা কোনও ডাকবাক্সে চিঠি ফেললে সে চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছে যেত সন্ধ্যাবেলা। দিনে তিনবার ডাক বিলি হত, এমনকী রবিবারেও শোনা যেত পোস্টম্যানের পদধ্বনি। এমনও অনেকবারই হয়েছে, কবিতা পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়ে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে গেছি পরের দিনই। সেই সকৃতজ্ঞ আনন্দের অভিজ্ঞতার কথা কোনওদিনই ভুলবার নয়!

কোনও পত্রিকা অফিসে নিজে গিয়ে কবিতা পৌঁছে দেবার কথা আমি চিন্তাই করতে পারতুম না। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর দুশো দুই নম্বর বাড়িটির সামনে দিয়ে গেছি অনেকবার, এমনকী উলটোদিকের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটেছি অকারণে, তবু ভেতরে প্রবেশ করার সাহস হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন অতি বিখ্যাত ও ব্যস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মতন একটি অকিঞ্চিৎকর লোক কী কথা বলবে, কেনই বা অকারণে তাঁর সময় নষ্ট করা হবে? কবিতা পত্রিকায় আমার তিন চারটি কবিতা ছাপা হয়ে যাবার পরেও সেই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আমার পাঠানো প্রথম কবিতাটিই তিনি মনোনীত করেছিলেন। সেই কবিতার নাম 'তুমি', কিছুদিন পর আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' নামের বিখ্যাত সংকলনের একেবারে শেষতম কবিতা হিসেব ওই কবিতাটি গ্রহণ করে আমাকে খুবই লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। যে কোনও কবিতাই ছাপা হয়ে যাবার পর তার দুর্বলতাগুলি আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠত, আমার মনে হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু ও আবু সয়ীদ আইয়ুব এই দু'জনেরই নির্বাচন ভুল হয়েছে। আমার পাঠানো তৃতীয় কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু ফেরত পাঠিয়ে কিছু সংশোধনের উপদেশ দিয়েছিলেন। কতটা কী সংশোধন করেছিলুম মনে নেই। তবে পুনঃপ্রেরিত হবার পর 'বিবৃতি' নামের সেই কবিতাটি (যার প্রথম দেড় লাইন, 'উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে এসে। গর্ভবতী হলো...') কবিতা পত্রিকায় মুদ্রিত হবার পর আমার খানিকটা বদনাম হয়েছিল এবং পরিচিত মহলে কিছুটা নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছিল বলে আমি বেশ উৎফুল্ল বোধ করেছিলুম।

সেই সময় প্রাইভেট টিউশনিই ছিল আমার একমাত্র জীবিকা। ঢাকার গুহঠাকুরতা পরিবারের একটি মেয়েকে আমি পড়াতুম। এই পরিবারটির সঙ্গে দুশো দুই

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ'র বসু পরিবারের কিছুটা যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে আমি বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনীতে এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে বুদ্ধিজীবী ও গবেষক, অত্যন্ত সুপুরুষ ও উদারহৃদয় প্রভু গুহঠাকুরতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখেছি। এই প্রভু গুহঠাকুরতার এক ভাইয়ের মেয়ে অনুরাধা আমার ছাত্রী। আমার ছাত্রীর পিতা কথাপ্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে 'বুদ্ধুদা' বলে উল্লেখ করতেন। যতবার আমি এই সম্বোধন শুনতুম, ততবারই যেন আমার বুকে তপ্ত লৌহশলাকার খোঁচা লাগত। আমাদের কাছে বুদ্ধদেব বসু নামটিই একটি পরিপূর্ণ শব্দ, তিনি যেন কারও বুদ্ধকাকা, বুদ্ধমামা হতে পারেন না, 'বুদ্ধুদা' হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। যাই হোক, আমার ছাত্রীটি একদিন দুশো দুইতে বেড়াতে গিয়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে জানিয়েছিল যে তার মাস্টারমশাইও কবিতা লেখে! প্রথমে বুদ্ধদেব বসু পাত্তা দেননি, তিনি হাসতে হাসতে নাকি বলেছিলেন, এমন কোন্ প্রাইভেট টিউটর আছে যে দু'চার লাইন পদ্য লেখে না! আমার ছাত্রী ছাড়বার পাত্রী নয়, সে বলেছিল যে তার মাস্টারমশাইয়ের দু'তিনটি কবিতা কবিতা-পত্রিকাতে ছাপাও হয়েছে। তখন বুদ্ধদেব বসু সামান্য কৌতূহল দেখিয়ে বলেছিলেন, ও, তাই নাকি? কী নাম বল তো!

বুদ্ধদেব বসু আমার নাম শুনে চিনতে পেরেছেন, এজন্য ছাত্রীর বাড়িতে গরিব মাস্টারটির সামান্য মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছিল বোধহয়। বুদ্ধদেব বসু সত্যিই আমার নাম শুনে চিনেছেন, ছাত্রীর মুখে এ কথাটা শুনে যে শিহরন ও পুলক বোধ করেছিলুম, তা আজও মনে পড়ে।

পরিচয় না হলেও বুদ্ধদেব বসুকে দূর থেকে দেখেছি বেশ কয়েকবার। কখনও কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যেতে, কখনও কোনও সভায়। মনে আছে একবার, মহাজাতি সম্মেলনের মঞ্চে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সম্মেলনে তিনি একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন, খুবই মগ্ন হয়ে, এমন সময় একজন অত্যুৎসাহী ক্যামেরাম্যান তাঁর খুব কাছে গিয়ে ছবি তুলল, হঠাৎ ফ্ল্যাশ জ্বলে ওঠায় বুদ্ধদেব বসু এমনই চমকে উঠলেন যে, ঠিক যেন মনে হল কেউ তাঁকে গুলি করতে এসেছে এইরকম ভেবে তিনি লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলেন একপাশে। তারপর ঘোর কেটে গেল, পাঠ আর জমল না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, একটা ঘুসি মেরে সেই ক্যামেরাম্যানের নাক ফাটিয়ে দিই।

তাঁর সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের দিনটির কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। সেদিন জোড়াসাঁকোতে দক্ষিণ দিকের হলঘরে কোনও একটি সভাতে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এক সময় তিনি বারান্দাতে সিগারেট খেতে এলেন, হাতে মেপোল মাইনর সিগারেটের প্যাকেট। তাঁকে ঘিরে ধরল অনেকে, আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম একটু দূরে, তাঁর কাছে গিয়ে কথা বলার সাহস হয়নি। হঠাৎ অল্প চেনা কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, এই তুমি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ করবে না? আমার উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই সে প্রায় জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাঁর সামনে। আমার নাম শুনে সামান্য কৌতূহল দেখিয়ে তিনি বললেন, ও, তুমিই সুনীল? তুমি অনেকদিন কবিতায় কবিতা দাওনি। পাঠিও।

অন্য কেউ সামনে চলে এল, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম একপাশে আরও কিছুক্ষণ। অনেকেই অবলীলাক্রমে নানারকম প্রশ্ন করে যাচ্ছে তাঁকে। আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না। অথচ বুদ্ধদেবের সমস্ত বইই আমার পড়া, কবিতার বইগুলি তো বটেই, গল্প-উপন্যাস-ছোটগল্প-প্রবন্ধ সবই, তাঁর গদ্য লেখার মধ্যে সেই সময় আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল দুটি বই। 'অন্য কোন্‌খানে' এবং 'মৌলিনাথ', এই দুটি বইই আমি টিউশনির টাকা খরচ করে বন্ধুদের কিনে কিনে উপহার দিয়েছি। 'তিথিডোর' উপন্যাসটি আমি পড়েছি চার-পাঁচবার, অনেক কবিতার লাইন মুখস্থ। ওঁকে কত কী-ই বলার ছিল, অথচ অদ্ভুত এক লাজুকতায় আমার মুখে একটাও কথা ফোটেনি।

সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের উৎসাহে আমরা সেই সময় একটা থিয়েটার-গান বাজনার ক্লাব খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলুম। ক্লাবটির নাম কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ বা উপদেশ চাইবার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছিল চারজন বিশেষজ্ঞের কাছে, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীহাররঞ্জন রায়, বুদ্ধদেব বসু এবং শম্ভু মিত্র। সেই উপলক্ষে আমি প্রথম দু'শো দুইতে যাই। দরজা খুলে দিয়েছিল মিমি, অর্থাৎ এখনকার মীনাক্ষী দত্ত, আমার স্পষ্ট মনে আছে। আলুথালুভাবে শাড়ি জড়ানো এক চঞ্চলা তরুণী আচার খেতে খেতে এবং জিভে চকাস চকাস শব্দ করতে করতে এসে আমাকে দেখে অতি অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, কী চাই? (পরে অবশ্য মিমি অনেকবার বলেছে যে, সে ওভাবে কখনও আচার খেত না, বা আচার খেতে খেতে এসে দরজা খুলত না)। যাই হোক, সেবার ও বাড়িতে আমি মোটেই পাত্তা পাইনি, বুদ্ধদেব ব্যস্ত ছিলেন, আমার বক্তব্য শুনে তিনি অদ্ভুত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমরা ক্লাব খুলবে, তার নাম আমি ঠিক করে দিতে যাব কেন? আমি লজ্জিত ভাবে ফিরে আসি। বস্তুত, চারজন বিশেষজ্ঞ প্রায় একই রকম কথা বলেছিলেন, শম্ভু মিত্র বেশ খানিকটা বকে দিয়েছিলেন তাঁর সময় নষ্ট করার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমাদের ওই ক্লাবটির নাম হয়েছিল 'হরবোলা', খুব চমৎকার নাম না?

আমি থাকতুম ঘোর উত্তর কলকাতায়, জ্যোতির্ময় দত্ত-ও সেই সময় থাকত গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে সোনাগাছির কাছাকাছি। জ্যোতির তীক্ষ্ণ মেধা, অগাধ পড়াশুনো ও কবিতার জগতে একটা ঝড় তুলে দেবার আকাঙ্ক্ষা, সব মিলিয়ে তার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল দুর্দমনীয়। জ্যোতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পরই সন্ধেবেলা আমি সঠিকভাবে এবং স্বপরিচয়ে দুশো দুইতে যাই। ততদিনে 'কৃত্তিবাস' বেরুতে শুরু করেছে, আমি নিজেও একখানা সম্পাদক। খালাসিটোলা ও মদন শা-তে যাতায়াত শুরু করেছি। রীতিমতন পাখা গজিয়েছে, লাজুকতা কাটাবার জন্য কথাবার্তায় এসেছে উগ্রতা ও নকল অহংকারের ভাব। জ্যোতি মদন শা-তে যেত কদাচিৎ, কিন্তু একদিন ওখান থেকেই বেরিয়ে আমরা চলে এলুম দক্ষিণে, তখন রাত প্রায় গাঢ়, আমরা কয়েকজন মিলে দুশো দুইতে এসে শুরু করে দিলুম হইচই, কোনও অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে জুড়ে দিলুম তর্ক, জ্যোতিই প্রধান তার্কিক, আমরা দু'একজন তার বাঁয়া-তবলা। বুদ্ধদেব হঠাৎ রেগে উঠলেন, একটা জটিল ইংরিজি বাক্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে আমাদের ওই অবস্থায় গিয়ে তাঁর বাড়িতে উপদ্রব করা তিনি

একেবারেই পছন্দ করেননি। ঈষৎ রঙিন অবস্থায় আমরা বোধহয় বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ডেঁপোমিই করে ফেলেছিলুম। সেদিন প্রতিভা বসুও আমাদের কিছু সস্নেহ ভর্ৎসনা করেছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ দুটি করে অতি সুস্বাদু কাবাব খেতে দিয়েছিলেন।

পরদিন সকালেই আমি ঠিক করেছিলুম যে, বুদ্ধদেব বসু আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক, তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও আমার কাছে দারুণ শ্রদ্ধেয়, সেইজন্যই তাঁর কাছাকাছি যাওয়া আমার উচিত নয়। প্রিয় লেখক ও প্রিয় মানুষের কাছ থেকে যদি কোনও খারাপ ব্যবহার পাই, তা সহ্য করব কী করে? বিখ্যাত ব্যক্তিদের খুব কাছে যাওয়া ঠিকও না। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমি অভিভূত হতেও চাই না, আবার তাঁর কোনও দুর্বলতা আমার চোখে প্রকট হয়ে উঠুক, সেটাও কাম্য নয়।

জীবনানন্দ দাশ তখন নেই। অন্যান্য প্রধান কবিদের সঙ্গে আমাদের কোনও মানসিক যোগাযোগ ছিল না। কবিতা পত্রিকায় সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুই ছিলেন সমকালীন কবিতা সম্পর্কে সবচেয়ে সজাগ। তিনি চিঠিতে আমাদের কবিতা সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করতেন, তার সবগুলির সঙ্গে একমত না হলেও এই ভেবেই শিহরন হত যে, একমাত্র তিনিই তরুণতম কবিদের সম্পর্কেও অবহিত।

জ্যোতির সূত্র ধরেই মিমি, রুমি ও পাপ্পার সঙ্গে পরিচয় হল ক্রমে। জ্যোতি প্রথম থেকেই আমাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে, কোনওদিন তার কোনও কথার ওপর না বলতে পারিনি। জ্যোতি আরও কয়েকবার জোর করে টেনে নিয়ে গেছে দুশো দুই-তে, যেখানে বুদ্ধদেব বসুর চেয়েও প্রতিভা বসুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল অনেক তাড়াতাড়ি, আমি বুদ্ধদেবের চোখের আড়ালে থাকারই চেষ্টা করতুম। আমরা পারিবারিক আড্ডাই দিতুম বেশি, ততদিনে রাসবিহারী ছেড়ে নাকতলার বাড়িতে, বসবার ঘরে হঠাৎ বুদ্ধদেব এসে পড়লে কিছু না কিছু নিয়ে তর্ক বেধে যেতই। তর্ক করতে করতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, কণ্ঠস্বর উঠত উচ্চগ্রামে, এক সময় তার চেয়েও উঁচু গলায় অট্টহাস্য করতেন। আর কোনও প্রবীণ লেখকের ব্যবহারে এমন যৌবন চাঞ্চল্য আমরা দেখিনি। তর্ক হত ছন্দ ব্যবহার নিয়ে, তরুণ কবিদের ছন্দের মাত্রা তাঁর কাছে মনে হত অতিমাত্রিক। কিন্তু কখনও, কোনওদিন তার মুখে অনুপস্থিত কোনও লেখকের নামে নিন্দে শুনিনি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর একদা বন্ধুস্থানীয়, তখন তেমন বন্ধুত্বের সম্পর্ক নেই এমন কোনও সাহিত্যিককে হেয় করার চেষ্টা করলে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতেন, সেই লেখকের উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন তুলে ধরতেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি আমার মনে দাগ কেটে যায়।

বুদ্ধদেব বসুর পরিবারের সঙ্গে আমার প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা হয় বিদেশে। তখন বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু, রুমি এবং পাপ্পা সবাই ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে, আমি সেখান থেকে চার-পাঁচশো মাইল দূরে আয়ওয়া সিটিতে। সেই সময় নিদারুণ নিঃসঙ্গতা আমায় পেয়ে বসেছিল। এক এক সময় প্রাণটা এমনই ছটফট করত যে, ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে কোনও বিমানে উঠে আটলান্টিক পেরিয়ে যাই। প্রায়ই টেলিফোনে বুদ্ধদেব, প্রতিভা বসু, পাপ্পার সঙ্গে কথা বলে প্রাণটা কিছুটা সুস্থির হত।

বুদ্ধদেব শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন একবার, আমাকেও আসতে বললেন শিকাগোতে, সেখানেই আমাকে প্রচণ্ড অপমানের মধ্যে পড়তে হল পাকেচক্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার পর বুদ্ধদেবের সদলবলে নেমন্তন্ন স্টিফেন হে নামে এক কলকাতা-ফেরত গবেষকের বাড়িতে। বুদ্ধদেব আমাকেও দেখা করতে বললেন সেখানে। স্টিফেন হে-র সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কলকাতাতেও দেখা হয়নি, তবু মার্কিন দেশের পার্টিগুলি অনেক ইনফর্মাল হয়, সঙ্গে দু'একজন বন্ধুকে নিয়ে চলে আসা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি যখন সে-বাড়িতে পৌঁছলুম, তখন অন্য অতিথিরা ভেতরের ঘরে পানাহার শুরু করেছেন। দীর্ঘকায়, অতিশয় সপ্রতিভ স্টিফেন হে আমার নাম ও আগমনের উদ্দেশ্য শুনে চোখমুখ কঠিন করে ফেললেন, আমাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিলেন না বটে কিন্তু ভেতরের ঘরে নিয়ে যাবার আহ্বানও জানালেন না, বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও দিলেন না। সিঁড়ির পাশে একটা চেয়ারে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করলেন শুধু। সেখানে বসে বসে অভুক্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সিগারেট টানতে টানতে আমি শুনতে লাগলুম ভোজকক্ষের কলকল ধ্বনি। অসহ্য বোধ হওয়ায় একবার উঠে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালুম, ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের জন্য সেখানে বেশিক্ষণ টেকা যায় না, আবার বুদ্ধদেব বসুদের সঙ্গে দেখা না করে আমি চলেও যেতে পারছি না। রাগের চোটে সেদিন বোধহয় আমার সমস্ত শরীরে রোঁয়া ফুলে উঠেছিল।

পার্টি শেষ হবার পর বাইরে এসে বুদ্ধদেব আমাকে এ অবস্থায় দেখে সাংঘাতিক অবাক! বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তুমি ভেতরে এলে না কেন? আমাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে জয়েন করলে না কেন? তোমার কথা আমি বলে রেখেছিলুম। আমাকে যে ভেতরে আহ্বান করাই হয়নি, সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলুম না আমি, শুধু বললুম, আমি খেয়ে এসেছি, বাইরের হাওয়াটা ভাল লাগছিল...।

সেখান থেকে সদলবলে যাওয়া হল শহরের অন্য প্রান্তে রাজেশ্বরী দত্তের অ্যাপার্টমেন্টে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অল্প কিছুদিন পূর্বেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। গবেষণার সূত্রে রাজেশ্বরী শিকাগোতে একা থাকেন। সেখানে খানিকক্ষণ আড্ডার পর প্রতিভা বসু হঠাৎ বললেন, সুনীল, আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি কিছু খাওনি, মুখখানা শুকনো। মাতৃসমা রমণীরা এসব ঠিক বুঝে যান কেমন করে যেন! ততক্ষণে দু' পাত্র পেটে পড়ায় আমিও গড়গড় করে বলে দিলুম স্টিফেন হে-র অভদ্রতার কথা। বুদ্ধদেব রীতিমতন আহত বোধ করলেন। তারপর রাজেশ্বরীকে অনুরোধ করলেন আমার জন্য ভাত চাপিয়ে দিতে। যতক্ষণ ভাত রান্না হতে লাগল, ততক্ষণে নানা গবেষণা করে জানা গেল যে, কলকাতায় একদিন স্টিফেন হে-র বাড়িতে কতিপয় বাঙালি তরুণ কবি খানিকটা পানোন্মত্ত অবস্থায় নাচানাচি করে দু'একটা জিনিসপত্র ভেঙেছিল। সেই দলে আমি ছিলুম না, তবু শুধুমাত্র বাংলা কবিতা লেখা ও বয়েসের দোষে আমি তাঁর উষ্মার কারণ ঘটিয়েছি।

ধপধপে সাদা গরম ভাত, মাখন দিয়ে মাখা আলু সেদ্ধ ও গ্রাউন্ড বিফের তরকারি, পরিবেশন করলেন অতিশয় সুন্দরী ও আমার প্রিয় গায়িকা রাজেশ্বরী, মনে হল এমন

অমৃতের মতন আহার আমার ভাগ্যে আগে কখনও জোটেনি। স্টিফেন হে-র ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই, ভাগ্যিস তিনি ওইরকম অসভ্যতা করেছিলেন, তাই তো রাজেশ্বরী দত্তের নিজের হাতে রান্না খাবার সুযোগ জুটে গেল আমার।

খুব সম্ভবত সেবারই আমি ওই দলের সঙ্গে ব্লুমিংটন চলে যাই, একেবারে বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসুর সংসারেই অতিথি হই। সেখানে সকাল-দুপুরে-সন্ধ্যায় খুব কাছ থেকে অতবড় একজন লেখককে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন বুঝেছিলুম, বুদ্ধদেব একজন আপাদমস্তক সাহিত্যিক, সাহিত্যের পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি স্বস্তি পান না।

ব্লুমিংটনের একটা মজার ঘটনা মনে আছে। ওখানে থাকতে থাকতেই ভাইফোঁটার দিন পড়ল। রুমি তার ভাই পাপ্পাকে ফোঁটা দেবে, সেই উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া, আমরা সবাই উপস্থিত। পাপ্পার ফোঁটা হয়ে যাবার পর, খুব সম্ভবত প্রতিভা বসুই প্রস্তাব করলেন, আহা, সুনীলের তো বোন এখানে নেই, রুমি ওকেও ফোঁটা দিক না। রুমিও অমনি আঙুলের ডগায় দই লাগিয়ে উদ্যত হল আমার কপালের দিকে।

আমি মহা আপত্তি জানিয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে বললুম, না, না, না, আমি ফোঁটা নেব না, নিজের বোন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকে আমি বোন বা দিদি মনে করি না।

সেই কাণ্ড দেখে বুদ্ধদেব অট্টহাস্য করে উঠলেন, তাঁর হাসি থামতেই চায় না। এখনও যেন তাঁর সেই হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান

লিখতে একটুও ইচ্ছে করে না। কলম ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। এই সব সময় মনে হয়, মানুষের ভাষা এখনও কত দীন। বুদ্ধদেব বসু আর নেই, এ কথা কোন ভাষায় বোঝাবো।

খুব সকালবেলা রেডিয়ো শোনার অভ্যেস নেই, কারণ তখনও ঘুম ভাঙে না। ব্রিজের পাশে বাড়ি। ব্রিজের ওপর থেকে কেউ একজন ডাকছে তাই ঘুম ভাঙল। বারান্দায় এসে দেখি একজন বন্ধু ও সহকর্মী, ভ্রূকুটি করার আগেই তিনি বললেন, রেডিয়োতে জানিয়েছে, বুদ্ধদেব বসু মারা গেছেন। আপনি যাবেন? তৎক্ষণাৎ উত্তর দিই, ও তাই নাকি? আচ্ছা, একটু পরে যাচ্ছি। ঘরের মধ্যে ফিরেই মনে হল, কী শুনলাম? কী উত্তর দিলাম—ঘুম জড়িত মস্তিষ্কের জড়তা কাটতে দেরি হয়। আবার বারান্দায় ফিরে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, কে মারা গেছেন? বুদ্ধদেব বসু? কীসব আজে-বাজে কথা বলছ? ততক্ষণে বন্ধুর ট্যাক্সি দূরে চলে গেছে। দৌড়ে আবার ঘরে ফিরে রেডিয়োর দিকে। দিল্লি থেকে বাংলা খবরে সত্যিই ওই অবিশ্বাস্য সংবাদ জানায়।

রবিবার শেষ রাত্রে বাংলা সাহিত্যের বিরাট পুরুষ, সব্যসাচী বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুর কারণ সেরিব্রেল থ্রমবোসিস। তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬৬।

বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রবিবার সন্ধ্যায়, চা খাবার সময়। তার খানিক পরেই স্ট্রোক। সংজ্ঞালুপ্তিও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ডায়মন্ডহারবার রোডের ক্যালকাটা হসপিটালে। সেইখানে রাত পৌনে তিনটা নাগাদ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরে জেনেছি, আকাশবাণী সোমবারের প্রভাতী সংবাদ শুরু করে এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিয়ে। খবর পেয়েই বুদ্ধদেববাবুর অসংখ্য গুণগ্রাহী, বন্ধুবান্ধব, শিষ্য, আত্মীয়স্বজন ছুটে আসেন তাঁর নাকতলার বাড়িতে। ততক্ষণে তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে স্বগৃহে, শুইয়ে রাখা হয়েছে চারদিকে বই আর লেখার প্রুফ ছড়ানো নিজের ঘরে। প্রশান্ত মুখচ্ছবি—যেন একটু পরেই ঘুম থেকে উঠবেন।

লোকের পর লোক, ফুলের পর ফুল। তারই মাঝখানে সহধর্মিণী প্রতিভা বসুর গুমরে গুমরে কান্না, তিনি নিজেই অনেকদিন অসুস্থ। বড় মেয়ে মীনাক্ষী (মিমি) ও একমাত্র ছেলে শুদ্ধশীলের (পাপ্পা) চোখ কান্নায় কান্নায় লাল। ছোট মেয়ে দময়ন্তী (রুমি) কানপুরে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন প্লেনে, সোমবার সন্ধ্যায়। সোজা চলে যান শ্মশানে।

লোকেরা আসছেন, চলে যাচ্ছেন, আরও আসছেন। রাত থেকেই ছোটাছুটি করেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সোমবারের ভোরে নাকতলার বাড়িতে দেখলাম রণক্লান্ত সৈনিকের মতো সোফায় গা এলিয়ে বসে আছেন। আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছেন জ্যোতির্ময় দত্ত ও ইন্দুভূষণ রায়। খানিক বাদেই এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তারপর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, আমার বিয়েতে মাত্র দু'জন বরযাত্রী গিয়েছিল, বুদ্ধদেব আর অচিন্ত্য।

শোককাতরদের ভিড়ে অসংখ্য পরিচিত মুখ। মনোজ বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু বসু, ফাদার আঁতোয়ান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সুশোভন সরকার, অশোক মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, সুমথনাথ ঘোষ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, অরবিন্দ গুহ, অম্লান দত্ত, প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক, গৌরী আইয়ুব দত্ত, মানসী দাশগুপ্ত, বিমল রায়চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তপতী মুখার্জি, অরুণ দাশগুপ্ত, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, কবিতা সিংহ, শান্তি লাহিড়ী, রমাপদ চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত, সুবীর রায়চৌধুরী, অমিয় দেব, অসিত গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, আরও অনেক নাম। দুপুর বারোটায় আমি চলে এসেছি। তারপর এসেছেন আরও অনেকে। তা ছাড়া এসেছেন তাঁর ভাইয়েরা, অন্যান্য স্বজনেরা। কেওড়াতলা শ্মশানে এসেছেন আরও অনেক গুণীজ্ঞানী। সাগরময় ঘোষ, কমলকুমার মজুমদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

মৃতদেহ বাড়ি থেকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর প্রিয় ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কাছে, যেখানে বুদ্ধদেববাবু আগে থাকতেন, যেখানে বসত সাহিত্যের মজলিস, বেরোত 'কবিতা' পত্রিকা। সেখানে কৈশোরের সঙ্গী, যৌবনের সুহৃদ, সাহিত্যচর্চার দোসর অজিত দত্ত অসুস্থ দেহ নিয়ে নেমে আসেন প্রিয় বান্ধবকে শেষ দেখা দেখতে। সেখান থেকে কনিষ্ঠ কবিরা অগ্রজকে কাঁধে করে নিয়ে আসেন কেওড়াতলায়—যেখানে তাঁর আগে শেষ বিদায় নিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

বুদ্ধদেববাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের আগে অনেকবার বলেছিলেন, তাঁকে যেন গাড়িতে করে শ্মশানে না নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষ মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের তলা দিয়ে—এর চেয়ে মহৎ মহাযাত্রা আর কী হতে পারে।

তা ছাড়া বুদ্ধদেববাবু আরও বলতেন, "আমাকে আরও অন্তত দশটি বছর বাঁচতে হবে। তার কারণ মহাভারত নিয়ে লেখা শেষ করতে হবে এবং অসুস্থ রাণুকে দেখতে হবে।" রাণু প্রতিভা বসুর ডাকনাম।

তাঁর দশ বছর আর বাঁচা হল না, "অসুস্থ রাণুকে" ফেলে রেখেই তিনি চলে গেলেন।

সকালবেলা তাঁর ঘরে যখন ঢুকি, সর্বাগ্রে দেখতে পাই চারদিকে প্রুফ ছড়ানো। মৃত্যুর দিনও অনবরত দেখে গিয়েছেন। রচনাবলী বেরোচ্ছে, তারই প্রুফ। 'দেশ'

পত্রিকার আগামী সাহিত্য সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বের হচ্ছে। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রুফও দেখলাম ছড়ানো। তাঁর লেখা 'মহাভারতের কথা'র প্রথম পর্ব বেরিয়েছে দেশ-এ। দ্বিতীয় পর্বও লেখা চলছে, অল্প কিছু বাকি। তাছাড়া শেষদিকে লিখেছিলেন আত্মকথা 'আমার যৌবন'-এর দ্বিতীয়ার্ধ। তারও শেষাংশ অসমাপ্ত থেকে গেল। এক একটা লেখার প্রুফ দেখতেন অন্তত পাঁচ ছ' বার করে। এমন খুঁতখুঁতে ও পরিশ্রমী লেখক, বোদলেয়ারের পর, বিশ্বসাহিত্যে আর কেউ ছিলেন কিনা আমি অন্তত জানি না।

অনেকেই এসেছেন, তার জন্য বিশেষ দু'জনকে দেখে অন্যরকম অনুভূতি হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কল্লোল যুগের ত্রয়ী বলতে আমরা এঁদেরই জেনেছি। এক সময় এই তিনজন বাংলা সাহিত্য কাঁপিয়েছেন, এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে কনিষ্ঠ, তিনিই আগে চলে গেলেন।

শেষদিন পর্যন্ত যিনি লিখে গিয়েছেন, লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণায় বিব্রত হয়ে হাতপাখা ও মোমবাতি ভরসা করেও লিখে গিয়েছেন, সেই বুদ্ধদেব বসুর জীবনের শুরু ১৯০৮ সালে। আদি বাড়ি ঢাকা জেলার মালখানগর। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু। জন্ম কুমিল্লায়। শৈশবে মাতৃবিয়োগের পর চলে আসেন মাতুলালয়ে। মাতামহ ও মাতামহীর স্নেহে মানুষ। মাতামহীকেই তিনি 'মা' ডাকতেন।

তাঁর পড়াশোনা ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উজ্জ্বল রত্ন। ইংরেজি এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সেখানে থাকতেই অজিত দত্ত ও পরিমল রায়ের সঙ্গে তিন বন্ধুতে মিলে বার করেন 'প্রগতি' পত্রিকা। সে সময়ের আর একজন সঙ্গী ডঃ অমলেন্দু বসু। আর সাহিত্য শিক্ষের প্রেরণাদাতা প্রভু গুহঠাকুরতা। তারপর কলকাতায় এসে যুক্ত হন 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে। পরে নিজেই বার করেন কবিতা আন্দোলনের প্রথম মুখপত্র 'কবিতা' পত্রিকা। কিছুদিন অধ্যাপনা করেন রিপন কলেজে। তার অনেক পরে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্টেটসম্যানে সাংবাদিকতা করেছেন কিছুকাল। অতিথি অধ্যাপক হয়ে বার দুই মার্কিন দেশেও পাড়ি দিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন খাঁটি অর্থে সাহিত্যিক। সাহিত্যের জন্য তিনি সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। একবার, প্রবাসে থাকার সময়, তিনি একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, যেখানেই যাই, যত সুন্দরই কোনও দৃশ্য দেখি না কেন, সেই প্রসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের কোনও না কোনও মহারথীর রচনা আমার মনে পড়ে যাবেই। কখনও কখনও এজন্য বিরক্ত হই। আবার বুঝতে পারি, সাহিত্যের ভাণ্ডারেই আমার সব আনন্দ জমা আছে।

হয়তো, সেই জন্যই তিনি নিজেও সাহিত্যের কোনও শাখাতেই হাত ছোঁয়াতে দ্বিধা করেননি। প্রধানত যিনি কবি, তিনি ছোটগল্প রচনার জন্যও এককালে সমালোচক ও আদালতের রোষে পড়েছিলেন, উপন্যাসে এনেছেন নতুন স্বাদ, এককালে রবীন্দ্র-বিরোধী থেকেও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে সবচেয়ে পাঠযোগ্য মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনুবাদের জন্য কতটা নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় তার দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেছেন, নাটক, কাব্যনাটক, এমনকী শিশুসাহিত্যেও দিয়ে গেছেন অমূল্য সম্পদ।

সেই মানুষ এখন শুয়ে আছেন কেওড়াতলা শ্মশানের চত্বরে। এক এক সময় বিভ্রম হয়। মনে হয়, বুদ্ধদেব বসুর এত গুণগ্রাহী ও বন্ধু পরিজন এখানে। অথচ তিনি নিজে উপস্থিত নেই কেন? কোথায় সেই শিশুর মতন সরল হাস্যময় মুখ, সেই উঁচু গলার হাসি। আমরা অনেকবার তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, ঝগড়া করেছি, সাহিত্য বা সামাজিক অবস্থা বা রাজনীতি বিষয়ে ঘোরতর মতের অমিল হয়েছে— কিন্তু কখনও তো দূরে সরিয়ে দেননি। আজ তিনি নিজেই এত দূরে চলে গেলেন কী করে?

কানপুর থেকে তাঁর ছোট মেয়ে দময়ন্তী (রুমি) এবং তাঁর স্বামী প্রদীপ সোজা এসে পৌঁছলেন শ্মশানে। সে বিমানে এসেছে বাবাকে শেষ দেখতে। তবু একেবারে কাছে এসে রুমি কান্নায় ভেঙে পড়ে, না, দেখব না, দেখব না। আমি রুমিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কয়েক পা এগিয়েও আবার দূরে সরে যাই, এখানে সান্ত্বনার ভাষা কে জানে?

ফাদার আঁতোয়ান পাঠ করলেন উপনিষদের শ্লোক। তারপর তিনি নিজেই গান ধরলেন, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। সমবেত অনেক কণ্ঠেই গুঞ্জরিত হয় সেই গান। তখন বোঝা যায়, আমাদের চেনা জগতের সবচেয়ে বেশি দুঃখজয়ী মানুষ রবীন্দ্রনাথ, তিনি শোককে স্তব্ধ উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করতে জানতেন। জ্যোতির্ময় দত্ত এবং অন্য সকলের মুখে চোখে সেই উপলব্ধি।

এবার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে নিয়ে যাবার পালা। শেষ মুহূর্তে একটু অনুষ্ঠান আছে, মুখাগ্নি। তাঁর একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল (পাপ্পা) শোকে ভেঙে পড়েছে, গতকাল রাত্রে ঠিক এই সময়ে যে তার বাবার সঙ্গে গল্প করেছে, আজ এই সময় সে কী করে সেই মুখে আগুন ছোঁয়াবে? কিন্তু এটা একটা নিয়মরক্ষা মাত্র। আমরা কয়েকজন তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাই। পাটকাঠি জ্বলে ওঠে, সেই পাটকাঠি ধরা পাপ্পার হাত দারুণভাবে কাঁপতে থাকে—আমরা কয়েকজন তার সঙ্গে হাত মেলাই। যতই দোষ করি, যতই অক্ষম হই, তবু বাংলা সাহিত্যজগতে আমরা সকলেই বুদ্ধদেব বসুর পুত্রবৎ। বাংলা ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন একথা অস্বীকার করতে পারবেন?

একশ পঁচিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ

১৮৭৩ সালের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'আয়-ব্যয়'-এর একটি হিসেব দেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ওই পত্রিকার শুভার্থী দাতাদের ছাপা নামের তালিকায় জনৈক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ইনি দান করেছেন দু' টাকা বারো আনা তিন পয়সা। এই বিশাল দাতাটি কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নন, সাড়ে বারো বছর বয়েসের একটি বালক মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে ডালহাউসি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কিছুদিন পর তিনি ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে নিজে রয়ে গেলেন সেখানে। রাহা খরচ বাবদ ছেলের হাতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, তার থেকে যা বেঁচেছিল তা লক্ষ্মীছেলের মতন সেই ছেলে জমা দিয়ে দেয় কলকাতার বাড়ির খাজাঞ্চিখানায়। কিছুদিন পরে কর্তাবাবুর নির্দেশে সেই টাকা থেকে ছ' টাকা ফেরত দেওয়া হয় বালক রবীন্দ্রকে, বাকি টাকা তার নামে দান হিসেবে জমা পড়ে তত্ত্ববোধিনী ফান্ডে।

ঘটনাটি স্মরণযোগ্য এই কারণে যে, সেই প্রথম ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেখা যায়। রবি নামের ওই বালকটির নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার ঝোঁক ছিল আরও আগে থেকেই। ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানায় টাইপ খুঁজে খুঁজে নিজের নাম সাজিয়ে তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দিয়ে দেখতে তার ভাল লাগত, এই ঘটনার উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা যখন ছাপা হয় তখন তার নীচে অবশ্য কবির নাম ছিল না। সে সময়ে নামহীন রচনা প্রকাশের রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা ঠিক কোনটি তা নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে আজও কিঞ্চিৎ বিবাদ থাকলেও মোটামুটি এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের দশম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারত-বিলাপ' নামে অনামা কবির রচনাটিই ভবিষ্যতের এক মহাকবির সৃষ্টি। কবিতাটির তলায় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নোট দিয়েছেন, "এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

এই কিশোর কবির বয়েস অবশ্য তখনও চোদ্দ হয়নি, বারো-সাড়ে বারোর বেশি না, বয়েসের তুলনায় তাঁকে বড় দেখাত। বঙ্কিম সম্ভবত এই কিশোর কবিকে চোখেও দেখেছিলেন, কেননা এঁর বড় দাদা ছিলেন বঙ্কিমের বন্ধু এবং সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতে বঙ্কিমের যাতায়াত ছিল। এমন কল্পনা করা যেতে পারে যে, ঠাকুরবাড়িতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনও একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, দেখুন দেখুন বঙ্কিমবাবু, আমার কনিষ্ঠ ভাই রবি কেমন মনোমুগ্ধকর কবিতা রচেছে।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পাদক কিছু সংশোধন করে ছাপলেন এক বালকের কবিতা, যে একদিন জগৎ-বিখ্যাত হবে। কিন্তু সেই প্রথম কবিতাটিই যে আলোড়ন তুলেছিল, তার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সেই বালকের কবিতা নিয়ে তৎকালীন দুটি বিখ্যাত পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ কবিতাটির সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী আবার আকারে ইঙ্গিতে ওই কবিকে এঁচোড়ে পাকা বলে ছেড়েছেন। দু'রকম প্রতিক্রিয়া হলেও এক বালকের প্রতি দু'জন বাঘা সম্পাদকের এতখানি মনোযোগ। নাম না ছাপা হলেও ওই কবিতার কবিকে যে দু'জনেই চিনতে পেরেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রায় বালক বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছিলেন যাকে বলে পাদপ্রদীপের আলোয়। পারিবারিক পটভূমিকাই তার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু সে অতিরিক্ত সুযোগ তো তাঁর অন্য ভ্রাতাদেরও ছিল। যদিও কিশোর রবির রচনাগুলি সাংঘাতিক চমকপ্রদ কিছু নয়, কিন্তু খানিকটা নতুন প্রতিভার ছাপ তাতে রয়েছে। যে-বছর রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি ছাপা হয়, সেই বছরই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় মাইকেল মধুসূদনের। বাংলার সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবি শোচনীয় ভাবে ঝরে গেলেন অকালে, সেই বছরই যে নবীন রবির উদয় হল তিনি যে শুধু সমগ্র সাহিত্যাকাশ দখল করবেন তাই-ই নয়, মাইকেলের প্রভাবও যে একেবারে মুছে দেবেন, তা কি বোঝা গিয়েছিল?

মাইকেল চলে গেলেও তখন হেম-নবীনের খুব রবরবা। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতার উপকণ্ঠে 'ন্যাশনাল মেলা' দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে মেলার এক কোণে একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে 'সাদা ঢিলা ইজার-চাপকান পরা' এক সুন্দর নব যুবককে দেখতে পেলেন, বয়েস আঠারো-উনিশ। প্রথম দর্শনেই নবীনচন্দ্রের মনে হল "বৃক্ষতলায় যেন এক স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।" পরে সে নব যুবকের কবিতা পাঠ ও গান শুনে তিনি একেবারে মোহিত। দু' একদিন পরে চুঁচড়োয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেই প্রসঙ্গ তুলতেই অক্ষয়বাবু বললেন, "কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচা মিঠা আঁব।" নবীনচন্দ্র যদিও রবীন্দ্রনাথের বয়েস আঠারো-উনিশ ভেবেছিলেন, কিন্তু হিসেব অনুযায়ী তখন তাঁর বয়েস পনেরোর বেশি না। নবীনচন্দ্র চাকরির কারণে বাইরে বাইরে ঘুরতেন, তাই রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ চিনতেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই পনেরো বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ রীতিমতন বিখ্যাত।

পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার পর নবীনচন্দ্র আফশোস করেছিলেন এই ভেবে যে, রবীন্দ্রবাবু শুধু লিরিক লিখে প্রতিভার অপচয় করছেন, তিনি মহাকাব্য লেখেন না। তাতে বাংলা ভাষার ক্ষতি হচ্ছে। নবীনচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারেননি যে ওই লিরিক লেখকটিই একদিন তাঁর মতন সবক'টি মহাকাব্য রচয়িতাকে ম্লান করে দেবেন।

শুধু কবিতার জন্যই অল্প বয়েস থেকে এতটা খ্যাতি নয় নিশ্চিত, ঠাকুরবাড়ির এই রূপবান সন্তানটির আচরণ অতি বিনীত, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তদুপরি তিনি নিজে গান রচনা করেন। তাঁর 'মধুর কামিনীলাঞ্ছন কণ্ঠে' গান শুনে সকলেই মুগ্ধ। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎটি বেশ ছোট, মুখে মুখে এই নবযুবকটির গুণপনা সম্পর্কে বার্তা রটে যায়।

কবিতা ও গানের পরেই আসে নাটক। সদ্য যৌবন থেকেই তিনি শুধু নাটক রচনায় মন দেননি, নিজে অভিনয়ও করেছেন, বিভিন্ন ভূমিকায় দক্ষ অভিনেতা। প্রথম যৌবনে তিনি গায়ক ও নট-নাট্যকার হিসেবেই বেশি প্রতিষ্ঠা পান। এই সময়কার কবিতাগুলি অতি রোমান্টিক, যেন মনে হয় এই কবিতাগুলি শুধুই নিভৃতে পড়বার মতন নয়। যিনি লিখেছেন তিনিও নিভৃতচারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন বাইরে, পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে, ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়ে চলে আসছেন বৃহত্তর সমাজে। ঠাকুরবাড়ির অন্য ছেলেরাও সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন অনেক, টাকা পয়সা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশিই পেয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নানা হুজুগে অপব্যয় দেখে তাই-ই মনে হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন অন্য আর কারুরই দেশ সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তা ছিল না। শুধু কবি বা সাহিত্যস্রষ্টাই নয়, চিন্তানায়ক হিসেবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে।

যেন তিনি জানতেন যে তিনি বহুদিন বাঁচবেন, তাই রবীন্দ্রনাথের কোনও তাড়াহুড়ো ছিল না। ঠাকুরবাড়ির ছেলে হিসেবে যতটা খ্যাতি পাবার কথা, তা তিনি পেয়ে গেছেন প্রথম দিকেই, তারপর তাঁকে সব কিছুই অর্জন করতে হয়েছে। প্রথমে তিনি বাংলার মন জয় করেছেন, তারপর তাঁর কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, তারপর তিনি পা বাড়িয়েছেন বিশ্বের দিকে। গ্রীষ্মের দুপুরে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে তিনি যখন নিজের কবিতার ইংরিজি তর্জমা করছিলেন, সেই সময় তাঁর বড়দাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, তুই নিজে থেকে এসব করতে যাচ্ছিস কেন, সাহেবদের যদি প্রয়োজন হবে, ওরা নিজেরা অনুবাদ করে নেবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠিক বুঝতে পারেননি, সাহেবদের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তারা নিজেরা তাদের পদানত দেশে কোনও কবিকে সম্মান জানাবার জন্য ব্যগ্র ছিল না। একটি পরাধীন দেশের নাগরিককে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ যে বইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন, আমরা বাঙালিরা জানি, সেটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়। গোটা বাংলা সাহিত্যে গীতাঞ্জলির স্থান নগণ্য। বাংলা গীতাঞ্জলি ও ইংরিজি গীতাঞ্জলি অবশ্য এক নয়, নামটি অপরিবর্তিত রেখে রবীন্দ্রনাথ ইংরিজি গীতাঞ্জলিতে তাঁর অন্য কিছু কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও ইংরিজি গীতাঞ্জলিকে খুব একটা উচ্চ মূল্য দেওয়া যায় না। সাহেবরা কীজন্য ওই বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধের আগেকার ইউরোপের অশান্ত পরিবেশে ওই সব অধ্যাত্মরসের কবিতাগুলি পড়ে ওরা শান্তি পেয়েছিল। হতেও পারে। তবে, ইয়েটস-এজরা পাউন্ডের যে অধ্যাত্মরসের দিকে তখন খুব ঝোঁক ছিল এমন বিশ্বাস করা

শক্ত। আঁদ্রে জিদ রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়ে মুগ্ধ হয়ে নিজে অনুবাদ করেছিলেন 'ডাকঘর'।

যে-বইয়ের জন্যই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক, এতে কোনওই সন্দেহ নেই সারা পৃথিবীতে তখন রবীন্দ্রনাথের মতন এত বিশাল মাপের লেখক আর একজনও ছিলেন না। সে বছর তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস হার্ডির চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দশ গুণ বড়। সেই বাহান্ন বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের মান এনেছেন প্রথম সারিতে। তিনি কবিতা ভাল লিখেছেন না ছোটগল্প ভাল লিখেছেন, এ রকম প্রশ্নও অবান্তর, কারণ কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে-নাটকে-গানে-লঘু রচনায় বাংলার সংস্কৃতিকে মাতিয়ে রেখেছেন। প্রচুর লিখেছেন তিনি, তার কোনওটাই একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় তো নয়ই, এমনকী দ্বিতীয় শ্রেণীরও বলা যাবে না, ভাষা ব্যবহার ও সুরুচিতে সবই প্রায় প্রথম শ্রেণীর। একজন লেখক সাহিত্যের কোনও একটি শাখাও বাদ দেননি এবং কোনওটিতেই বিফল হননি, এইরকম দ্বিতীয় লেখক আর পৃথিবীতে পাওয়া যাবে কি?

নোবেল প্রাইজের প্রসঙ্গে একটি কথাই বিশেষভাবে বলা যায়। বাংলা ভাষার পাঠক তথা ভারতীয় পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে জানে, তাঁর বিশালত্ব যেভাবে অনুধাবন করতে পারে, বিদেশিরা সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু জেনেছে? যদি পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথকে তারা জানতে পারত, তা হলে তো তারা রবীন্দ্রনাথকে মাথায় নিয়ে নাচত। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মই তো ওরা বুঝল না। ইস, ওদের কী দুর্ভাগ্য!

দেশের লোকও অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে মাথায় নিয়ে নাচেনি। নোবেল পুরস্কারের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে গেলে বেরিয়ে পড়ল অনেক হিংস্র দাঁত ও ধারাল নখ। নির্লজ্জ পরশ্রীকাতরতায় এদেশের মানুষ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। মানসিক ভাবে যারা বামন তারা লম্বা লোকদের সহ্য করতে পারে না। নিজেরা বড় হওয়ার চেষ্টা না করে তারা চায় বড় মানুষের মাথা কেটে ছোট করতে। এরণ্ড বনে এক মহাদ্রুম, সমস্ত ঝড়-ঝাপটা তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন, কিন্তু নত হননি।

রবীন্দ্রনাথের কিছু ভক্ত ও চাটুকার তাঁকে সব সময়েই ঘিরে থাকত, তারা তাদের গুরুদেবের দৃষ্টিকে কিছুটা আড়াল করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু উপকার করেনি। যখন তাদের সাহায্যের যথার্থ প্রয়োজন ছিল তখন তারা পিছু-পা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ পক্ষে কিন্তু পাওয়া যাবে অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালিদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া রবীন্দ্রনাথের শত্রুতা বা নিন্দা করতে বাকি রেখেছেন কে? যাঁদের রবীন্দ্রনাথ বন্ধু মনে করতেন, যাঁদের তিনি কাছে টেনেছিলেন, তাঁরাও বিরূপ হয়েছেন এক সময়। যেমন জগদীশ বসু, যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি শরৎচন্দ্র ও নজরুলকে সস্নেহে নিজের বই উপহার দিয়েছেন, নজরুল যখন জেলখানায় গিয়ে অনশন করেছিলেন তখন উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তার পাঠিয়েছিলেন তাঁকে, এঁরাও রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করলেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরতে দ্বিধা করেননি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন অবলীলায়। সুরেশ সমাজপতি, সজনীকান্ত দাসদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে

নয়, পরনিন্দাই এদের পেশা, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল, যদুনাথ সরকারের মতন মানুষও কটূক্তি করেছেন নানাভাবে। অনেকেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যে কালিমা লাগাতেও দ্বিধা করেননি। যেমন ডি এল রায়। এ ছাড়া কত পত্র-পত্রিকা যে কাদা ছিটিয়েছে তার ঠিক নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব মুছে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু তাঁর মতন বনস্পতিই আড়ালে পড়ে গেলেন না, শরৎচন্দ্র-নজরুলের ধারাও রুদ্ধ, ওই জীবনানন্দ-মানিক-প্রেমেন্দ্রর দল যে আধুনিক সাহিত্যের পত্তন করেছেন তাই-ই দিনে দিনে কালকেতুর মতন বাড়ছে। রবীন্দ্রমানস ও আধুনিক সাহিত্যের সংঘর্ষ বেশ কিছুদিন চলেছিল। সমালোচকরা এই আধুনিক সাহিত্যকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারতেও উদ্যত হয়েছিল। পাঠকরা কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে বর্জন করেনি, বিতর্ক চলতে থাকলেও পাঠকশ্রেণী সমসাময়িক কালের প্রতিচ্ছবি ও চিন্তার প্রতিফলনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। পণ্ডিতেরা এবং উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি বাবু সমাজ আরও অনেকদিন অবশ্য রবীন্দ্র-সর্বস্বতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর শুধু লেখক নন, পূজনীয় গুরুদেব। কোনও কোনও অতি পণ্ডিত এমন কথাও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে আর কিছুই পড়ার নেই, রবীন্দ্রনাথের পর আর বাংলা কবিতা লেখাই হয়নি। কোনও জীবিত চলমান ভাষা সম্পর্কে অন্য কোনও দেশে কোনও যথার্থ পণ্ডিত এমন কথা বলতে পারেন, বিশ্বাসই করা যায় না। কিন্তু এদেশে সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ এরকম বলেছেন।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা পড়ে যেতে থাকে হু হু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যে সব রচনা নিয়ে হইচই হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। ইংরেজিতে অনূদিত হলেও রবীন্দ্র রচনাবলী মূল ইংরিজি সাহিত্যের অন্তর্গত হয়নি, ক্লাসিকস হিসেবে গণ্য হওয়া তো দূরের কথা। মার্কিন দেশের পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে ছুঁয়েও দেখেনি। ষাটের দশকে লন্ডনে ফেবার অ্যান্ড ফেবার কোম্পানির অফিসে টি এস এলিয়টের সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন সাক্ষাতের সময় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, নট মাই কাপ অফ টি। এলিয়টের মতো প্রবীণ কবিই যদি এমন রবীন্দ্র অনাসক্তি দেখান, তা হলে তৎকালীন তরুণ কবিদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আমরা নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে বিদেশে গর্ব করতে যাই। কিন্তু পশ্চিমে ওই পুরস্কারের সম্মান অনেক কমে গেছে। বছরে একবার দিন কয়েকের জন্য ওই পুরস্কার নিয়ে আলোচনা শোনা যায়, তারপর কোন লেখক কবে ওই পুরস্কার পেয়েছে তা অনেকেই ভুলে যায়।

একমাত্র সোভিয়েত দেশেই রবীন্দ্রচর্চা এখনও অব্যাহত আছে কোনও অজ্ঞাত কারণে। সেখানকার পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করে। রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি পাঁচ লক্ষ কপির সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেদেশে কোনও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে একথা আমার নিজের কানে শোনা।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে খুব ঢাক-ঢোল বাজিয়ে উৎসব করা হল, তারপর পাকাপাকিভাবে তাঁকে ছবি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল দেওয়ালে, তাঁর গ্রন্থাবলী চাবিবন্ধ করে রাখা হল আলমারিতে। যে কোনও বাড়ির আলমারিতে রবীন্দ্র রচনাবলী না থাকলে খুবই বেমানান লাগে। সেইজন্য সরকার থেকে সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হলেই বিরাট লাইনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জীবৎকালে সব ক'টি খণ্ড পাওয়া যাবে না জেনেও উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে চেয়ে লোকে এই রচনাবলীর গ্রাহক হয়। এই সময়কার সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাপ মুছে গেলেও বাংলার সংস্কৃতি জগতে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি। যে কোনও সাংস্কৃতিক উৎসবে, এমনকী বিবাহ বা শ্রাদ্ধবাসরেও রবীন্দ্রসংগীতের স্থান অবধারিত। তাঁর নাটক কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সারা বছর। তাঁর কাহিনী-ঘেঁষা কবিতাগুলি আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে জনপ্রিয়। একমাত্র রবীন্দ্র-নৃত্যটাই তেমন অসুবিধের নয়। স্কুল-কলেজের বাইরে তেমন জমে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি আধুনিক রুচিতে অনেকটাই ভাবালুতাপূর্ণ মনে হলেও তাঁর পরে আর কেউ উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ তবু নাটক নিয়ে নানান পরীক্ষা করেছেন, একালের পরীক্ষামূলক সব নাটকই আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। আধুনিক কবিরা বাংলা গান রচনার দিকে গেলেনই না একেবারে। গীতিকার ও সুরকার আলাদা হয়ে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ হয়তো নয়। আধুনিক গানে শচীন দেববর্মণ এবং সলিল চৌধুরী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দি সিনেমার জগৎ তাঁদের টেনে নিয়ে গেল এবং চুষে ছিবড়ে করে ছাড়ল। তাঁদের কোনও উত্তরসূরিও পাওয়া গেল না।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলার অন্য খণ্ডে, পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মহা শোরগোল পড়ে যায়। সেখানকার হঠকারী সরকার জোর করে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ ও রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বন্ধ করে দিতে গেল। বাধা দিলেই প্রতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করে দেবার প্রয়াসের ফলেই সেখানকার সংস্কৃতিপ্রেমীরা নবোদ্যমে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রচর্চার জোয়ার এসে গেল সেখানে। অনেকের গদ্য ভাষায় দেখা গেল রবীন্দ্র গদ্যরীতির প্রভাব, রবীন্দ্রসংগীতে এল নতুন উদ্দীপনা। সেখানকার বিরোধীপক্ষই যখন জয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ল, তখন তার জাতীয় সংগীত হল "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।"

এদিকে ভারতের জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, তা হলেও এদেশের মানুষ যাতে সে গান ভুলে না যায়, তাই ভারত সরকার প্রতিটি সিনেমা হলে জাতীয় সংগীত বাজাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত শোনার বদলে দর্শকরা শো শেষ হতে না হতেই পড়ি কি মরি বলে দৌড়তো। শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পর সেই প্রহসন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানকার বেতারে টিভিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার অবাধ, প্রতিদিন রাখাটাই যেন বাধ্যতামূলক। তাই দলে দলে গায়ক-গায়িকা নিছক যান্ত্রিক সুরে গান গেয়ে যায়। নতুন ভাবে পরিবেশনে কোনও চিন্তাই নেই। তরুণ সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হয়।

রবীন্দ্র-বিরোধিতার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন সমগ্র পটভূমিকা জুড়ে। বাংলা ভাষা নিয়ে যিনি লেখালেখি করবেন, তিনি সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য মাথায় না রাখলে নতুন কিছু লিখবেন কী করে? সারা জীবনে গান লিখেছেন প্রায় আড়াই হাজার, কবিতা দেড় হাজার, ছোটগল্প একশর কিছু কম, উপন্যাস তেরোটি, নাটক-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য মিলিয়ে প্রায় ছত্রিশটি। এছাড়া প্রবন্ধের পাহাড়, ভ্রমণকাহিনীর নদী ও চিঠিপত্রের পত্ররাজি সংখ্যাতীত। ছোটগল্প অল্প বয়েসেই লিখেছেন বেশি। যেমন ছবি আঁকতে শুরু করলেন বেশি বয়েসে। এই দুটি বিষয়ে তাঁর খুব যেন একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। অথচ ছোটগল্পে তিনি আজও অপরাজেয়। তিনি গ্রামজীবনের ওই মধুর গল্পগুলি না লিখলে বিভূতিভূষণ জন্মাতেন কিনা সন্দেহ। আর ছবি আঁকলেন তাঁর সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে। পল ভালেরির মতন দু' চারজন সাহেব ছাড়া তাঁর ছবির বিশেষ সমাদর করেনি কেউ, এখন দিনদিন তাঁর ছবি চিনতে শিখছেন সমঝদাররা।

মৃত্যুর বছরেও প্রুফ দেখতে দেখতে তিনি রানী চন্দকে একদিন বলেছিলেন, "এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার। এত লেখা উচিত হয়নি...জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে। তবুও বাকি থাকবে কিছু। জোর করে কিছু বলা যায় না ; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি।"

শেষ পর্যন্ত গান সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল তাঁর। আজি হতে শত বর্ষ পরে কেউ তাঁর কবিতা আর পড়বে কিনা সে সম্পর্কে বিশ্বাস টলে গিয়েছিল? এত গদ্য লিখেছিলেন, ছেড়ে দিলেন তার সব দাবি? তিনি শুধু গানের স্রষ্টা? শুধু একজন গানের স্রষ্টাকে কি একজন বড় সাহিত্যিকের সম্মান দেওয়া যায়?

মৃত্যুর বছরে তাঁর ওই দ্বিধা-আশঙ্কার কোনও ভিত্তি ছিল না। বেশি লিখেছেন তিনি ঠিকই, পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যিক তাঁর সমতুল্য পৃষ্ঠা লিখে গেছেন কিনা সে বিষয়ে গবেষণার দরকার, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও বলা যায়, সাহিত্যের সব ক'টি শাখায় বিচরণ করে তিনি একটা উঁচু মান তৈরি করে দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষাকে তিনি করে দিয়েছেন সর্বত্রগামী। যে কোনও ভাষায় এরকম একজন লেখকের আবির্ভাব প্রায় অলৌকিক ঘটনা।

এখন মাঝে মাঝে ভাবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পুরনো হয়ে গেছে। বড় বেশি কথার বাহুল্য, আর পড়বার দরকার নেই। তবু তাঁর দু' চারটি লাইন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। এখনও পাতা ওলটাতে ওলটাতে তাঁর কোনও কোনও কবিতায় আবিষ্কারের আনন্দ পাই যেন। তখন মনে হয়, তাঁর পনেরো শ' কবিতার মধ্যে বেছে এখনও একশ কবিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যা আধুনিক পাঠককেও মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু সে রকম সংকলন কোথায়? তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য মনের মধ্যে কোনও তাগিদ অনুভব করি না। তা হলেও দৈবাৎ তাঁর কোনও ছোটগল্পের পৃষ্ঠায় চোখ আটকে গেলে, শুধু ভাষার সহাস্য মধুর দীপ্তির জন্যই শেষ না করে পারা যায়

না। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীতও বেশ একঘেয়ে লাগে। মনে হয় ওই একই গান আর কতবার শুনব? তবু নিজের অজ্ঞাতসারেই যখন-তখন তাঁর গান দু' এক লাইন গেয়ে উঠি। কোনও প্রিয় গায়ক-গায়িকাকে গাইতে শুনলে ঠোঁট নড়ে। এক-একটা গান আচমকা বুকে ধাক্কা দেয়। গীতবিতানের পৃষ্ঠা উলটে একটা গান খুঁজতে গিয়ে তার পাশের গানটি এবং তারও পাশের গানটি চোখ টেনে রাখে।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা যখনই ভাবি, তখন রামেন্দ্রসুন্দরেরই মতন, আমারও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার চিঠিপত্রগুলি যখন পড়ি তখন ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয়, এমন নিপুণভাবে তিনি আত্মগোপন করে থাকলেন কী করে? তাঁর এত অসংখ্য চিঠিতে, তাঁর কোনও জীবনীতেই তাঁকে চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি চিনতে আমাদের আরও অনেকদিন লাগবে মনে হয়।

আধুনিকতা ও আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুব মুসলমান নন। যেমন আমি হিন্দু নই। কোনও একটি রচনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে আর ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? কেননা ধর্মগুলি তো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার পথ বা সোপান। বৌদ্ধধর্মের মতন জটিল নেতিবাচক দর্শনটির প্রসঙ্গ এখানে আনবার দরকার নেই। মোট কথা, যিনি ঈশ্বর মানেন না, বা নিজেক বৌদ্ধ বলে ঘোষণা করেন না, তাঁকে বিশেষ কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত না করাই উচিত। বাল্যকালের সংস্কার ও পারিবারিক আচার-আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে উনিশ কুড়ি বছর থেকে আমিও নিরীশ্বর হয়ে উঠি। আমি ঈশ্বর-বিরোধী নই, কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বুঝে গেছি, আমার কোনও প্রয়োজন নেই ঈশ্বর অনুসন্ধানের। মনুষ্য জাতির কোনও অমানবিক সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রা নেই। মৃত্যুতেই এক জীবনের সব কিছুর পরিসমাপ্তি।

প্রাচীন ধর্মগুলির সবক'টিই দীর্ঘকালের দোষগুণে ভরা কিছু সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে গেছে। ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হলেও এই আবাল্য জড়িয়ে থাকা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। অসম্ভবই বলা যায়। কট্টর খ্রিস্টান হয়েও মাইকেল যেমন রপ্ত করতে পারেননি খ্রিস্টানি, বরং তাঁর মানসে বড় বেশি জড়িয়ে-মড়িয়ে ছিল হিন্দুত্ব। ব্রাহ্মরাও হিন্দুদের চেয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ একটি আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন, ব্রাহ্ম, না হিন্দু? এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একটু বেশি হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকে পড়লেও আবার সামলে নেন নিজেকে, পৌত্তলিকতা ও পরজন্ম বিশ্বাস এড়িয়ে যান অত্যন্ত সাবধানে। কিন্তু মুক্ত হতে পারেননি রাধাকৃষ্ণ মিথ থেকে। নাম উল্লেখ না করলেও বনের মধ্যে বংশীধ্বনি বারবার ঘুরে এসেছে তাঁর অসংখ্য গানে।

'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত আমার একটি কবিতা পাঠ করে আইয়ুব সিমলা থেকে আমাকে একটি ছোট্ট চিঠিতে জানান যে, সেই কবিতাটি পড়ে তাঁর জনৈক সূফী কবির একটি রচনার কথা মনে পড়েছে। যেমন আমাদের মনে পড়ে বৈষ্ণব পদাবলী। কিংবা রামায়ণ মহাভারতের কোনও অনুষঙ্গ। ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়েও আইয়ুব পূর্ণ আনন্দ পেতে পারেন গালিবের ভক্তিরসাত্মক পদ্যবন্ধে, আমরা অনেকে যেমন পাই রামপ্রসাদী গানে। এবং আমাদের পক্ষে সূফী কবিতা বা গালিবের কাব্য উপভোগ করার মতনই আইয়ুবের পক্ষেও বৈষ্ণব কাব্যের তারিফ করাও সহজ। (কাব্য আস্বাদনের সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের কি সম্পর্ক আছে কিছু? আমরা অল্প বয়েসে মনে করতাম, ধর্ম-টর্ম আর দু'চারদিনের মধ্যেই ফুৎকারে উড়ে যাবে। ও নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু কিছুই বদলায়নি)।

শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতাই নয়, রবীন্দ্র জীবন দর্শনেও আইয়ুব এতখানি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলেন ঠিক কী কারণে? যখন একালের কাব্য-পাঠকদের মধ্যে ক্রমশই রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে নিস্পৃহতা দেখা দিচ্ছে? এখন কি রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা, এই দুটি পক্ষ তৈরি করে তিনি তাঁর চমকপ্রদ জাদু লেখনী ধারণ করলেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে।

যারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে, তারা ঈশ্বরের বদলে কাকে অবলম্বন করে? কেউ কেউ মেতে ওঠে ঈশ্বরদ্রোহিতায়। সেটাই হয়ে ওঠে একটা নেশার বস্তু। এরকম আগে অনেকবার দেখা গেছে। কেউ কেউ পুরোপুরি সরে আসতে পারেন না, অস্বীকার করেন বটে ঈশ্বর নামে বিগ্রহকে, এমনকী সৃষ্টিকর্তাকেও, কিন্তু কোনও একটি শক্তি, চেতনার অতীত কোনও সত্তা, সৌন্দর্য-অনুভূতি দিয়ে দেখা মঙ্গল-অমঙ্গলের কোনও নিয়ামক যেন তাঁদের জীবনে থেকেই যায়। এই মোহময় সত্তা সম্পর্কে যুক্তিহীন সুস্বাদুতম ভাষায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে উপনিষদে। সেই ঔপনিষদিক ধারণাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে অনেকটা চুঁইয়ে এসে, অনেকটা সরলীকৃত হয়ে নানা বর্ণবাহারে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

আইয়ুবও কি সেই মোহেরই বিলাসী? তিনিও পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি? এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি এখনও এত আনন্দ পান, অথচ আমাদের একঘেয়ে লাগে? বুদ্ধদেব বসুকে আইয়ুব তাঁর প্রথম বাংলা গ্রন্থটির (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ) পাদটীকায় প্রশ্ন করছিলেন: "তিনি কি মানেন যে কবি ও পাঠকের মধ্যে বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গির মৌল বিরোধ কাব্য রস সম্ভোগের অন্তরায় হতে পারে?"

বুদ্ধদেব বসু এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। প্রশ্নটি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। এর উত্তর হিসেবে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে, না। মানি না। কবি ও পাঠকদের মধ্যে মৌল দৃষ্টিভঙ্গির তফাত থাকলেও কাব্য রস সম্ভোগের বাধা হয় না। এর পরেও একটা কিন্তু থেকে যায়। সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কবিতায় কোনও নিয়মই যেন চূড়ান্ত নয়। অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ থাকলে সে কাব্য বারবার পাঠ করতে ইচ্ছেও তো করে না। যে সব কবিতায় 'নাথ' 'প্রভু' সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে, সেগুলি আমার নিজের নিরালা মুহূর্তের কবিতা হয়ে ওঠে না। প্রকৃত কবি বোধহয় কখনও সুস্থির নন, তাঁর বিশ্বাস অচল অটল নয়, তিনি বারবার নিজেই নিজেকে কন্ট্রাডিক্ট করেন বা করতে পারেনই। এই জন্যই বলা হয় যে কবিতার ইতিহাস তার বক্তব্যের ইতিহাস নয়, রূপের ইতিহাস।

আধুনিকতার দুটি লক্ষণ তুলে ধরেছেন আইয়ুব। এক, কাব্য দেহের প্রতি একাগ্র মনোনিবেশ, যার পরিণাম কাব্য রচনায় ও সমালোচনায় দেহাত্মবাদ। দুই, জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য। পাছে তাঁকে ভুল বোঝে, তাই আইয়ুব এই সঙ্গেই যোগ করে দিয়েছেন যে, তাঁর "নালিশ সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নয়, আধুনিক সাহিত্যের পূর্বোল্লিখিত দুই ধারার বিরুদ্ধেই...যা করেছি, সঞ্চিত বেদনা থেকে করেছি, সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান অশ্রদ্ধা থেকে নয়।"

এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমার দীর্ঘকালব্যাপী এক খটকা রয়ে গেছে। সে ওই 'সঞ্চিত

বেদনা' সম্পর্কে। কীসের বেদনা? আধুনিক সাহিত্যের উপরোক্ত ওই দুই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বেদনা দিয়েছে? তাঁকে বহুভাবে অতৃপ্তি দিয়েছে? তাই তিনি সান্ত্বনা পেয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যে? বহু কিছু পাঠ করেও তাঁর অতৃপ্ত তৃষিত মন প্রথম শান্তি পায় ইংরিজি গীতাঞ্জলিতে। তারপর তিনি নিজে উদ্যোগ করে বাংলা শিখলেন এবং নিমজ্জিত হয়ে গেলেন রবীন্দ্র সমুদ্রে। বাকি জীবনে, বাংলা ভাষায় অন্তত, তিনি আর কিছুই লিখলেন না, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ছাড়া। গালিবের কাব্য অনুবাদে কিংবা তাঁর আত্মজীবনীর টুকরোতে ও ভাষারীতিতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। তাঁর বাংলা গদ্য ভাষায় উর্দু শব্দের কোনও স্থান নেই (সৈয়দ মুজতবা আলীর সম্পূর্ণ বিপরীত), জীবাত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সাবলীল। তবে কি তাঁর মনের ঝোঁকই ছিল এইদিকে? ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়েও তিনি মানবজীবনের একটি গভীর অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন? আপন আলোকে ধৌত এক 'চিরস্তব্ধ পথ' তাঁকেও মুগ্ধ করে?

তাঁর দেখানোর আধুনিকতার দ্বিতীয় লক্ষণটি আমাকে গোড়া থেকেই অবাক করেছিল। 'জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য?' আমরা যাদের আধুনিক লেখক বলি, তাদের রচনায় কোথায় এ লক্ষণ? কখনও একথা খেয়াল হয়নি তো? আমি নিজেকেও যদি একজন আধুনিক লেখক হিসেবে দাবি করি, তা হলে আমি তো জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে কখনও চিন্তা করি না। এই সূত্রটি আইয়ুবকে দিয়েছেন একজন পাশ্চাত্য বিশারদ। সাহিত্য সম্পর্কে কোনও সাধারণ সূত্র খুঁজতে গেলে যে বিপদ হয়, আইয়ুবও সেই বিপদে পড়েছেন। একজন তাঁকে মনগড়া একটা হাওয়ায় ভাসমান অলীক দুর্গ দেখিয়েছে, আইয়ুব সেই দুর্গকে প্রতিপক্ষ ভেবেছেন। এই সূত্র থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতা অনেকটাই বোদলেয়ার প্রভাবিত। এবং বোদলেয়ার অমঙ্গলের প্রধান স্তোত্র রচয়িতা! (আমার মনে হয়, বোদলেয়ারের অমঙ্গল স্তোত্রও আসলে কবিতা রচনার একটা কায়দামাত্র। কবির দৃঢ়বিশ্বাস প্রসূত নয়। 'শক এলিমেন্ট' সাহিত্যের একটি জরুরি অংশ। কয়েক দশক পরে পরেই কোনও লেখক এরকম একটা কিছু সাড়া জাগানো ব্যাপার করেন। এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলা সাহিত্যে তো দূরের কথা, আধুনিক ফরাসি সাহিত্যেও বোদলেয়ারের প্রভাব নগণ্য। এখানকার কবিদের কাছে বোদলেয়ারের কবিতা কৌতূহল-পাঠ্য মাত্র। বুদ্ধদেব বসু, বোদলেয়ারের কবিতাবলীর অনুবাদ করলে আমরা শুধু অনুবাদ সৌকর্যেরই বিচার করেছিলাম।) সুতরাং বোদলেয়ারের নামে রচিত অমঙ্গল চিন্তার অমঙ্গলবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সুতরাং, কিছুটা নিম্নস্বরে বলা যায়, আইয়ুব চিনতে ভুল করেছিলেন আধুনিকতার চরিত্র লক্ষণ। কিন্তু ভুলের ওপরও তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন অসাধারণ একটি উদ্যান। তাঁর বইটি পড়তে পড়তে আমরা তাঁর সঙ্গে তর্কে নামার জন্য একটুও প্রবৃত্ত হই না, বরং মুগ্ধ হয়ে দেখি অপরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার মধ্যে তাঁর আত্ম-অনুসন্ধান।

আধুনিককালে, ঈশ্বরকে হারিয়ে আমাদের আর কোনও বিকল্প নেই। আমরা প্রত্যেকে একা, সমস্ত দুঃখ সুখ আমাদের একা একা ভোগ করে যেতে হবে। প্রকৃতি

আমাদের কাছে শুধুই প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি নয়, এবং সমস্ত রূপ শুধু, এক জীবনে ক্ষয়ে যাবার। আধুনিক মানুষ অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জেনে গেছে যে চিরপথ বা চিরশান্তি বলে কিছু নেই। সেইজন্যই সে মুহূর্তের সুখ বা সাময়িক সুখকেও সুবিশাল করে দেখতে চায়। জাগতিক অমঙ্গলের কথা সে চিন্তাই করে না, সে জানে তার নিজের মধ্যে ডুব দেওয়া ছাড়া আনন্দের আর কোনও খনি নেই।

আইয়ুব একা হতে চাননি। তিনি রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে শান্তি পেয়েছেন। নিশ্চয়ই তাঁর 'সঞ্চিত বেদনা' সব কেটে গেছে। তিনি শান্তি ও আনন্দ পেয়েছেন জেনে আমরাও সুখী।

বিভূতিভূষণ ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা

বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসটি যখন প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন আমার বয়েস তিন-চার বছর। বই পড়ার বদলে বইয়ের পৃষ্ঠা ছেঁড়ার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। কী জানি, হয়তো 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠাও আমি ছিঁড়ে কুচি-কুচি করেছি।

এখনকার দিনের বাচ্চারা দু'-আড়াই বছর বয়েস থেকে মাথায় লেখাপড়ার বোঝা চাপাতে বাধ্য হয়। আমাদের সময়ে পাঁচ বছর বয়েসে সরস্বতী দেবীপ্রতিমার সামনে হাতেখড়ি হত। তার আগে পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান নিষিদ্ধ ছিল। তার পর থেকেই অগ্রগতি হত অতি দ্রুত। আট-ন' বছর বয়েসের মধ্যেই সুকুমার রায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় পড়ে শেষ করে ফেলেছি। সেই বয়েসে লেখকের নাম না জেনে কিংবা খেয়াল না করেই পড়ে যেতাম অনেক বই, সম্ভবত সেই ভাবেই পড়েছি বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' ও 'মিসমিদের কবচ'।

পাঠক হিসেবে আমরা প্রাপ্তবয়েস হই ঠিক কবে থেকে? কয়েক দশক আগেও একুশ বছরের কম বয়স্কদের নাবালক বলা হত। এখন ভোটাধিকারের বয়েস আঠারো করা হয়েছে, কিন্তু পিউবার্টি এসে যায় চোদ্দ বছর বয়েসেই, মেয়েদের বোধহয় আর একটু আগে। স্পষ্ট মনে আছে, আমি প্রথম প্রেমপত্রটি লিখেছিলাম চোদ্দ বছর বয়েসে, সুতরাং 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর', এই ধরনের বাক্য বোঝার মতন পরিণত হয়েছে মস্তিষ্ক, সব ধরনের বই পড়বারও অধিকার জন্মে যায়। আমাদের গুরুজনরা অবশ্য তখনও আমাদের নিতান্ত বালক বলেই গণ্য করতেন, এ বই পড়বে না, সে বই পড়বে না, এরকম নির্দেশ জারি করতেন, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার জেদ আরও বাড়ে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধিনিষেধ তেমন কড়া ছিল না। আমার মায়ের ছিল খুব বই পড়ার নেশা, লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রতিদিন মায়ের জন্য দু'খানা বইয়ের জোগানদার ছিলাম আমি, এবং সেই দুটি বই আমারও পড়া হয়ে যেত।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমার পাঠাভ্যাস ছিল এলোমেলো। হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই-ই পড়েছি। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরী সিরিজের পাশাপাশি বঙ্কিম রচনাবলী, কিংবা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের রগরগে উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ দত্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস। ক্ষুধার্তের যেমন খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার থাকে না। তারপর যখন লেখকদের চিনতে শিখলাম, তখন লাইব্রেরিতে গিয়ে এক একজন লেখকের নাম ধরে তাঁর সমস্ত লেখা পড়ে ফেলতে শুরু করি।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর বৎসরে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। ততদিনে তাঁর প্রকাশিত সবগুলি বই আমার পড়া হয়ে গেছে। তিনি আমার বিশেষ প্রিয় লেখক।

আমি শুধু তাঁর একটি উপন্যাস নিয়ে পাঠক হিসেবে আমার বিবর্তনের কথা বলব।

'আরণ্যক' প্রথম পাঠে ছিল অবিমিশ্র মুগ্ধতা। সিকি অংশ পড়ার পরেই সন্দেহ হয়েছিল, এ রকম বই আগে কখনও পড়িনি, বাংলা ভাষায় এ রকম বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার কথা আগে কেউ চিন্তাও করেননি। সত্যিই তো, অরণ্যজীবন নিয়ে বাংলায় কে আর তেমন কী লিখেছেন? রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে অরণ্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই সমাজভিত্তিক। বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের অরণ্য-অভিজ্ঞতা ছিল না। বাড়ির পাশেই এত বড় সুন্দরবন একেবারে অপরিচিত। 'কপালকুণ্ডলা'য় অরণ্যের ভূমিকা নামমাত্র, যেটুকু আছে তাও বাস্তবতাবর্জিত।

প্রথম পাঠে আরণ্যকের প্রকৃতি-বন্দনাই দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল, প্রতিটি পৃষ্ঠাই ছিল এক অচেনা জগতের উন্মোচনের মতন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছুটা অরণ্য-টান থাকে, বিবর্তন-স্মৃতির সূত্রে, আমরা খুব বেশিদিন অরণ্য ছেড়ে বাইরে আসিনি। নগরবাসী হয়েও যে আমাদের মাঝে মাঝেই জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার ঝোঁক, সেটাও হয়তো ওই বিবর্তন-স্মৃতি, ফিরে যাবার ইচ্ছে। কেউ কেউ জোর করে এটা অস্বীকার করতে চায়, যেমন বোদলেয়ার শহরেও গাছপালা থাকা অপছন্দ করতেন, কিন্তু এই অস্বীকারও স্মৃতিকে প্রমাণ করে।

সেই বয়েসে লবটুলিয়া-বইহারের জ্যোৎস্না-নিশীথের বর্ণনায় এতই অভিভূত ছিলাম যে বুঝিনি, আরণ্যক উপন্যাসের মূল উপজীব্য শুধু অরণ্য বা আরণ্যক জীবন নয়। ন্যুট হামসুনের 'প্যান' কিংবা উইলিয়াম হেনরি হাডসনের 'গ্রীন ম্যানসানের' সঙ্গে এ উপন্যাসের অনেক তফাত।

একবার পূর্ণিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি ও তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা বাগান দেখার জন্য। সেই সঙ্গে সাধ হয়েছিল, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের পটভূমিতেও থেকে আসব কয়েকটি দিন। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ও রকম কোনও অরণ্যের অস্তিত্ব সে অঞ্চলে নেই, যদিও পূর্ণিয়া শহরের নৈকট্যের কথা আরণ্যকে উল্লেখিত হয়েছে বারবার। কিন্তু আরণ্যক তো ভ্রমণকাহিনী বা ডায়েরি নয়, উপন্যাস, একথা লেখক জানিয়ে দিয়েছেন গোড়াতেই। সুতরাং ওই অরণ্য কাল্পনিক হতে বাধা নেই। শুধু তাই নয়, যে নিবিড়, নিস্তব্ধ অরণ্যভূমির কথা তিনি লিখেছেন, তার ধ্বংসের কথা, জঙ্গল সাফ করে মানুষের গৃহস্থালি স্থাপনের কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন উপসংহারে। কিন্তু পাঠক হিসেবে তা আমরা মানতে পারি না। বাস্তবের সেই অরণ্য অপসৃত হয়ে গেলেও আমাদের কল্পনায় তা চিরস্থায়ী হয়ে গেছে।

আরণ্যক দ্বিতীয়বার পাঠ করি ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েসে। কৈশোরের সেই মুগ্ধতার বদলে খানিকটা সমালোচকের চোখ নিয়ে। তখন আমরা সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে মেতে আছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতিকে ধাক্কা মারছি বারবার, শরৎচন্দ্র অনেকখানি আড়ালে চলে গেছেন, একদিকে তারাশঙ্কর-মানিক-সতীনাথ প্রমুখ, অন্যদিকে কল্লোল যুগের লেখকরা আমাদের মন জুড়ে আছেন। বিভূতিভূষণও

আমাদের প্রিয় লেখক বটে, কিন্তু তিনি ঠিক আধুনিক কিনা, সে বিষয়ে মনস্থির করা যাচ্ছে না। এবার আরণ্যক পড়ার পর দুটি কারণে ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল। প্রথমত, ভাষা। আধুনিকতার একটা শর্তই হল, পুরনো আঙ্গিক ও ভাষা ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করা। আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই সাহিত্যের অগ্রগতি। এমনকী অনেকে এমন কথাও বলতে শুরু করেছিলেন যে, সাহিত্যের মধ্যে কোনও বক্তব্য বা বাণী খোঁজা উচিত নয়। আঙ্গিকই তার বাণী। ফর্ম ইজ দ্য মেসেজ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'অ্যান একার অফ গ্রীন গ্রাস' নামে ইংরিজি প্রবন্ধের বইতে এমন মন্তব্য করেছিলেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বিষয়বস্তু বা মালমশলা অনেক আছে, কিন্তু কী করে লিখতে হয় তা তিনি জানেন না। আর প্রবোধকুমার সান্যালের আছে উত্তম লেখার স্টাইল, কিন্তু বিষয়বস্তু কিছু নেই। উক্তিটি চমকপ্রদ, কিন্তু বলাই বাহুল্য, সত্য নয়। সেই বয়েসে আমরা কল্লোলীয় লেখকদের ভাষাবৈচিত্র্যে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে, এই ধরনের মত খানিকটা বিশ্বাসও করেছিলাম।

বিভূতিভূষণের ভাষা বেশ এলানো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাধু বাংলা ছেড়ে চলিত ক্রিয়াপদ চালু করে গেছেন, রবীন্দ্র-বিরোধী কল্লোলগোষ্ঠীও ঝকঝকে চলিত গদ্য লেখেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ অনেকদিন ধরে আঁকড়ে ছিলেন সাধু বাংলা। শনিবারের চিঠির যুগের অনেকেই সাধু বাংলায় লিখতেন, আমরা তাঁদের মনে করতাম প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। আরণ্যকের ১৫ নং পৃষ্ঠায় এরকম একটি বাক্য আছে—'কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল।' এর ঠিক দু'পাতা পরেই আবার আছে, 'কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল।' এত কাছাকাছি একই রকম বাক্য ব্যবহার করা তো অমার্জনীয় অপরাধ। একজন লেখক কেন এমন অমনোযোগী হবেন?

আরণ্যক সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি, এই দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠার উপন্যাসটিতে যৌনতার নামগন্ধ নেই। শরীর একেবারে অনুপস্থিত। উপন্যাসটি নিছক কল্প-কাহিনী নয়, গাছপালার চেয়ে মানুষের কথাই বেশি, বর্ণনাভঙ্গিও রোমান্স জাতীয় নয়, বাস্তব ঘেঁষা। স্বয়ং গল্পের লেখক বা উত্তম পুরুষে বর্ণিত নায়ক একটি অবিবাহিত যুবক, সে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন অথবা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সন্ধানী, তার নিজস্ব কোনও কামনা বাসনা নেই? জঙ্গলে দিনের পর দিন বাস করেও মানুষ শুধু জঙ্গলের সৌন্দর্য দেখে না, অধিকাংশ সময়েই সে নিজেকে দেখে। নিঃসঙ্গতা কখনও কখনও উপভোগ্য, কখনও তা গলা টিপে ধরে। জল যেমন জলের দিকে যায়, মানুষও তেমনি মানুষকে চায়। আরণ্যকে বিভূতিভূষণ জোর করেই যেন এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন।

সেক্সুয়াল টেনশান বা যৌন-টান অধিকাংশ উপন্যাসেই অন্তর্লীন থাকে। অনেকে হয়তো এটা মানতে চাইবেন না। আর একটু মনোরম করে বলা যায়, নারী-পুরুষের পরস্পরের সঙ্গ বাসনা কি জীবনের প্রধান অঙ্গ নয়? আরও মধুর করে বলতে গেলে, ভালোবাসার এত ব্যাকুলতা ছাড়া কি জীবন-যাপন সম্ভব? প্রকৃতি কি তার বিকল্প হতে পারে?

সেই তুলনায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কিংবা 'অচিন রাগিণী' অনেক বেশি জীবনসত্যের কাছাকাছি।

এরপর আরণ্যক বইখানি পড়িনি বহুদিন। এমন বই বারবার কেই বা পড়ে! বিভূতিভূষণকে ঠিক আধুনিক ধারার লেখক হিসেবে গণ্য না করে বিশেষ এক ধরনের লেখক হিসেবে ধরে রেখেছিলাম। একটা ব্যাপার অনুভব করতাম, অনেক বই ভাল লাগলেও কিছুদিন পর সবটা মনে থাকে না, কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখাগুলি মনে গেঁথে যায়। আমি কোনও নির্জন রেল স্টেশনে, কিংবা গ্রামের রাস্তায় কিংবা জঙ্গলের প্রান্তে এক একটা মানুষকে দেখে চমকে উঠেছি। ঠিক যেন বিভূতিভূষণের এক একটি চরিত্র। সারা বাংলায় বিভূতিভূষণের যত চরিত্র আজও ছড়িয়ে আছে, তত বোধহয় আর কোনও লেখকের নেই।

মাত্র বছর পাঁচেক আগে, কিছুদিন জ্বরে ভোগার সময় শয্যাবন্দি হয়ে, হাতের কাছে আর কোনও বই না পেয়ে বিভূতিভূষণের রচনাবলী পড়তে শুরু করি। এর মধ্যে আমার জীবন ও মানসিকতায় বহু পরিবর্তন এসে গেছে। 'পথের পাঁচালী'র চেয়ে 'অপরাজিত' এক সময় আমার উৎকৃষ্টতর মনে হত, এবার পথের পাঁচালীই বেশি ভাল লাগল। 'দেবযান' পড়তে পড়তে অসমাপ্ত রেখে আমি আবার শুরু করলাম 'আরণ্যক'। কাহিনী অংশ সম্পূর্ণ মনে আছে, তবু প্রতিটি পৃষ্ঠাকে যেন আবিষ্কার করতে লাগলাম নতুন ভাবে।

সবচেয়ে বেশি ভাল লাগল তাঁর ভাষা ও স্টাইল। আগে স্টাইল বা আঙ্গিক সম্পর্কে কী ভুল ধারণাই না ছিল। ভাষার বেশি বেশি চাকচিক্য, শব্দ নিয়ে মল্লযুদ্ধ, প্যাঁচালো বাক্যগঠন আসলে নিকৃষ্ট স্টাইল, রচনায় এনে দেয় আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা। যাঁরা বড় শিল্পী তাঁরা ভাষাশৈলীর পেছনে যে প্রচেষ্টা তা সযত্নে মুছে দেন। সহজ সরল ভাষা রচনাই সবচেয়ে কঠিন। 'এখানে বনের ধারে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', জীবনানন্দ দাশের এই ধরনের লাইন মনে হয় যেন অতি সাধারণ, কিন্তু কতখানি যত্নে, কত চিন্তা করে যে তিনি এই রকম পঙ্ক্তি রচনা করেন, তা বোঝা যায় তাঁর পাণ্ডুলিপি দেখে। তাঁর সমসাময়িক কিছু কবি কত চতুর, কত উজ্জ্বল বাক্যবন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলি আর মনে দাগ কাটে না, অথচ জীবনানন্দের কবিতা অমলিন রয়ে গেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর বৈদগ্ধ্যের কথা আমরা জানি, কিন্তু 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' রচনার সময় ভাষাকে তিনি কত সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনেছেন, কোথাও লেখকের কেরামতি দেখে হোঁচট খেতে হয় না, সেই জন্যই ওই বই বারবার পড়া যায়। বিভূতিভূষণের আরণ্যকের ভাষার সারল্যও ইচ্ছাকৃত, পথের পাঁচালীর চেয়েও এই ভাষা বেশি সরল এবং তাঁর বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী।

আরণ্যকে শরীরের জ্বালার কথাও একেবারে অনুপস্থিত নয়। এই উপন্যাসে সবরকম উত্তেজক ঘটনাই সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। অরণ্যটি শ্বাপদসংকুল, হিংস্র জানোয়ারদের উপস্থিতির কথা আমরা জানি, তবু কোথাও তাদের বর্ণনা নেই। কোথাও শিকার করার বর্ণনা দেননি লেখক, অথচ বোঝা যায় অনেকবারই জন্তু-জানোয়ার শিকার করা হয়েছে, তখন গাছ কাটা বা প্রাণিহত্যা কোনওটাই নিষিদ্ধ ছিল

না, কিন্তু লেখক যে একবার একটি নীলগাইকে মারতে গিয়েও মারেননি, শুধু সেই কথাটাই জানিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষেরা এসে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছে, প্রথম প্রথম নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, মারামারি হওয়া স্বাভাবিক, তার কোনও উল্লেখ নেই। একবার আছে শুধু জমির লড়াইয়ের কথা। তিনি শুধু মানুষের বেঁচে থাকার জেদের দিকটার কথাই লিখতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে সব কিছুই চাপা সুরে, সেই কারণে নারী-পুরুষের পারস্পরিক টানের কথাও প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যথাসম্ভব।

বিভূতিভূষণ যে প্রেমের তীব্রতা বা যৌন আকর্ষণ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন কিংবা শুধু মানুষের ভালমানুষীর কথাই লিখে গেছেন, তাও ঠিক নয়। তাঁর 'অথৈ জলে' নামে উপন্যাসটি বহুপঠিত নয়, সেই উপন্যাসে তিনি যেন হঠাৎ কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন, এবং শহুরে প্রেম দেখাতে গিয়ে আমদানি করেছিলেন অনেকখানি আদিরস। কিন্তু সব লেখকের কলম সব দিকে খোলে না। ও পথ বিভূতিভূষণের নয়। আরণ্যকে অবিবাহিত যুবকটির নারীসঙ্গ বাসনা বা রূপানুরাগ সম্পূর্ণ উহ্য নয়, অসাধারণ মুনশিয়ানায় দু' একটা আঁচড়ে মাত্র তা ফুটিয়েছেন। এই কাহিনীতে প্রধান স্ত্রী চরিত্র তিনটি, মঞ্চী, কুন্তা ও ভানুমতী, যেন নারীর তিনটি রূপ। বৃদ্ধ নকছেদীর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী বধূর সঙ্গে লেখকের বেশ একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও এ মেয়েটি ছিল খানিকটা রহস্যময়ী। এই মঞ্চীর প্রতি লেখকের টান ফুটে ওঠে একটিমাত্র বাক্যে। স্বামীর বুদ্ধির দোষে মঞ্চীর একমাত্র পুত্রটি মারা যায়, কিছুদিন পর অভিমান করে মঞ্চী বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় অন্য কারুর সঙ্গে। নকছেদী যখন এই কাহিনী লেখকের পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোঝালে, তখন বিভূতিভূষণ লিখছেন, "বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, বৃদ্ধ নকছেদী ভকতের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই বন্য মেয়েটির জন্য।" আদিবাসী রাজবংশের কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়ে একটু বেশি, তিনি তাকে আয়না কিনে উপহার দিয়েছেন, দু'জনে নির্জন পাহাড়ের পাথরখণ্ডের ওপর বসে গল্প করে, অঙ্গস্পর্শ পর্যন্ত এগোননি বিভূতভূষণ। এই মেয়েটির কথা লেখার সময় তাঁর মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল, একবার তাকে প্রায় যুবতী বলেও পরে আবার তাকে কিশোরীতে পরিণত করেছেন, এবং শেষের দিকে প্রকাশ করেই ফেলেছেন, 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।'

এক সময়ে বাংলা সাহিত্যে বড় সাদা-কালোর উপদ্রব হয়েছিল। কিছু কিছু চরিত্র একেবারে সাদা, তারা সৎ, সরল, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, আর কিছু কিছু চরিত্র কুচকুচে কালো, যারা জমিদার, মহাজন, কারখানার মালিক বা জোতদার। সব কাহিনীতেই এই দুই শ্রেণীর লড়াই, অবাস্তব, রক্তমাংসহীন, কার্ডবোর্ডের মানুষ। শিল্পীর চোখ সব মানুষের মধ্যেই মানুষকে খোঁজে। ধাওতাল সাহু কিংবা যুগলপ্রসাদের মতন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আগে দেখা যায়নি। ধাওতাল সাহু একজন বিত্তবান মহাজন, বেশিরভাগ আধুনিক উপন্যাসেই সে অত্যাচারী, ব্যভিচারী রূপে

দেখা দিত, কিন্তু এমন মানুষও থাকে, যে ঋণ দিয়ে তাগাদা দেয় না, বিনা দ্বিধায় দলিল ছিঁড়ে ফেলে, এমনই লাজুক ও ভদ্র সে যে, ঋণগ্রহণকারীর বাড়ির ধারকাছ দিয়েও হাঁটে না। আর যুগলপ্রসাদ নিঃস্বার্থভাবে জঙ্গলে নানান ফুলগাছ লাগিয়ে যায়, তার নিজস্ব উদ্যান নেই, পৃথিবীটাকেই সুন্দর করে দিতে চায় সে। সামান্য ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে খেয়ে যারা বেঁচে থাকে, তারাও হাসে, তাদের জীবন থেকেও সৌন্দর্যবোধ একেবারে অন্তর্হিত হয়নি, এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমাদের আপ্লুত করে। আসলে যা চিরকালীন, সেটাই প্রকৃত আধুনিক।

সুধীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মুখে কবিতা পাঠ শোনার সৌভাগ্য আমার একবার মাত্র হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে গীতা ভবনে একটি ছোট্ট ফরাস-পাতা অনুষ্ঠানে সমবেত কবি ও পাঠকদের মাঝখানে তিনি বৈদূর্যমণির মতন বসে ছিলেন। তাঁর ভাব-ব্যবহারে সব সময় এক ধরনের চাপা অহংকার প্রকাশ পেত, কিন্তু যে কারণেই হোক, সেদিন তিনি খুব উৎফুল্ল ও সহজ ছিলেন, কবিতা সম্পর্কে না-বাঁধা-ধরা কথা বলছিলেন এবং অনেকগুলি কবিতা পড়লেন, তার মধ্যে কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের ও কয়েকটি নিজের। আমরা একেবারে পেছনের সারিতে বসে নিবিড় আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে লক্ষ করছিলুম।

আমি এখনও তাঁর সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, সেই দৃশ্য মনে করা মাত্র। সেদিনও আমার মনে হয়েছিল, এখনও মনে হয়, তিনি কবিতা একটু সুর করে পড়তে ভালবাসতেন। প্রত্যেক লাইনের শেষে একটা টানা ঝোঁক (তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতিশয় সুললিত পৌরুষময়)—প্রতিটি লাইনকে আলাদা ভাবে ঝংকারময় করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা পড়তে গেলেই আমার মনে পড়েছে তাঁর সেই ঝংকার প্রবণতা। সুধীন্দ্রনাথের বহু কবিতা বারংবার পড়ার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সংগীতের ধর্ম, ঝংকার, বাক্যের শব্দগুণের সার্থক ব্যবহারের প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতা আসলে হালকা ধরনের।

প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের মূর্তিই কবি সুধীন্দ্রনাথের ওপর গাঢ় ছায়া ফেলেছে। তাঁর প্রবন্ধাবলী কিছুটা খটমটে ও দুষ্পাঠ্য—এরকম ধারণা প্রচলিত আছে, সেই সঙ্গে তাঁর কবিতাও কঠিন। কবিতায় দুরূহ বা অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগের ওপর কবিতার কাঠিন্য-সরলতা নির্ভর করে না। মাইকেল মধুসূদন খুব বোম্বাস্টিক শব্দ ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু তাঁর কবিতাকে কেউ কঠিন বলবে না, মাইকেলের কবিতা জলবৎ সরল। কবি সুধীন্দ্রনাথও সরল ধরনের কবি, হালকা মেজাজে গানের মতন কবিতা লিখতেন, কিছু শব্দ ও বাক্যবন্ধ জটিল এই যা। কিন্তু তাঁর কবিতায় কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই, প্রায় সব কবিতাতেই একটি নির্দিষ্ট আরম্ভ, মাঝখানে উত্থান ও শেষে পরিণতি বা সমাধানের কথা আছে, সুতরাং রহস্যেরও অবকাশ কম। এই কারণে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আমি বারবার পড়তে ভালবাসি, কিন্তু তিনি আমার প্রিয় কবি নন।

যেন মনে হয়, হাইনের হালকা মেজাজের বিদ্রূপ গাথা ও প্রেমের গানগুলির সঙ্গেই তাঁর কবিতার মিল বেশি। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি হাইনের খুব অনুরাগী ছিলেন শুনেছি, তা ছাড়া আর একটা বাইরের মিল আছে। সুধীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯০১ সালে,

তাঁর কবিতায় আছে, 'আমি এই শতাব্দীর সমান বয়সী'। হাইনেও নিজের জন্মসাল থেকে বছর তিনেক চুরি করে, নিজেকে উনবিংশ শতাব্দীর সমান বয়েসি বলতে ভালবাসতেন। অবশ্য শতাব্দী চেতনা হাইনের কবিতায় খুব কমই উপস্থিত, সুধীন্দ্রনাথ নিজের কবিতায় শতাব্দী চেতনা সম্পর্কে খুব জাগরূক ছিলেন, এবং তা সীমিতভাবে সার্থক ও উপস্থিত। যাই হোক, সংগীত ও ঝংকার গুণ এবং এগুলির অহেতুক আকর্ষণ তাঁর কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, একটি কবিতা আলোচনা করে দেখা যাক। কবিতাটির নাম 'দুঃসময়'।

কবিতাটি পড়ার সময় একটি মাত্র শব্দের মানে জানবার জন্য আমাকে অভিধান দেখতে হয়েছে। 'প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত'—এই লাইনের নিবীত শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। শব্দটি অপ্রচলিত, এর মানে হতে পারে যজ্ঞসূত্র অথবা চতুর্বেদীব্রাহ্মণরা মোটা পৈতে যখন মালার মতো করে গলায় পরে সেই পৈতে অথবা সাধারণভাবে উত্তরীয় বা চাদরও হতে পারে। অর্থাৎ কণ্ঠলগ্ন মেয়েলি হাতের সঙ্গে যজ্ঞসূত্র, পৈতে বা উত্তরীয়ের তুলনা। এমন কিছু অবশ্যম্ভাবী ব্যবহার নয়, বুঝতেই পারছি—শব্দটা এসেছে মিলের খাতিরে, এ কবিতায় মিলের বড় কড়াকড়ি, প্রতিটি লাইনের মিল সুচিন্তিত, একটি কথার সঙ্গে আট লাইন পরেও মিল দেওয়া আছে, আবার কোথাও পরপর তিন লাইনে সমজাতীয় মিল। নিবীত শব্দটির আগে দু' লাইনের শেষে আছে 'ভিত' আর 'অতীত'। কবিতাটির একটি শব্দ আমার অপছন্দ হয়েছে, 'আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন'—এর আস্ফালিবে শব্দটা শুনতে ভাল না। আরেক জায়গায় শব্দের ব্যবহার আমার কাছে মনে হয়েছে অনুচিত। 'উন্মথি হৃদয়সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে/অভ্যুত্থিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে';—এখানে, নিজের হৃদয় মন্থন করে অমৃত বার করে আনার উল্লেখ একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল, তা ছাড়া অমৃতের পাত্র নারীর হাত থেকে গ্রহণ করার দৃশ্যই সুসহ ও আবেগসিদ্ধ, তা ছাড়া 'সুধাভাণ্ড' শব্দটি মন্থনের প্রসঙ্গে একেবারে রবীন্দ্রনাথের ছাপ মারা। মন্থনের কথা বলতে গিয়ে 'সুধাভাণ্ড' কথাটি প্রয়োগ করলেই রবীন্দ্রনাথের মৃদুহাস্য অন্তরীক্ষে দেখা যায়। এইরকমই আর একটি শব্দ 'অমরা'—এর এক লাইন পরেই আছে।

কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে, কবিতাটিতে মিলের বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে। অনেকটা যেন অঙ্ককষা মিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতার চেহারার দৃঢ়তায় খুব বিশ্বাস করতেন। আলগা-ছড়ানো লাইন সম্পর্কে তাঁর খুব আপত্তি ছিল, মালার্মে ও ভালেরি গোত্র সুধীন্দ্রনাথ পরিশ্রমী, নিখুঁত ওজনের শব্দসম্পন্ন কবিতা না হলে খুবই অপছন্দ করতেন। এই ঢিলেমির জন্যই বোধহয় জীবনানন্দ দাশের কবিতা তাঁকে কখনও তেমন আকর্ষণ করেনি। বুদ্ধদেব বসুর মুখে শুনেছি, জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে এক পাতা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ছাপা আছে, তাই দেখে সুধীন্দ্রনাথ বিস্ময়প্রকাশ করে বলেছিলেন, এত কাটাকুটি করেও একজন লোক কী করে এত খারাপ লিখতে পারে? আমি একটি ঘটনা জানি, সিগনেট প্রেস থেকে যখন তাঁর 'স্বগত' ছাপা হচ্ছিল, তখন দৈবাৎ একদিন সেই বইয়ের প্রুফ সংক্রান্ত আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলাম।

শুনলাম, সুধীন্দ্রনাথ একটি শব্দ বারবার প্রুফে কাটছেন, প্রেস বারবার ভুল করছে। তিনি লিখেছিলেন, 'কমঠ বৃত্তি', প্রেস থেকে বারবার ভুল করছে সেটাকে 'কর্মঠ বৃত্তি' বলে। বলাই বাহুল্য, 'কমঠ' শব্দটির মানে আমি জানতুম না এবং সেখানে মুখ খুলে অজ্ঞতা প্রকাশ করিনি। বাড়িতে এসে চুপি চুপি অভিধান দেখলাম, খুবই সাধারণ কথা। কমঠ মানে কচ্ছপ, অর্থাৎ কথাটা কূর্মবৃত্তি নামেই প্রচলিত। এই ধরনের অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাঁর রচনায় একটি বিশেষ স্বাদ ও আবহাওয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতা ভাল করে বিচার করে বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, কবি হিসেবে তিনিও আসলে ঢিলেঢালা প্রকৃতির, তাঁর শব্দাবলী মোটেই ওজন করা ও অমোঘ নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রচলিত, গতানুগতিক ছবি ব্যবহার করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল খুব বেশি, অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর্যায়ে। বস্তুত, বহু ব্যবহৃত ছবি তিনি প্রয়োগ করেছেন বড়ই বেশি, এতে তাঁর কবিতা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। এই দুঃসময় কবিতাতেই সে-রকম ত্রুটি অনেকগুলো। যেমন অন্ধকার বললেই এলো চুল ছড়ানোর বর্ণনা (তমো তবু কবরী এলায়), আকাশ বললেই আয়নার উল্লেখ (তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশ মুকুরে), মৃত্যুর মাধুরী কিংবা মৃত্যুর জাল ছড়ানো—সচেতন কবির এ সব প্রয়োগ কাম্য নয়। তারপর, মিলের কারুকার্য দেখাবার জন্য তিনি অনেকবার বিপথে গিয়েছেন। আট লাইন পরে গিয়েও আবার ঘুরিয়ে মিল দেবার কী প্রয়োজন? আমার ব্যক্তিগত ধারণা, মিলের লোভেই বাংলা কবিতার বড় বেশি ক্ষতি হয়েছে। মিলের খাতিরেই তিনি 'স্বপ্ন' এই কথাটির বদলে—'স্বপন' এই কোমরভাঙা শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। অনেক অবান্তর কথাও এসেছে, যেমন কবিতাটির শেষ লাইনে 'নব নীহারিকা' কিছুটা অযৌক্তিক। এরকমই অযৌক্তিক, 'অনুচিত অর্চনার লাজ', 'আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন।' 'লাজ' কথাটা এসেছে, ছ' লাইন আগের 'সমাজে'র সঙ্গে মিল দেবার জন্য। লাজ-এর মানে এখানে লজ্জা কিংবা খই—যেটাই হোক না, কিন্তু তার সঙ্গে পরবর্তী 'আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন' কী অর্থ বহন করে?

'দুঃসময়' সুধীন্দ্রনাথের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা, এর প্রথম লাইন 'মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়' অনেকের কণ্ঠস্থ। এটি একটি প্রেমের কবিতা—কেননা, আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'য় স্থানলাভ করেছে। (আমার অবশ্য ধারণা, পৃথিবীর সব কবিতাই প্রেমের কবিতা)—যাই হোক, এ কবিতার মধ্যে কোনও বড় কথা নেই, সাধারণভাবে সুন্দর কবিতা। কিন্তু গঠনের এই সব ত্রুটিই কবিতাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তা ছাড়া, যুক্তিবাদ এসে, পরপর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মতন বিন্যাসও কিছুটা সৌন্দর্যহানিকর। গল্পেরই মতন কবিতাটির প্রস্তাবনা ও সুষ্ঠু সমাপ্তি আছে। শেষের কয়েক লাইনে যেন খানিকটা আশাবাদ, যা কবিতাটিকে আর একটু লঘু করে দেয়। অর্থাৎ, কবির সঙ্গে তার নারীর দেখা হল অবেলায়, দুঃসময়ে, এখন দুর্মর অতীত সমস্ত বিশ্বাসের ভিত নষ্ট করে দিয়ে গেছে, এখন মিলন অসম্ভব। অসাধ্য সিদ্ধির যুগ আর ফিরবে না, কবির চোখে অন্ধকার, তবু সেই নারী যেন সাহসিকা হয়ে নরের হাত ধরে, তা হলে হয়তো লজ্জিত নিয়তি

সামনের গতি ফেরাতেও পারে, মৃত্যুর জাল থেকে কবি হয়তো তা হলে অব্যাহতি পেতেও পারেন। এই বোধ শাশ্বত, যে-কোনও প্রেমের কবিতার উপজীব্য, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ করে ফেলেছেন। এ-কথা বলার জন্য দু'বার বিধাতাকে ডেকে আনা—কোনও অতিব্যস্ত মানুষকে অকারণে বিরক্ত করার মতনই অ-রুচিসম্মত। কবিতাটিতে চাপা বিষাদ ও তীব্র আর্তি ফোটানার চেষ্টার বদলে শব্দের ঝংকার ও ছন্দের সৌকুমার্য ফোটাবার দিকেই তাঁর বেশি মনোযোগ, যুক্তাক্ষর-বহুল শব্দগুলি গূঢ় ব্যঞ্জনাময় নয়, কিন্তু উচ্চারণে শ্রবণের আনন্দদায়ক। 'আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়/সান্দ্রস্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে'—এখানে শব্দের গাম্ভীর্য ও ধ্বনিমাধুর্য সত্যিই অননুকরণীয়। সেইরকমই, 'বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে; অদূরে/ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে'—এইরকম ব্যবহারও শ্রবণাভিরাম। কিন্তু এখানে আসল কথাটা কি, ঝড় তার শাঁখ বাজালে, এই তো? এ ছবি পুরনো শুধু নয়, বাগবহুল, কেননা, 'সশব্দ ঝড় উঠেছে' এই কথাটাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে অমোঘভাবে প্রকাশ করাই এখনকার কবিতার লক্ষণ, অতিরিক্ত অলংকারপ্রিয়তা কবির দুর্বলতা।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বলতা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বিচার তো পদে পদে ভুল হতেই পারে। আমার উদ্দেশ্য এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা, তাঁর কবিতায় যে ঝংকারের ছটা ও ছন্দ লালিত্য—তা কি সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল? অপ্রচলিত সাধু শব্দের অধিক ব্যবহার করে তিনি তো সময়ের উলটো দিকেই যেতে চেয়েছিলেন, যখন সব কবিতারই এখন ভাষা প্রায় মুখের ভাষা। কিন্তু উলটোদিকে গিয়েও যদি কেউ অন্য ধরনের সার্থকতা অর্জন করেন সে-কথা আলাদা, কিন্তু তিনি কি সেইরকম সার্থক হয়েছেন?

একবার সুধীন্দ্রনাথের সাহেবপাড়ার বাসস্থানের সান্ধ্য আড্ডায়—শেষ জীবনে তিনি মাঝে মাঝে তরুণ কবিদের ডাকতেন, আমি সবিনয়ে মৃদুস্বরে তাঁকে এই রকম অপ্রচলিত, আভিধানিক শব্দ-প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইয়াংম্যান, আই হ্যাড টু বি ডিফারেন্ট।

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন, রাবীন্দ্রিক প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার থেকে আলাদা হবার জন্যই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই ভাষা রীতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এড়াবার জন্য তিনি পিছু হঠে মাইকেলের রাস্তায় গেলেন কেন, তা আমার বোধগম্য হয়নি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, হালকা মেজাজের, মানবীপ্রেমমূলক গান ধরনের রচনাই ছিল তাঁর মেজাজযোগ্য, কিন্তু শব্দঝংকারের প্রতি বেশি ঝোঁক তাঁকে অসমীচীন ছবি প্রয়োগে বাধ্য করেছে, তাতে তাঁর কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর যেগুলো উৎকৃষ্ট রচনা হিসেবে গণ্য, যে সব লাইন সবারই মনে আছে সেগুলো কিন্তু খুব সরল। যেমন চোখ বুজলে এক্ষুনি মনে পড়ে—

একদা এমনই বাদল শেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে

চেয়েছিল সুখে সহজিয়া অনুরাগে।
একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।—ইত্যাদি

কিংবা,

ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সেদিন
অঘ্রানের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক;

কিংবা,

একবার তুমি তাকালে না তার পানে,
গন্ধে পরাগে নিলে না নিজেরে ভরি,
কর্নিকাসার তাই সে দিনাবসানে
ত্রিসীমানায় আর আসিবে না মধুকরী।—ইত্যাদি

এসব লাইনগুলো পড়লে মনে হয় না, প্রায় বাউল গানের মতন সহজ? কবিতায় জটিলতা কিংবা জীবনানন্দের মতন রহস্য সন্ধান সুধীন্দ্রনাথের একেবারেই স্বভাবধর্ম ছিল না। মনে হয়, তাঁর অহংকারী অবয়বের মধ্যে একটা সাদামাঠা বাউল মন লুকিয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত সেটা পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পায়নি।

প্রেমেনদা

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমি প্রথম সশরীরে দেখি শ্রীরামপুরের এক কবিতা পাঠের আসরে। ঘটনাটি কিছুটা নাটকীয়, তাই মনে আছে। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের কথা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে একটা বেশ বড় আকারের কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, প্রবীণ ও নবীন মিলিয়ে প্রায় তিরিশ-পঁয়তিরিশজন কবির মধ্যে কোনওক্রমে আমিও একটা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম। সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু সভা শুরু হবার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেও তিনি এলেন না। ধরে নেওয়া হল, তিনি আর আসবেন না। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতির তুঙ্গে তো বটেই, তা ছাড়াও তিনি তখন খুব ব্যস্ত মানুষ। তিনি স্বয়ং চলচ্চিত্র পরিচালনা করছেন, অনেক বাংলা ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখেন, এ ছাড়াও তিনি আকাশবাণীর শলাহকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবির সাহেব তাঁর মতো কয়েকজনের জন্যই এই পদ সৃষ্টি করেছেন, এরকম শোনা গিয়েছিল।

যথারীতি সভাপতিকে বাদ দিয়েই সভা শুরু হয়ে গেল, ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন আমার ডাক পড়েছে, মঞ্চে এসে আমি দু'চার লাইন পড়েছি মাত্র, এমন সময় শোনা গেল গেটের কাছে একটা হইচই। উদ্যোক্তাদের অনেকে ছুটে বাইরে চলে গেল। প্রেমেন্দ্র মিত্র এসে গেছেন। কোনও বিশেষ কাজে তিনি আটকা পড়েছিলেন, তারপর কাছাকাছি সময়ের কোনও ট্রেন নেই বলে তিনি কলকাতা থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে এসেছেন। কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ট্যাক্সি? তখনকার দিনে প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল। তাও একটা কবি সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য, যেখানে একটা পয়সাও পাওয়া যায় না!

বাইরে প্রেমেন্দ্র মিত্র এসে গেছেন, এই সময়ে সুনীল গাঙ্গুলীর মতন একজন এলেবেলে ছোকরার কবিতা কে শুনবে? শ্রোতারা অনেকেই বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে, আমি মাইকের সামনে বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। একটু পরে সপারিষদ রাজার মতন মঞ্চে প্রবেশ করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধপধপে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা, গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ শরীর, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। সভাপতির শূন্য আসনে তিনি বসবার পর আবার সভার কাজ শুরু হল। আমাকে বলা হল গোড়া থেকে পড়তে। কিন্তু ততক্ষণে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। প্রত্যেকের দু'টি করে কবিতা পাঠ করার কথা, আমি একটি কবিতাই কোনওক্রমে শেষ করে প্রস্থানোদ্যত হতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। তাঁর পাশের খালি চেয়ারটায় আমাকে প্রায় জোর করেই বসিয়ে বললেন, তোমার কবিতা শুনলুম কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হল না।

আমার নাম শুনে তাঁর মনে একটুও দাগ কাটার কথা নয়। আমার একটাও বই বেরোয়নি, পত্রপত্রিকায় দু'চারটি কবিতা ছাপা হয়েছে মাত্র এবং 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা সম্পাদনা করছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার দু'একটা সংখ্যা দেখেছেন বললেন এবং আমি কী করি, কোথায় থাকি, এইসব জানতে চাইলেন। আমি তখন ছাত্রজীবন শেষ করে কাঠ বেকার, পরিচয় দেবার মতনও কিছু নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি একটু একটু কাঁপছিলাম, তাঁর কাছে আমি অজ্ঞাতকুলশীল, কিন্তু তিনি যে আমার বিষম চেনা। আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রত্যেকটি বই-ই পড়েছি, হ্যাঁ, জোর দিয়েই বলা যায় প্রত্যেকটি বই, আমি অল্প বয়েস থেকেই বইয়ের পোকা, তা ছাড়া, সেই সময়ে লাইব্রেরিতে এক একজন লেখকের নাম ধরে ধরে তাঁদের সব বই পড়ে শেষ করছি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে সব ছোট উপন্যাসের আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি, তাও আমার পড়া। এ সব ছাড়াও তিনি আমার কাছে একটি জীবন্ত চরিত্র, অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগ' নামের উপন্যাসোপম স্মৃতিকাহিনীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রই তো প্রায় নায়ক।

এ সব কথা অবশ্য আমি তাঁকে কিছুই বলিনি। বড় লেখকদের সামনে এলেই দারুণ লাজুকতা পেয়ে বসত আমায়।

এর দু'তিন দিন পরেই একটা খাকি রঙের খামে লম্বা চিঠি এল আমার ঠিকানায়। আকাশবাণীর একটা কবি সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতের লেখা একটা ছোট্ট চিরকুট, সেদিন শ্রীরামপুরে যে কবিতাটি পড়েছিলে, সেটি কোথাও ছাপিয়ে ফেলোনি তো? সেই কবিতাটাই তুমি পাঠ করবে!

সেইকালে টি ভি-র কথা কেউ শোনেইনি বলতে গেলে, রেডিয়োর খুব রমরমা। রেডিয়োতে যুববাণী, বিবিধ ভারতী ইত্যাদিও ছিল না। রেডিয়োতে কেউ একবার অনুষ্ঠানের সুযোগ পেলেই সে হয়ে যেত 'বেতার শিল্পী', অনেকে গর্ব করে সেটা নামের পাশে লিখত। কবি-সাহিত্যিকরা বেতারের অনুষ্ঠান পাবার জন্য নিজেদের রচনার নমুনা সমেত দরখাস্ত পাঠাতেন। এইসব দরখাস্তকারী কবিদের নিয়ে আমরা হাসি ঠাট্টা করতাম কফি হাউসে। বেতার শিল্পী হবার বিশেষ বাসনা ছিল না আমার। কিন্তু এ যে বিশেষ আমন্ত্রণ। সাধারণ রেকর্ডিং নয়, গারস্টিন প্লেসে, পুরনো রেডিয়ো অফিসের ছাদে বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে পুরোপুরি এক প্রকাশ্য কবি সম্মেলন, সেই অনুষ্ঠানই সরাসরি সম্প্রচারিত হল বেতারে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। এবং পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে সেই অনুষ্ঠানের ছবি।

আমার যোগ্যতা কিংবা কবিতার গুণে নয়, সেদিন শ্রীরামপুরে কবিতার আসরে হঠাৎ একটি নতুন ছেলের কবিতা পড়ার মাঝখানে তিনি এসে পড়ায় কিছুটা চক্ষুলজ্জায় পড়েছিলেন এবং সেইজন্যই যে তিনি রেডিয়োর অনুষ্ঠানে আমায় সুযোগ দিয়েছিলেন, তাতে আমার কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এরকম চক্ষুলজ্জা এবং ঔদার্যই বা ক'জন বড় লেখকের থাকে?

সে আমলে এত ব্যস্ত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে তরুণ লেখকদের সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, সে প্রমাণ পেয়েছি বারবার। ভাগলপুরের এক অতি তরুণ গল্প-লেখক দিব্যেন্দু পালিতের লেখার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন বারবার,

মনে আছে। নিজের লেখার ব্যাপারে তাঁর যে কী দারুণ আলস্য ছিল তা ভুক্তভোগী সম্পাদকমাত্রই জানেন, কিন্তু অন্যের লেখা পাঠ করার ব্যাপারে তাঁর কোনও আলস্য ছিল না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেয়েও বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল অনেক বেশি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুকে আমি কোনওদিন বুদ্ধদেবদা বলিনি, তাঁর বাড়িতে সে রকম রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র কী করে যেন হয়ে গেলেন প্রেমেনদা। তিনি সকলেরই প্রেমেনদা! বুদ্ধদেব বসু তাস খেলা দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল তাস খেলার নেশা। তাঁর সঙ্গে দু'একটা তাসের আসরে যোগ দেবারও সুযোগ পেয়েছি আমি। তাসের আসর বসত সাগরময় ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, কানাইলাল সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এক বন্ধু শচীন করমশাইয়ের বাড়িতে, যিনি 'দেশ' পত্রিকায় 'ট্রামে-বাসে' নামে একটি ফিচার লিখেছেন দীর্ঘদিন। অধিকাংশ কবি সম্মেলনের মতন, এই তাসের আসরেও আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম সদস্য। তবে কবিতা রচনার তুলনায় ব্রিজ খেলাটা আমি ভালই জানতাম। প্রেমেনদা কালবার্টসনের চেয়েও অভিনব নানারকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বটে কিন্তু খেলার সময় তাঁর বিশেষ ধৈর্যের প্রমাণ পাওয়া যেত না।

ষাটের দশকে আমি মার্কিন দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেয়ে যাই দৈবাৎ। তখনই খবর শুনলাম যে প্রেমেন্দ্র মিত্রও সরকারি সফরে সে দেশে যাচ্ছেন কয়েক সপ্তাহের জন্য। সেই প্রথম আমার বিদেশ যাত্রা, থাকতে হবে অনেক দিন, মার্কিন দেশে আমার চেনাশুনো একজনও ছিল না, সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সেখানে দেখা হতে পারে এই সম্ভাবনায় আমি বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। যাত্রার আগে এক দুপুরে ঠিকানা খুঁজে আমি প্রেমেনদার বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁকে বললাম, ওদেশের সরকার আপনাকে আর যেখানেই নিয়ে যাক, আপনাকে একবার আয়ওয়া শহরে আসতেই হবে। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি বেশি ঘোরাঘুরি পছন্দ করি না। আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকব বেশ কয়েকটা দিন। ওখানে কী রকম ঠাণ্ডা বলো তো? তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াবে তো?

আয়ওয়ায় পৌঁছে আমি প্রেমেনদার প্রতীক্ষায় ছিলাম দিনের পর দিন। তিনি এলেন না। পরে চিঠি লিখে জেনেছি, আমেরিকায় পা দেবার কয়েক দিন পরেই তিনি নাকি ঠাণ্ডার ভয়ে দেশে ফিরে গেছেন। ঠাণ্ডা তাঁর একেবারে সহ্য হয় না। যিনি ঘনাদার স্রষ্টা, বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী লিখে যিনি তাঁর নায়কদের কখনও মঙ্গল গ্রহে, কখনও সমুদ্রের নীচে পাঠিয়েছেন, সেই তিনিই ঠাণ্ডার ভয়ে দেশ ভ্রমণ বাতিল করে দেন, এটা জেনে বেশ মজা পেয়েছিলাম।

আমার বাড়িতে তাঁর আসার ব্যাপারে কিছু একটা গেরো লেগে গিয়েছিল মনে হয়।

আমেরিকা থেকে ফিরে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম দমদম-বাগুইআটি অঞ্চলে। যদিও ভাড়া বাড়ির ফ্ল্যাট, কিন্তু সেই বাড়িটার সামনে পাশে অনেকখানি মাঠ ও বাগান

এবং একটি পুকুর ছিল। সেই বাড়ির বর্ণনা শুনে প্রেমেনদা খুব আগ্রহী হয়ে বললেন, পুকুর আছে? তা হলে আমি একদিন নিশ্চয়ই যাব। কীভাবে যেতে হয়, কত নম্বর বাস, সে সব জানতে চাইলেন। তিনি ভূগোল সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, নিয়মিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা পড়তেন। ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে তাঁর স্থান বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ, তিনি দমদমের ভূগোলও বুঝে নিতে চাইলেন। তখন ভি আই পি রোড সদ্য তৈরি হচ্ছে, সে সম্পর্কেও কৌতূহল ছিল। কিন্তু ছ'-সাত বছরে তিনি বেশ কয়েকবার যাব যাব করেও যেতে পারেননি।

সাহিত্য জগতে তাঁর যত প্রচণ্ড খ্যাতি, সেই তুলনায় সেই ষাটের দশকে তিনি লিখছেন বেশ কম। উপন্যাস তিনি কোনওদিন তেমন মন দিয়ে লেখেননি, সম্ভবত বেশি বড় লেখার ধৈর্য তাঁর ছিল না। কিন্তু এক সময় অনেকগুলি অসাধারণ ছোটগল্প লিখলেও, তখন লিখছেন বছরে একটি-দুটি মাত্র, কবিতাও কদাচিৎ। সম্পাদকরা তাঁর লেখা পাবার জন্য ব্যাকুল, তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। পত্রপত্রিকায় তিনি বহু আলোচিত লেখক, অথচ নিজে লিখতে চান না। এরই মধ্যে হঠাৎ এক বছর দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর চমৎকার উপন্যাস 'প্রতিধ্বনি ফেরে'। যতদূর মনে হয়, সেটাই তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

অবশ্য ছোটদের রচনার জন্য তাঁর মমত্ব ছিল বেশি। দেব সাহিত্য কুটিরের পূজা বার্ষিকীতে প্রত্যেকবার তাঁর ঘনাদা-কাহিনী বিশেষ আকর্ষণীয়। ছোটদের জন্য তাঁর প্রত্যেকটি লেখা বড় বয়েসেও পড়তে ইচ্ছে করে।

বেশ কয়েকবার বাড়ি বদল করার পর আমি দক্ষিণ কলকাতার একটা লম্বা বাড়ির দশতলায় উঠে এলাম। এন এফ ডি সি-র স্ক্রিপ্ট কমিটির একটা মিটিং-এ দেখা হবার পর আমি কৌতুকচ্ছলে বললাম, জানেন প্রেমেনদা, আমার ফ্ল্যাটের পেছনের বারান্দা দিয়ে সুন্দরবন পর্যন্ত দেখা যায়। প্রায় বিশ্বাস করে বললেন, তা হলে তো একদিন তোমার বাড়ি যেতে হয়! দশতলায় থাকো? মাথা ঘোরে না? সত্যি একদিন গিয়ে দেখতে হয়! আমাদের কালে তো এত বড় বড় ছিল না। কোনও দিন দশতলায় উঠিনি। আমি বললাম, আপনি আমেরিকায় আমার বাড়িতে যাননি, দমদমে যাননি, আর বালিগঞ্জে এত কাছে, এ কি আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে? তিনি জোর দিয়ে বললেন, এবার যাবই। পরবর্তী সপ্তাহের একটা তারিখও ঠিক হল, আমি তাঁকে নিয়ে আসব। এরই মধ্যে একদিন টেলিফোন করে তিনি জানালেন যে, তাঁর চোখে খুব অসুখ হয়েছে, ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, এখন বাড়ি থেকে বেরুন অসুবিধে।

চোখের অসুখে তিনি ভুগলেন দীর্ঘকাল। শুনেছি, অপারেশনের ব্যাপারে তাঁর খুব ভয় ছিল, একবার নাকি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েও চলে এসেছিলেন হাসপাতাল থেকে। দৃষ্টিক্ষীণতা তিনি মেনে নিলেন।

এই চোখের অসুখের পর তাঁর অন্য একটা পরিচয় প্রধান হয়ে উঠল। নিজের লেখার ব্যাপারে যিনি ছিলেন কৃপণ কিংবা অলস, তাঁর মধ্যে জেগে উঠল এক অদম্য পাঠতৃষ্ণা। পড়ার নেশা তাঁর আগেই ছিল নিশ্চিত কিন্তু চোখ খারাপ হবার পর কে আর বেশি পড়তে চায়। সাধারণত প্রবীণ লেখকরা পরবর্তী প্রজন্মের রচনা বিশেষ

পড়েন না, কিন্তু প্রেমেনদা সবসময়ই সাম্প্রতিক সাহিত্যের খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। প্রথম প্রথম তিনি পড়তেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে। তারপর চোখের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় মাইনে করে একজনকে রেখেছিলেন, যিনি তাঁকে বই, পত্রপত্রিকা পড়ে শোনাতেন।

চোখের অসুখটা মেনে নেবার পর তিনি বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে থাকতেও চাইলেন না। এর পর থেকে তাঁকে দেখা যেতে লাগল নানান সভাসমিতিতে। আমাদেরও তো বয়েসটা থেমে নেই, জুলপিতে পাক ধরেছে, এখন আমাদেরও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে মঞ্চের ওপর বসতে হয়। প্রেমেনদার পাশে বসলে তিনি ভুরু কুঁচকে দেখবার চেষ্টা করেন, প্রথমটা চিনতে পারেন না। নিজের নামটা বললেই তিনি অবধারিতভাবে বলবেনই, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার অমুক লেখাটা পড়লুম। আর ছোটদের পত্রিকায় তোমার ধারাবাহিকটা পড়ছি প্রত্যেক সংখ্যা।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রেমেনদা, আপনার চোখের এই অবস্থা, তবু এত পড়েন কেন?

তিনি বললেন, না পড়ে যে পারি না! পৃথিবীটাকে এখন আর ভাল করে দেখতে পাই না, এইসব লেখাপত্তরের মধ্যে দিয়েই পৃথিবীকে দেখি, বুঝলে।

এবং এই রকম সময়েই তাঁর আবার লেখার ইচ্ছে জেগেছিল। শুনেছি, প্রায় আন্দাজে কলম ধরে ধরে, অনেক কষ্ট করে লিখতেন। কিছু কিছু ডিকটেশান দিয়েও লিখিয়েছেন। এইভাবে, সম্প্রতিকালে তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা বেরিয়েছে।

এই তো মাত্র কিছুদিন আগে, বইমেলার এর সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা। সেদিন তিনি আমায় খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। দুটি বইয়ের প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে সেই সভা, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার এসেছিলেন একটি ছোটদের গল্প সংকলনের প্রকাশ উপলক্ষে, আর আমি ওঁদের পাশে ছিলাম দুই বাংলার একটি কবিতা সংকলনের সম্পাদক হিসেবে। সভার কাজ চলছে, এর মধ্যে প্রেমেনদা আমায় বললেন, সুনীল, তোমার এই সংকলনটায় তুমি আমার কবিতা নাওনি শুনলুম? তুমি আমায় বাদ দিয়েছ?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, প্রেমেনদা, আপনি বইটা বোধহয় ভাল করে দেখেননি। এটা শুরুই হয়েছে অরুণ মিত্রকে দিয়ে, আপনাদের জেনারেশনের পর থেকে। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, এঁদেরও তো কবিতা নেই।

তিনি অসহিষ্ণুভাবে বললেন, আহা, ওরা তো কেউ নেই এখন আর। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি! আমি তো এখনও বেঁচে আছি!

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। যদিও সংকলনটির সময়সীমা বাঁধা ছিল, প্রবীণদের চেয়ে তরুণদের লেখার প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, তবু সেই মুহূর্তে প্রেমেনদাকে আর কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। সত্যিই তো তিনি বেঁচে আছেন, তাঁর কবিতার কত লাইন আমার মুখস্থ, এই সংকলনের শিরোমণি করা উচিত ছিল তাঁকেই।

প্রেমেনদা অবশ্য প্রসঙ্গ বদলে সহাস্যে বললেন, তোমার সেই দশতলা বাড়িতে

যাব যাব করে আর যাওয়া হচ্ছে না। এবার একদিন যাব, বুঝলে। এখন অনেকটা ভাল আছি। তবে চোখের যা অবস্থা, বারান্দা দিয়ে সুন্দরবন তো আর দেখতে পাব না, কিন্তু টাটকা বাতাস তো খাওয়া যাবে।

কয়েকদিন বাদেই তাঁর অন্যতম চিকিৎসক ডঃ জয়ন্ত সেনের কাছ থেকে জানতে পারলুম যে এক বিষম কালব্যাধি তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে। আর আমার বাড়িতে তিনি পায়ের ধুলো দিতে আসতে পারবেন না।

সৈয়দ-দা

অত্যন্ত রোগা, সিড়িঙ্গে, গায়ের রং ছাতার কাপড়কেও লজ্জা দেয়, এবং তোতলা, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে থুতু ছোটে—এইরকমভাবে সৈয়দ মুজতবা আলী একটি লেখায় নিজের বর্ণনা দিয়েছিলেন। আসলে আমরা সবাই জানি, বাঙালি লেখকদের মধ্যে এরকম রূপবান ও গুণবান পুরুষ অঙ্গুলিমেয়। শুধু লেখাতেই নয়, বৈঠকী আড্ডাতেও তিনি মন্ত্রমুগ্ধ রাখতে পারতেন শ্রোতাদের।

বহুকাল আগেকার, হয়তো আমার জন্মেরও আগের, প্রবাসী পত্রিকার একটি বাঁধানো ফাইল কিছুদিন আগে আমার হাতে এসেছিল, পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটি খবর চোখে পড়ে। 'বাঙালি যুবকের কৃতিত্ব' বা এই ধরনেরই কিছু শিরোনাম ছিল খবরটির, আফগানিস্তানের সরকারের আমন্ত্রণে সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সেদেশে শিক্ষকতা করতে যাচ্ছেন। খবরটির সঙ্গে তৎকালীন ফ্যাশান অনুযায়ী ডিম্বাকার ছবি। রূপবান, তেজস্বী এক যুবা মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সুসজ্জিত, গলায় বো। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবার মতন। পরে যখন আলী সাহেবকে আমি স্বচক্ষে দেখি, প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধানেও সেই চেহারার আভাস কিছুটা খুঁজে পাওয়া যেত।

আমার মতন সদ্য-আগত সামান্য লেখকের পক্ষে ওঁর মতন প্রখ্যাত লেখকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাওয়া হয়তো সহজ ছিল না, কিন্তু আলী সাহেব ছিলেন সকল বয়েসেরই লেখকের বন্ধু। অবিলম্বেই উনি আমাকে সৈয়দ-দা বলে ডাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি ওঁর লেখার এমনই ভক্ত ছিলাম যে, মুখ ফুটে ওঁর সামনে কথা বলতেই সংকোচ বোধ করেছি।

লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর চেয়েও মানুষ সৈয়দ মুজতবা আলী কম বিস্ময়কর ছিলেন না। যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই পরে সে সম্পর্কে লিখবেন। অত্যন্ত চঞ্চল এই মানুষটিকে কিছুতেই সাধারণ সংসারী-মানুষদের মাপে আঁটানো যায় না। প্রতিভা জিনিসটা খুব সুখের নয়, বরং এর বিষম জ্বালা আছে—এই জ্বালাতে ইনি সারাজীবন ছটফট করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এঁর সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী প্রকাশিত হলে মনে হবে, ইনি একটা জীবনেই অনেকগুলো জীবন কাটিয়ে গেলেন। কখনও ইনি শান্তিনিকেতনে, কখনও কলকাতায় সংস্কৃত শিখছেন, আবার মিশরে আরবী ফার্সী ঝালিয়ে নিতে, রমন মহর্ষির আশ্রমেও ইনি, আবার কাবুলে বাছাও সাকোর আক্রমণের সময় যিনি উপস্থিত, তিনিই আবার জার্মানিতে দেখছেন হিটলারের অভ্যুত্থান।

জ্ঞানতৃষ্ণার ব্যাপারেও এঁর মতন ছটফটে মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। কোন্ বিষয়ে

আগ্রহ ছিল না? যিনি ডক্টরেট করেছেন খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিষয়ে, তিনিই বাঙালি ও সাহেবি ধরনের রন্ধন প্রণালী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলতে গেলে। আধুনিক সমর প্রণালী সম্পর্কে যে-রকম, ক্যানসার রোগ সম্পর্কেও ততখানিই আগ্রহ। ভাষাতত্ত্বের অন্তর্নিহিত মজা যিনি খুঁজেছেন সারাজীবন, তিনিই লিখেছেন মধুর প্রেমের কাহিনী। তাঁর নিজের নামের রচনাগুলি ছাড়াও সত্যপীর, রায় পিথৌরা এই সব ছদ্মনামে অজস্র রচনা ছড়িয়ে আছে হাজারটা বিষয়ে। মাত্র কয়েক মাস আগেও ঢাকা থেকে একটি চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছেন গাঙ্গুলি বা গঙ্গোপাধ্যায় পদবির দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁর নিজস্ব মূল বিষয় অবশ্য ছিল তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, যে সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়নে আলস্য ছিল না কখনও—একমাত্র সেই বিষয়েই তিনি খুব বেশি কিছু লিখে যেতে পারেননি। প্রায়ই অন্তরঙ্গদের বলতেন, এ সম্পর্কে তিনি লিখবেন একটি সুদীর্ঘ গ্রন্থ, তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আর সময় পেলেন না।

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, সৈয়দ-দা সম্পর্কেও হয়তো সে কথা আংশিকভাবে খাটে। তাঁরও প্রতিভা যত ধনী ছিল, ততটা গৃহিণীপনা ছিল না। নাই বা থাকল। এ জগতে সবাই সংসারী হয় না। এই দুর্দান্ত দুরন্ত মানুষটির পক্ষে সুস্থিরভাবে বসা সম্ভব হয়নি, যদি সম্ভব হত, তা হলে তাঁর কাছ থেকে হয়তো আমরা আরও অনেক বেশি কিছু পেতাম। যা পেয়েছি, তাও কম নয়, অমূল্য বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় তিনি যে স্টাইলের প্রবর্তন করেছেন, তা চিরস্থায়ী হবার জন্য এসেছে। এই গদ্য রীতি সৈয়দ মুজতবা আলীতেই শেষ হয়ে যাবে না—পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যেও যে আর একটি ধারা প্রবর্তিত হল, তার চিহ্ন স্পষ্ট। প্রথম যখন বাঙালি লেখকরা সাধু বাংলা ছেড়ে চলিত বাংলা ধরলেন, তখন অনেকেই ভয় পেয়েছিলেন যে ভাষার গাম্ভীর্য বুঝি চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল। তা যায়নি। তেমনি, সৈয়দ মুজতবা আলী এগিয়ে এলেন আর একধাপ, তিনি দেখালেন যে, নিছক মুখের ভাষা কিংবা গল্প-আড্ডার ভাষাতেও উচ্চাঙ্গের রস সৃষ্টি করা যায়, রুচি উন্নত রেখেও ভাষা কত সরস হতে পারে। অনেকের ধারণা, আলী সাহেবের ভাষাতে শুধু বুঝি হাস্যরস প্রকাশ করাই সম্ভব। বস্তুত করুণ রস ফোটাতে তিনি ছিলেন আরও বেশি দক্ষ। শবনম উপন্যাসের কোনও অংশ কিংবা পঞ্চতন্ত্রের সেই যে মেয়েটি, প্রেমিক তাকে বঞ্চনা করার পর যার মুখের চেহারা আলোহীন চিনে লণ্ঠনের মতন—এই রকম অনেক অংশ পড়তে-পড়তে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

আমরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে অনেকেই ইংরিজি-ফরাসি শব্দ প্রয়োগ করি, কিন্তু অচেনা আরবি-ফার্সি শব্দ সম্পর্কে কীরকম যেন একটা শুচিবাই-এর ভাব। সৈয়দ মুজতবা আলী সমস্ত সংস্কারের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন। যে-কোনও ভাষা থেকে যে-কোনও শব্দ নিয়ে এসেছেন প্রয়োজন মতন, হোক না আরবি কিংবা নিছক বাংলার গ্রাম্য মেয়েলি শব্দ, আমাদের কোনও এক সময়েও মনে হয়নি, ঠিক হল না। তিনি লিখতে জানতেন, তাই যা খুশি লিখেছেন। একটা জিনিস খুবই লক্ষ করার মতন, তাঁর কোনও একটি রচনাতেও হতাশা কিংবা আত্মগ্লানির সামান্য চিহ্নও নেই।

ক'জন লেখক এরকম পারেন? সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা খুব রসিক বলে পরিচিত, তাঁরা কদাচিৎ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে সাহস পান। আলী সাহেবের অধিকাংশ রসিকতাই নিজেকে ন্যূন করে।

সৈয়দ-দা নিজের জীবন কাহিনী লিখতে চাননি কখনও। ওঁর বাল্যকাল সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জেনেছিলাম ওঁর দুই দাদার লেখা দুটি আত্মকাহিনী পড়ে। বই দুটি সৈয়দ-দা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই বই দু'খানি অত্যুত্তম তো বটেই, তা ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক পাতার পাশে পাশে ওঁর বিখ্যাত সেই সবুজ কালিতে লেখা নিজের হাতের অজস্র নোট, আমাকে বহু সরস তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। ওঁর কাছে আমি কখনও কখনও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। একবার শ্রীহট্টের কবি হাসানরাজা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হয়, ওঁর কাছে জানতে চাই, উনি তারপর 'দেশ' পত্রিকায় কয়েক সংখ্যা ধরে হাসানরাজা সম্পর্কে লিখেছিলেন। সেইরকমই, আমি ওঁকে আর একটি বিষয় নিয়েও লিখতে বলেছি অনেকবার, উনি কিন্তু সেটা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকবার। আমি চেয়েছিলাম ওঁর আত্মজীবনী। উনি বলেছিলেন, আমার মতন গবেটের আত্মজীবনী পড়বে কোন গবেট?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাজশেখর বসুর ধারায় এই আর একজন লেখক, বৈদগ্ধ্য ও সরসতাকে মেশাবার দুর্লভ গুণের অধিকারী অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। জীবিতকালে এঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার বা আকাদেমি পুরস্কার দেবার কথা কারুর মনে পড়েনি, সেজন্য কর্তাব্যক্তিরা আজ নিশ্চয়ই অনুশোচনা করে পাপস্খালনের চেষ্টা করবেন। আমরা সে ব্যাপারে চিন্তিত নই। বাংলা সাহিত্যে ও আমাদের জীবনে তিনি একটা হুল্লোড় তুলে চলে গেলেন, আমরা এখনও অভিভূত হয়ে আছি।

সবার যিনি এক বয়েসি

শিবরাম চক্রবর্তী আসলে ক'জন? আগামী শতাব্দীতে হয়তো এমন গবেষণা হবে যে, শিবরাম চক্রবর্তী নামে চার পাঁচজন মানুষ লিখতেন। শিশু সাহিত্যে অনাবিল রসের ভাণ্ডারি হিসেবে আমরা পেয়েছি গত পঞ্চাশ বছর ধরে, সেই একই মানুষ কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতেন? রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই অতি-উগ্র আধুনিক কবিতার দুটি বই, নাম 'চুম্বন' আর 'মানুষ' যিনি লিখেছিলেন তিনি কি এই একই হাস্যরসিক শিব্রাম চকরবরতী? বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে 'একদিন যারা কথা বলবে' এই নাটক লিখেছিলেন কে? শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের যিনি নাটরূপ দিলেন, শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনা ও অভিনয়ে যা বাংলা মঞ্চে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল, সেই 'ষোড়শী'র নাট্যকারও ইনি?

ওই সব পরিচয়গুলি অনেকদিনই আবছা হয়ে গেছে, নিজের জীবন ও কলম নিয়ে তিনি শিশু-কিশোরদের জগৎটাই আপন করে নিলেন জীবনের পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে। শিশু সাহিত্যের সম্রাট কিংবা সেনাপতি আখ্যা দেওয়া যায় না তাঁকে, সূর্য কিংবা চন্দ্রের সঙ্গেও তুলনা দেওয়া যায় না, তাঁর সব লেখা মিলিয়ে যেন একটা বিশাল উদ্যান, যার মধ্যে সব বয়েসি পাঠকেরা মনের সুখে বিচরণ করতে পারে। এই উদ্যানটিকে খেয়াল-খুশি মতন সাজিয়েছেন শিবরাম, বৃহৎ-মহৎ কোনও সৃষ্টির দাবি নেই, খ্যাতির লোভ নেই, তাঁর জীবনেও কোনও কিছুই যেন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপন মনে মশগুল হয়ে এই জীবনটা যতদিন চলে চলুক, কিংবা যদি না চলে তো চলল না, এই রকম মনের ভাব। এমন সরলতম সুন্দর দর্শন নিয়ে একটা গোটা জীবন তো সত্যিই কাটিয়েও গেলেন তিনি। সারা জীবন তিনি যেন সবার সঙ্গে এক বয়েসি থেকে গেলেন।

খ্যাতির প্রতি এমন নির্মোহ লেখক আধুনিক কালে আর দেখা গেছে কিনা জানি না। কফি হাউসে একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে একদিন ঘিরে ধরে বলল, আমরা আপনার খুব ভক্ত। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা বুঝি ভেবেছ, আমি হেমেন্দ্রকুমার রায়? বাপরে বাপ, কতবড় লেখক তিনি। আমাদেরও এরকম অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বয়েসি যারা শিবরামের রচনার সাহচর্যে ছেলেবেলা থেকে বেড়ে উঠেছি, পরে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়েরও সুযোগ হয়েছে, সেই আমরাই কখনও যদি বলতে গেছি যে, আপনার অমুক লেখাটা এত ভাল...সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন, অমুকের লেখা পড়েছ? কী দারুণ লেখে? আর প্রেমেন, ওঃ, ওরকম কেউ লিখতে পারে না! আর মানিক, কী কলমের জোর।

কল্লোল যুগের লেখকদের তুলনায় শিবরাম অনেক বর্ষীয়ান, কিন্তু নিজের

বয়েসিদের চেয়েও কল্লোলের লেখকদের সঙ্গেই তাঁর বেশি সখ্য ছিল। বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নতুন যুগ আনছেন, তখন শিবরামও যে ইচ্ছে করলে ওই রকম কিছু করতে পারতেন, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন অন্তত একটি গল্পে, 'দেবতার জন্ম'। রাস্তার নুড়ি কী করে একদিন দেব-শিলা হয়ে যায়, তাকে ঘিরে মন্দির গড়ে ওঠে, শত শত লোক এসে সেখানে ধরনা দেয়, একটি ছোটগল্পের পরিসরে সেই অন্ধতা ও সংস্কারের কথা ফুটিয়ে তোলার জন্য শক্তির দরকার। অথচ শিবরামের সে লেখায় বিদ্রূপ নেই, ক্ষোভ নেই, জ্বালা নেই। সেরকম গল্প আর বেশি লিখলেন না শিবরাম, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ওই তো মানিক লিখছে, তারাশঙ্কর, বিভূতিবাবু লিখছেন, বাপ্‌রে বাপ, কী ভাল লেখা, আমি কি ওসব পারি? রুদ্র নয়, আপনভোলা মহাদেবকেই যাঁর পছন্দ, কীর্তি স্থাপনের কোনও বাসনাই তাঁর না থাকাই সম্ভব।

ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, জীবিতকালেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। বাকি সব লেখক একদিকে, শিবরাম চক্রবর্তী অন্যদিকে। সুদূর ইংল্যান্ড-আমেরিকায় দুই বাঙালি যুবক কথোপকথনের মধ্যে একজন কোনও রসিকতা করে ফেললে অন্যজন বলে ওঠে, এই, শিবরাম চক্রবর্তীর মতন হয়ে গেল না? তাঁর লেখা যে ব্যক্তি কোনওদিন পড়েনি, সেও তাঁর কোনও না কোনও গল্প জানে। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি, চটির সঙ্গে চটাচটি, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, এই রকম কতকগুলো কথা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তিনি, সেই অনুযায়ী কেউ যদি মিলিয়ে মিলিয়ে এই রকম কিছু কথা বানায়, অমনি সে নিজেই স্বীকার করে শিবরামের মতন।

শিবরাম চক্রবর্তীর জীবন তাঁর রচনার মতনই বিচিত্র ও অসাধারণ। প্রায় অর্ধশতক তিনি কাটিয়ে গেলেন একা একা মেস বাড়ির একটা ছোট্ট ঘরে। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের মেসে তক্তারামে শোয়া আর শুক্তারাম ভক্ষণ, তাতেই আত্মারামের সুখ। সে ঘরের চার দেয়ালে লেখা অসংখ্য মানুষের ঠিকানা। একদিন কেউ না কেউ তাঁর পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনী লিখবেন নিশ্চয়ই, তাতে ভবিষ্যৎকালের পাঠকরা জানতে পারবেন, এমন সরল অন্তঃকরণের মহৎ মানুষও হয় এ যুগে। 'দেশ' পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে আত্মজীবনী লিখলেন তিনি, তাতে নিজের কথা প্রায় কিছুই নেই, সবই অন্যান্যদের কথা। শোনা যায়, কোনও এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম, তাই যদি হয় তা হলে সেই মানুষের জীবনের একটি ঘটনা আমি বর্ণনা করতে চাই। একদিন তরুণ ঔপন্যাসিক সুব্রত সেনগুপ্ত এই পত্রিকার দপ্তরে এসে খুব উৎকণ্ঠিত ও চিন্তিত ভাবে বললেন, একটু আগে শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখলুম, ফুটপাথে শুয়ে আছেন, বোধহয় খুবই অসুস্থ, তারপর আস্তে আস্তে এখানেই এলেন...। আমি খোঁজাখুঁজি করে দেখলুম, তিনি চারতলায় ক্যাশিয়ারবাবুর কাছে একটা টুলে বসে আছেন। আমি প্রথমে সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলুম, শিবরামদা, আপনি কেমন আছেন? উনি বললেন, এই তো, খুব ভাল আছি, এই মহীর পাশে বসলে শীত করে না। চারদিকে টাকার গরম তো। এরপর জিজ্ঞেস করলুম, আপনি নাকি ফুটপাথে শুয়ে পড়েছিলেন? উনি অবাক হয়ে

বললেন, হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? যেন বিকেলবেলা ফুটপাথে শুয়ে পড়া একজন বিখ্যাত লেখকের পক্ষে অতি সাধারণ ঘটনা। ফের জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ রাস্তায় শুতে গেলেন কেন। উনি বললেন, বুঝলে চাঙোয়ার সামনে ইচ্ছে হলো রাস্তায় একটু বসি, বেশ ভাল গন্ধ তো। তারপর বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়লুম, বেশ ভাল লাগে, শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা যায়, আগে কোনওদিন দেখিনি...তারপর একটি ছেলে বুঝলে, লেখে-টেখে বোধহয়, আমার হাত ধরে তুলল, তারপর আমার হাত ধরে ধরে আসতে লাগল...বুঝলে, ছেলেটির বোধহয় স্বাস্থ্য খারাপ, নিজে হাঁটতে পারছিল না, তাই আমাকে ধরে ধরে...।

এই শিবরাম। সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবি পরা সদা হাস্যময়, নিঃশত্রু এই মানুষটিকে আর দেখা যাবে না। এক একজন মানুষ চলে যাবার পর উপলব্ধি করা যায়, তাঁদের বিচ্ছেদ কত অসহনীয়।

বাংলা ছোটগল্পের তিন দিকপাল

সব সাহিত্যেই কিছু কিছু লেখক থাকেন, যাঁদের আবির্ভাব হয় আকস্মিকভাবে, পরেও যাঁরা থেকে যান মূল ধারার বাইরে। আক্ষরিক অর্থেই যাঁদের বলা যায় আউটস্ট্যান্ডিং। সব লেখকেরই প্রথম জীবনে একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকে, সেই পর্বটি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকে, জানতে ইচ্ছে করে, অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রেই জানা যায়। সকলেই লেখে না, কেউ কেউ লেখে। এক পরিবারের অনেক সদস্যের মধ্যে অন্য কেউ লেখা-টেখার তোয়াক্কা করে না, শুধু একজন কেন গোপনে অনেক সাদা পৃষ্ঠা অক্ষরে ভরিয়ে দেয়, সে রহস্যের আজও কোনও সমাধান হয়নি। ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগ নেই, খ্যাতি কিংবা অর্থপ্রাপ্তির সুদূর সম্ভাবনা নেই, তবু কেউ কেউ লেখে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত কোনও আসামিও লিখেছে, অমর সাহিত্য রচনা করে গেছে।

সাহিত্য সৃষ্টির স্ফুরণ হয় কৈশোরেই। যৌবনে আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তি থাকে আকাশের মতো সীমাহীন। কলম হাতে নিয়ে যে একবার শব্দকে নিজস্বভাবে ব্যবহার করার অভিনব স্বাদ পেয়েছে, সে সেই শব্দ সম্বল করেই তার কাছাকাছি এক টুকরো পৃথিবীর ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজের মনোজগতের নির্যাস অপরকে জানাবার জন্য যে ব্যাকুলতা তা থেকেই রচিত হয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস। যাঁরা শেষ পর্যন্ত সার্থক সাহিত্যিক হন, তাঁরা সাধারণত অনেক কিছু পেয়ে যান, পাঠকদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা, খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। তাঁদের বলা হয় সফল লেখক। কিন্তু কোনও সার্থক লেখকেরই রচনা শুরু করার সময় এই সাফল্যের প্রতি লোভ থাকে না, হয়তো স্বপ্ন থাকতে পারে, কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি, স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ কিংবা আত্ম-নিপীড়নের নেশাই তখন বেশি থাকে। যৌবনেই এসব মানায়। যৌবনেই বোঝা যায়, শুধু কলম হাতে নিয়ে কে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে এগোবে, অনেকেই কিছুদিন পর ফিরে যায়।

বিশ্বের প্রায় সব সাহিত্যিকই যৌবন বয়েসেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। যার যৌবন কেটে যায় ভিন্ন মনস্কতায়, পরে সে আর সাহিত্যের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হতে পারে না। তবে, যৌবন পার করেও সাহিত্যের অঙ্গনে সক্ষম পদক্ষেপে আগমন খুব বিরল হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। এই বিরল আগমন অবশ্যই বিস্ময়কর।

সাহিত্যজগতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পান, তাঁরা আসেন সাধারণত কোনও পত্রিকাকে অবলম্বন করে কিংবা কোনও লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কিংবা পারিবারিকভাবে বা সামাজিক সূত্রে তাঁদের জীবনে অন্য কোনও লেখকের প্রভাব থাকে, সাহিত্যের একটা পরিমণ্ডলের কাছাকাছি এসে তাঁরা কোনও না কোনওভাবে প্রেরণা পান।

বঙ্কিমচন্দ্র কলেজজীবনের শুরুতেই মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন, তারপর নিজেই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়েস থেকেই তাঁদের নিজস্ব পারিবারিক একাধিক পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উদয় অনেকটা ধূমকেতুর মতন বলে মনে হলেও তিনি কৈশোর-প্রথম যৌবনে হাতে-লেখা পত্রিকায় লিখে হাত পাকিয়েছেন। তা ছাড়া, তাঁর মাতুল পরিবারের অনেকেই ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা লেখক।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তিনজন বিশেষ প্রতিভাবান লেখক এসেছেন এই প্রথার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদার। এঁদের শিল্পপ্রক্রিয়া এখনও আমাদের কাছে রহস্যময় মনে হয়। এঁরা সমসাময়িক নন, বরং বলা যায় পর্যায়ক্রমিক, যেন একজনের হাতের মশাল নিয়ে অন্যজন এগিয়েছেন, কিন্তু পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা, মনে হয় মনোজগতের তিনটি পৃথক প্রদেশের বাসিন্দা, কারুর সঙ্গে কারুর রচনারীতি কিংবা জীবনদর্শনের মিল নেই বিন্দুমাত্র।

কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ খুঁজে বার করা যায় অবশ্য। এই তিনজনই সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছেন প্রৌঢ় বয়েসে, এঁরা সাহিত্যের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হলেন তা আজও প্রায় অজ্ঞাত। জগদীশ গুপ্ত কলেজ-বয়েসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন অর্থাভাবে। কিন্তু ইওরোপীয় সাহিত্য কিংবা সংস্কৃত সাহিত্য যে তাঁর বেশ পড়া ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কমলকুমার মজুমদারও কোনওরকম ডিগ্রি পাওয়ার জন্য পড়াশুনো করেননি, যদিও অর্থাভাব তার কারণ নয় এবং তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অগাধ। কলকাতার প্রাচীন পরিবারগুলির ধারা অনুযায়ী তিনি স্বশিক্ষিত এবং ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। সতীনাথ ভাদুড়ী আবার প্রথাগতভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন অর্থনীতি এবং আইন, কিন্তু এই বিদ্যার প্রয়োগ করেননি তেমনভাবে। আইন পাস করেও তিনি শামলা এঁটে বেশিদিন যাতায়াত করেননি আদালতে, তার বদলে প্রথমে জীবনে রাজনীতি, পরে উদ্যান-সৌন্দর্যচর্চায় মগ্ন থেকেছেন। ইনিও ফরাসি ভাষার চর্চা করেছেন নিজে নিজে এক মফস্বল শহরে বসে। হিন্দি-উর্দুতে দখল তো ছিলই, রুশ ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলেন এক সময়। জগদীশ গুপ্ত জীবদ্দশায় কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান কিংবা পুরস্কার পাননি, শেষ জীবন কেটেছে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবহেলায়। যাদবপুরের এক রেফিউজি কলোনিতে তিনি প্রায় অন্ধ অবস্থায় শেষনিশ্বাস ফেলেছিলেন, তখন তাঁর ওষ্ঠে নিশ্চিত নিদারুণ তিক্ত স্বাদ ছিল। পাঠকদের কাছেও সমাদর পাননি তিনি, কিন্তু সমালোচকদের স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেকখানি, সমস্ত অগ্রগণ্য সাহিত্য-পণ্ডিত ও সমালোচকরা তাঁর প্রতি যথেষ্টরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কলম ধরেছেন তাঁর জন্য। কমলকুমার মজুমদার জীবিতকালে পাঠক পাননি, সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি তাঁর দিকে, তাঁর নামে বঙ্কিম পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর এগারো বছর পর, যা এক নির্মম রসিকতার মতন, যা মুকুন্দ দাসের বিখ্যাত গানের লাইনটি মনে করিয়ে দেয়। সতীনাথ ভাদুড়ী আবার এদিক থেকে এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, এক অজ্ঞাতকুলশীল

লেখক হয়েও প্রথম উপন্যাসের জন্যই তিনি পেরেছেন রবীন্দ্র পুরস্কার, যা এ দেশে শ্রেষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান। এ দৃষ্টান্ত আজও তুলনারহিত।

প্রথমে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত থেকেই শুরু করা যাক।

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত জন্মেছিলেন গত শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার কুষ্টিয়ায়। প্রথম যৌবনেই তাঁকে চাকরি নিতে হয়, অতি সাধারণ চাকরি, আদালতের কেরানিগিরি। চাকরিসূত্রে বদলি হতে হতে তিনি আসেন বোলপুরে, অদূরেই শান্তিনিকেতন, কিন্তু রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যাওয়ার স্পৃহা তাঁর ছিল না। তিনি কস্মিনকালেও রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আদালতের কেরানিটির মানসিকতার বিস্তর ব্যবধান। সেই সময়ে কল্লোল, কালি-কলম গোষ্ঠীর তরুণ লেখকরা প্রকাশ্যে রবীন্দ্র-বিরোধী বলে পরিচিত হলেও আসলে সকলেই ছিল প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রভক্ত, তখনই তাঁরা গোপনে, নিভৃতে পাতার পর পাতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে চিত্তশুদ্ধি করতেন এবং পরবর্তীকালে সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষায় যাঁরা চর্চা করবেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মাথার ওপর বসিয়ে রাখাটা অপছন্দ করতে পারেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে গুরুঠাকুর হিসেবে মান্য করাটা ন্যাকামি মনে করতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। সেই দিক থেকে জগদীশচন্দ্র কী করে রবীন্দ্র-বর্জিত হয়ে রইলেন, তা বেশ কৌতূহলজনক।

বোলপুরে থাকার সময়েই, একচল্লিশ বছর বয়েসে জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'বিনোদিনী' ছাপা হয়। এত বেশি বয়েসে আদালতের এক কেরানির হঠাৎ লেখক হবার সাধ জন্মালো কেন? অল্প বয়েসে তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থটি খুবই দুর্লভ, তাঁর রচনাবলীতে কিছু কিছু কবিতার নমুনা আছে, সেগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার মধ্যে প্রতিভা কিংবা বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন নেই। তারপর সুদীর্ঘকাল সাহিত্যজগতের সঙ্গে তাঁর কোনও সংস্রব ছিল না। 'বিনোদিনী' গ্রন্থটির আগে তাঁর দু' চারটি গল্প পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু তাও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়ে। এমনকী প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া জাগাতেও পারেননি। 'কালি-কলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ থেকে জানতে পারা যায়, প্রথম দিকে তাঁর অনেক রচনাই ফেরত আসত, সম্পাদকের নির্দেশে গল্পের কিছু কিছু অদল বদল করে নতুনভাবে লিখতে হত। প্রথম গল্প-গ্রন্থ ছাপার জন্যও তিনি প্রকাশক পাননি, বোলপুরের এক সহৃদয় ব্যক্তি খরচ দিয়েছিলেন, সেই বইয়ের তিরিশ-পঁয়তিরিশ কপির বেশি বিক্রি হয়নি, বাকি কপিতে ধুলো জমেছে।

তবু তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করে রইলেন কেন? 'গল্প কেন লিখিলাম?' এই নামে জগদীশচন্দ্রের একটি রচনা আছে। তাতে তিনি কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, তাঁর স্ত্রীর তাড়না থেকে বাঁচার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখলেই হাতে একটা পয়সা দিয়ে বলতেন বাজার থেকে ধনে কিংবা কাঁচালঙ্কা কিংবা পান কিংবা সোডা কিংবা মৌরি কিনে আনতে। অনবরত বাজারে

ছোটা এবং বউয়ের ফরমাশ খাটা এড়াবার জন্যই তিনি কলম হাতে নিয়ে লেখার ভান করতেন। ভান করতে-করতে একদিন গল্প লিখে ফেললেন। এটা বেশ একটা ভাল ধরনের রসিকতা, কিন্তু সত্যিকারের আত্ম-উদ্‌ঘাটন নয়। লেখকরা সাধারণত তাঁদের প্রেরণার গূঢ় সত্যটি বলতেও চান না। অন্তরের তাগিদ, নিজেকে প্রকাশ করার যন্ত্রণা কিংবা সাহিত্যে নতুন কিছু সংযোজনের বাসনা, এ সবই গালভরা বা আত্মম্ভরিতার মতন শোনায়। 'কেন লিখি' এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ লেখকই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে উড়িয়ে দেন। সৈয়দ মুজতবা আলি অনেকবার স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, লিখি শুধু টাকার জন্য! আমরা জানি, তাঁর ক্ষেত্রেও এই উত্তর একেবারেই সত্য নয়।

একজন মহৎ লেখকের গুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা হঠাৎ ফেটে বেরিয়েছে, 'বিনোদিনী' পড়লে সে কথাও মনে হয় না। গল্পগুলি গল্প হিসেবে বেশ দুর্বল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক যথেষ্ট উন্নত, উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পতেই প্রতিভাবান লেখকরা পরস্পরের সঙ্গে স্পর্ধা করছেন, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত সেই আঙ্গিক আয়ত্ত করতে পারেননি। আমার মনে হয়েছে, সেগুলি ছোট গল্পের বদলে যেন উপাখ্যান। কিছু কিছু রোমহর্ষক ঘটনা কেউ কেউ যেমন মুখে বর্ণনা দিয়ে চমকে দেয়, তার নিজের অভিজ্ঞতাও নয়, শোনা কথা, সেই ধরনের। 'পল্লী শ্মশান' গল্পটির গঠনেও সেই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে তার গ্রামের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করায় বন্ধুটি বলল, গ্রামের সে বাড়ি আর নেই, সবাই ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ হিসেবে সে একটি কাহিনী বিবৃত করল। দেশের সেই বাড়িতে এক সময় থাকত গুটিপাঁচেক বিধবা, এক অথর্ব বৃদ্ধ ও একটি কিশোর। এর মধ্যে আসাম থেকে এক আত্মীয় এলেন শরীরে নানারকম রোগ নিয়ে। গ্রামে ডাক্তার নেই, সুতরাং সেই অসুস্থ বৃদ্ধটিকে মরতে হল শীগ্‌গিরই। মৃত্যুতেও সে এই পরিবারটিকে বিপদে ফেলে গেল। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শবটিকে দাহ করা হবে কীভাবে, তাও আবার ব্রাহ্মণের শব? কাছাকাছি প্রতিবেশীরা সবাই মুসলমান। এক সময়ে হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট মেলামেশা ছিল, পরস্পরের বিপদে-আপদে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসত। ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার পর যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, ওই হিন্দু বিধবারা তা জানেন না। কিশোরটিকে বারবার পাঠানো হল মুসলমান পাড়ায়। মুসলমানরা সবাই একবাক্যে বলে দিল, তারা হিন্দুর মড়া ছোঁবে না, কাঠ দিয়েও সাহায্য করবে না। এ দিকে মড়া বাসি হয়ে যাচ্ছে। অতি কষ্টে কিশোরটি দূর গ্রাম থেকে কয়েকজন আত্মীয়কে ডেকে আনল, তারা মৃতদেহটি শ্মশানে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু নমো নমো করে কোনওক্রমে শুধু মুখে আগুন দিয়ে আর পুরো পোড়াবার ধৈর্য থাকল না তাদের। বালির বস্তা বেঁধে সেই শব ডুবিয়ে দেওয়া হল নদীতে। বালির বস্তাটার মুখ বাঁধা হয়নি ভাল করে, একটু একটু করে ঝরে গেল সব বালি, দু' দিন পরে ভেসে উঠল শব। সেই বিধবারা ঘাটে গিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণের লাশ শকুন-শেয়াল-কুকুর-কাকেরা মিলে ঝটাপটি, কামড়াকামড়ি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তারপরেই অসহায়, সন্ত্রস্ত পরিবারটি গ্রাম ছেড়ে পালালো। এটা একটা বীভৎস পল্লীচিত্র হতে পারে, কিন্তু এটা কি গল্প?

'দিবসের শেষে' নামে গল্পটি আরও বিচিত্র। এটাও যেন পুরনো আমলের মাসি-পিসিদের গালগল্পের মতন। সাধারণত এই সব গল্প আরম্ভ হয় এইভাবে: শুনেছিস, অমুক গ্রামে একবার কী হয়েছিল? সেইরকমই, এক গ্রামে একটা ছোট নদীর ধারে রতি নামে এক নাপিতের বাড়ি। তার স্ত্রী নারায়ণী তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর অনেক পুজো-আচ্চা, তাগা-তাবিজ ধারণ করে আর একটি ছেলের জন্ম দেয়, তার নাম পাঁচু। এই পাঁচুকেও অনেক মাদুলি-কবচ পরিয়ে সাবধানে রাখা হয়, সে বাবা-মায়ের বড় আদরের। এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বলল, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।' এ কথা শুনে মায়ের মন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেও রতি নাপিত রেগে উঠল, এটা একটা অসম্ভব কথা। তাদের এই ছোট্ট নদীতে কেউ কোনওদিন কুমির দেখেনি, কুমির আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই নদী স্তন্যদায়িনী জননীর মতন দয়াময়ী।

কথাটা রটে গেল সারা গ্রামে। বাবুরা কুমিরের কথা শুনে ঠাট্টা করলেন। রতি নাপিতও জেদ ধরে ছেলেকে নিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। কিছুই ঘটল না। বাড়ি ফেরার পর বাবা, মা, এমনকী পাঁচুর মুখেও হাসি ফুটল। সেদিন বিকেলে পাঁচু তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে একটা কাঁঠাল চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল মায়ের কাছে। কাঁঠালের আঠায় তার সারা শরীর মাখামাখি। এ বাড়ির সব জল-কাজই নদীতে। মা আবার ভয় পাচ্ছে বলে বাবাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল সারা শরীর ধোয়াতে। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। বাবার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে পাঁচু, এমন সময় তার সামনে ভেসে উঠল কালান্তক যমের মতন এক বিশাল কুমির। রতি নাপিত ফিরে তাকাবার আগেই কুমিরে নিয়ে গেল পাঁচুকে। গল্পটি যেন নিয়তি নামে কোনও দেবীর পাঁচালির অংশ, যদিও অলীক কুমিরের বর্ণনা ব্যঞ্জনাময়।

'ভরা-সুখে' গল্পে একটি বড় একান্নবর্তী পরিবারের জননী অনেকদিন অসুস্থ। এক সময় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে সবাই খুব খুশি। তখন সমস্ত ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি, নাতবউরা ঠিক করল, মা সেরে ওঠা উপলক্ষে সবাই কিছু না কিছু রান্না করে মাকে একটু করে খাওয়াবে। যেদিন সবাই এরকম একটা আনন্দভোজের ব্যবস্থা করে যখন মাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এল, মা তখন চিরকালের জন্য চোখ বুজেছেন।

'এইবার লোকে ঠিক বসে' গল্পে শিবপ্রিয় নামে এক গ্রাম্য নির্বোধকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোল। সোনা বানাবার আশায় সে এক ধোঁকাবাজ সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে ঘর ছাড়ল। সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসে সে তার পরিবারের সর্বনাশ সামলাতে পারল না, সে নিজেও পাগল হয়ে গেল। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পটির নাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া হলেও এখানে এক অতি বিশ্বাসী ভৃত্য একদিন নির্জন মাঠে প্রভুর গায়ে ছুরি মেরে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। শুধুই এইটুকু কাহিনী। '...পয়োমুখম' কাহিনীটি কিঞ্চিৎ বড়, এক কবিরাজ টাকার লোভে তার ছেলের বিয়ে দেয়, আর একটার পর একটা পুত্রবধূ মেরে ফেলে। এখানে যেন এক মঁসিয়ে ভার্দু শ্বশুরের ভূমিকায়। 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' গল্পে সদু খাঁ নামে এক গ্রাম্য বদমাশ হঠাৎ ধনী হয়ে উঠে সুন্দরী মেয়েদের হরণ করতে শুরু করে। জসিম নামে এক গরিব চাষীর বউকে সে

আটকে রাখে নিজের বাড়িতে। অর্জুন নামে এক ডাকাবুকো নমঃশূদ্র এই ঘটনা শুনে খেপে যায়, জসিমকে সাহায্য করার জন্য সে দলবল জোগাড় করে। সদু খাঁর গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে অর্জুনের দলের লড়াই হল জোর, এতে অর্জুন-জসিমরাই জয়ী হল। কিন্তু জসিম তবু তার বিবিকে ফেরত পেল না, কারণ সে নিজেই আসতে চায় না।

এগুলিকে নিটোল ছোটগল্প বলা যায় না, সার্থক সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দেওয়াও মুশকিল। তবু জগদীশ গুপ্তর এই পাঠক-বঞ্চিত গল্প-গ্রন্থটি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। এমনকী এতকাল পরেও এই গল্পগুলি যারা প্রথম পড়বে, পড়তে পড়তে তাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হবেই। লেখকের ভাষা ঝরঝরে, গতিশীল, নির্লিপ্তভাবে তিনি পরপর মানুষের অসাধুতা, কলুষ, পাপ, নির্মমতা, সর্বনাশ ও নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের কথা লিখে যাচ্ছেন। সুস্থতা, সৌন্দর্যবোধ, প্রেম, আত্মদান, সাধারণত যে সব বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য, সেগুলিকে তিনি একেবারেই পরিহার করে গেছেন। একজন লেখক পরপর শুধু মানুষের জীবনের খারাপ দিক ও পরাজয়ের কথাই লিখে যাবেন, এও কি সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই বলেই এই লেখক সম্পর্কে আমরা বিস্মিত হই, কিছুটা বিরক্তও বোধ করি, গল্পগুলি আমাদের পছন্দ হয় না, তবু আমরা এই লেখক সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করি। আমরা বুঝতে পারি, এই লেখক সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন রস আনছেন, যাকে উদ্ভট রস বললেও ঠিক বলা হয় না, মোহিতলাল যাকে বলেছেন ঔছভওততগ, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হলেও অভিনব। সত্য-শিব-সুন্দরের একেবারেই তোয়াক্কা করছেন না একজন লেখক, এমনটি আর আগে দেখা যায়নি। অনেক লেখক প্রথানুগত ধারায় লিখে লিখে শেষ পর্যন্ত গতানুগতিক ও মাঝারি ধরনের হয়ে যান, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত অনন্য।

একচল্লিশ বছর বয়েসে প্রথম গল্প-গ্রন্থ, আর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লঘু-গুরু'। এই গ্রন্থটিও উপন্যাস হিসেবে অসার্থক কিন্তু বিষয়বস্তুর জন্য বেশ আলোড়ন তুলেছিল। একটি বেশ্যা হতে চাইল গৃহবধূ, কিন্তু পুরুষ নামের কয়েকটি পাষণ্ড তাকে শান্তি দিল না। তার নিষ্পাপ কন্যাটির জীবন করে তুলল দুর্বিষহ। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটি এক বিবেকহীন তঞ্চকের কাহিনী। আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি, পূর্ব প্রকাশিত ছোটগল্পকে পরে টেনে লম্বা করেছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি খুবই দুর্বল, উপন্যাস পদবাচ্য হওয়ারই উপযুক্ত নয়। বরং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর পরবর্তী ছোটগল্পগুলি অনেক উন্নত হয়েছে, ভাষা হয়েছে ধারালো, কিন্তু জেদীর মতন তিনি তাঁর নৈরাশ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করেননি কখনও। তাঁর চোখ সব সময় অশুভের দিকে, অশান্তির দিকে। ক্রূরতার দিকে। কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের চেয়ে বয়েসে বেশ বড় ছিলেন জগদীশচন্দ্র, তবু তিনি ওই গোষ্ঠীভুক্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুরে মেলেনি, ভাবে মেলেনি। প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যকুমারেরা ছিলেন মূলত রোমান্টিক, তাঁদের ভাষা কাব্যগন্ধী, তাঁদের ঝোঁক হৃদয় রহস্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে গিয়ে

তাঁরা বাস্তববাদকেও আশ্রয় করতে চেয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু সে বাস্তবের প্রতি দৃষ্টিতেও রোমান্টিকতার সুর্মা মাখানো। প্রেমের গল্পে তাঁরা এনেছেন শরীর, সেই শরীরে মিশিয়েছেন মোহময় আবেশ, কোনওরকম কদর্যতার স্থান নেই সেখানে। জগদীশচন্দ্র কিন্তু কাব্যের ধার ধারেন না, তার বাস্তবতা শুধু অবিচার আর বঞ্চনায় ভরা, এমনকী অবিচারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদও নেই। তাঁর চরিত্রগুলির হৃদয় নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, আছে শুধু শরীর, অত্যন্ত চাঁছাছোলা ভাষায় তিনি বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, নর-নারীর শারীরিক সম্পর্কের উর্ধ্বে আর কোনও সম্পর্ক হতে পারে না। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে 'শঙ্কিতা অভয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মায়ের নাম অভয়া, মেয়ের নাম শান্তি আর বাবার নাম অতুল। এই তিনটিই চরিত্র। এর মধ্যে বাবা আর তরুণী কন্যার মধ্যে খুব ভাব, মা যেন একটু বাইরে পড়ে থাকে। মা সেই জন্য ভয় পায়। ভয় পায়, আরও একটি কারণে, বাবা ও মেয়ের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু বড় বেশি খোলামেলা। মেয়েটি লেখাপড়া জানে, নাচতে জানে, বাবা মেয়েকে সব রকম প্রশ্রয় দেয়। বাবা এস্রাজ বাজায়, মেয়েটি নাচে। বাবাকে সে হাজার প্রশ্ন করে, তার মধ্যে প্লেটোনিক লাভ, যৌনতা, পুরুষের বেশ্যার প্রতি আসক্তি—এ সবও এসে পড়ে। এই সব শুনে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের জননীর শঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকতেই পারত এবং বাবা-মা-মেয়ের সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে হতেই পারত কোনও স্বাভাবিক গল্প, কিন্তু লেখক সেটাকে একটা আকস্মিক ক্রূর আঘাতের দিকে নিয়ে যাবেনই। গল্পের শেষে আচমকা মা মেয়েকে প্রশ্ন করল, বাবা তাকে শারীরিকভাবে নষ্ট করেছে কিনা। বিস্মিত মর্মাহত শান্তির মুখের ওপর অভয়া আবার বলে দিল, অতুল তার বাবা নয়। একদিন বালিকা শান্তিকে নিয়ে অভয়া কুলত্যাগ করেছিল অতুলের সঙ্গে। সুতরাং সেই 'বেটাছেলে আর একটি মেয়েছেলেকে' নষ্ট করতে তো পারেই। জগদীশচন্দ্র যেন প্রতিটি গল্প লেখার আগেই প্রতিজ্ঞা করে নিতেন, কিছুতেই তিনি নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা ও ক্লেদ থেকে কোনও কাহিনীর উত্তরণ ঘটাবেন না। সেই যুগেও তিনি ঈশ্বর, ধর্মবিশ্বাস বা শুভবোধের কোনও প্রসঙ্গই আনেননি কখনও। এও এক ধরনের বলিষ্ঠতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর তিনটি চরিত্রের সঙ্গে এই তিনটি চরিত্রের যেন কিছুটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মানিকের কাহিনী অনেক জটিল এবং নিছক একটা গোপন কথা প্রকাশেই শেষ হয় না।

জীবন জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ কিছু দেয়নি। দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। লেখার জন্য যত পরিশ্রম ও আয়ুক্ষয় করেছেন, তার বিনিময়ে পাননি প্রায় কিছুই। তবু লিখেছেন নিছক লেখার আনন্দেই। একেবারে শেষজীবনে তাঁকে সরকারি মাসোহারাব ওপর নির্ভর করতে হত, সেটাও মোটেই সম্মানজনক নয়। তাই তাঁর প্রায় সব লেখাতেই প্রতিফলিত হয়েছে নৈরাশ্য ও নিয়তির কাছে পরাজয়ের ইঙ্গিত। আমার মনে হয়, শুধু দারিদ্র্যই এর কারণ নয়। তাঁর চরিত্রেই কোনও রোমান্টিকতা কিংবা আশাবাদ ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কোনও প্রতিবাদ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়নি। তৎকালে অনেককেই মার্কসবাদ একটা মুক্তির পথ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,

জগদীশ গুপ্ত মার্কসবাদকে কেন অবলম্বন করলেন না সেটাও একটা বিস্ময়ের কথা। নৈরাশ্যের প্রতিভূ হয়ে থাকাটাই ছিল যেন তাঁর অহংকার।

সাহিত্য রচনার বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তি কিংবা কোনও পুরস্কারের স্বীকৃতির সম্ভাবনা ছিল না জেনেও কিন্তু জগদীশ গুপ্ত ভেবেছিলেন কোনও না কোনওদিন তাঁর এই রচনাগুলি মর্যাদা পাবেই। সেটাই ছিল তাঁর লেখার প্রেরণা। 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' নামে তাঁর গল্প-গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে তিনি ভবভূতির 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী' এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভবভূতির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি কিন্তু সার্থক হয়নি। তাঁর এই শ্লোকটিই লোকে মনে রেখেছে, তাঁর অন্য রচনা বিশেষ কেউ পড়ে না। জগদীশচন্দ্রকে অবশ্য নিরবধিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, জীবদ্দশাতেই তিনি সমালোচকদের মনোযোগ পেয়েছেন যথেষ্ট। অনেকে বলেন, জগদীশচন্দ্র কখনও জনপ্রিয় হননি। কথাটা ঠিক কি? আমাদের দেশে 'জনপ্রিয়' শব্দটির অর্থ বেশ গোলমেলে, অনেক ক্ষেত্রে খুবই লঘু। বই বেশি বিক্রি হওয়া আর জনপ্রিয়তা কি এক? রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়? শরৎচন্দ্রের বই বিক্রি আজও প্রচণ্ড, সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বিক্রি বরাবরই কম। অনেক লেখকের বই প্রচুর বিক্রি হয় কিন্তু সাহিত্য আলোচনায় তাঁদের নাম ওঠে না, আবার অনেক লেখকের বই তেমন বিক্রি হয় না, কিন্তু তাঁদের নাম লোকের মুখে মুখে ঘোরে। জগদীশচন্দ্রেরই সমসাময়িক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বই প্রচুর বিক্রি হত। এখন তাঁর নাম অনেকের মনে পড়ে না। অথচ বাংলা সাহিত্যের যে-কোনও আলোচনায় জগদীশচন্দ্রের নাম অবধারিত।

অন্যান্য দিকে বঞ্চিত হলেও জগদীশচন্দ্রের সমালোচক-ভাগ্য ভাল। মোহিতলাল মজুমদার ও অধ্যাপক অনিলবরণ রায় বহুদিন আগেই তাঁর রচনাগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে মাথায় তোলেননি, তাঁর দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে ভিন্ন রসের উদ্গাতা হিসেবে সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নির্দিষ্ট আসন দিয়েছেন। ক্রমে সমালোচকদের সুর বদলাতে থাকে। কেউ বললেন, 'জগদীশ গুপ্তের সোনার লেখনী', কেউ বললেন তিনি 'শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মানসপুত্র', কেউ বললেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি বা মন্ত্রগুরু। এ সবই নিতান্ত অতিশয়োক্তি।

এখানে আমাদের দেশের সমালোচকদের সম্পর্কেও দু'একটা কথা বলা দরকার। অনেক সমালোচকই বিশেষ একজন কোনও লেখক সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সাহিত্যের পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটা মনে রাখেন না। একজন কোনও লেখককে প্রশংসা করার সময় অনেকে অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের নস্যাৎ করে থাকেন, যা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। একজন লেখককে বড় করার জন্য অন্যদের ছোট করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ সাহিত্য দৌড়-প্রতিযোগিতা নয়। সুকুমার সেন মহাশয় জগদীশচন্দ্রকে বড় করে দেখাবার অভিপ্রায়ে তাঁর সমসাময়িক অন্য আধুনিক লেখকদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন। এতে সন্দেহ হয়, উক্ত পণ্ডিত আধুনিক সাহিত্যের সঠিক পাঠ নিয়েছিলেন কিনা। কোনও কোনও সমালোচক আস্তার ডগ খোঁজেন। তাঁরা আবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান। তাঁরা বেছে বেছে, খুঁজে

খুঁজে এমন একজন লেখককে তুলে ধরেন, যিনি বহুল প্রচারিত নন, যাঁর গ্রন্থগুলি দুর্লভ। এরকম কোনও লেখককে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁর রচনাকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে তাঁকে এক চমকপ্রদ গুপ্তধন হিসেবে প্রতিপন্ন করা সমালোচকদের আত্মবিজ্ঞাপনের পর্যায়ে পড়ে। সেই সব সমালোচক যেন বলতে চান, দেখো, এতদিন তোমরা কেউ এঁকে চিনতে পারোনি, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। আমি কত বড় বোদ্ধা! আন্ডার ডগ হিসেবে বিবেচিত যে-লেখক কতিপয় সমালোচকের দ্বারা বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসিত হন, তাঁর আসলে অপমানিত বোধ করারই কথা।

জগদীশ গুপ্ত একজন মহৎ কিংবা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নন। শরৎচন্দ্রের ধারার লেখক তাঁকে বলা যায় না, কারণ শরৎচন্দ্রের মতন আবেগ কিংবা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি কিংবা মন্ত্রগুরু হবার কোনও যোগ্যতাই তাঁর নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট হলেও এঁরা দু'জনেই সমসাময়িক লেখক। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৫ সালে, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রে ছাপা হয় এর মাত্র তিন বছর বাদে। জগদীশ গুপ্ত রচনা শুরু করেন প্রৌঢ় বয়েসে, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নিতান্তই কলেজের ছাত্র, গল্প লিখেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট', গল্প হিসেবে অতি তুচ্ছ, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামী'। যে গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের প্রতিভা চেনা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্পে নিষ্ঠুরতা ও ক্রূরতা খানিকটা প্রাধান্য পেলেও তাঁর সাহিত্যের মূল সুর মানবতাবাদ। উত্তরকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছিলেন তো বটেই, প্রথম দিকেও যে-কোনও লেখাতেই বিশেষ একটা চরিত্রের প্রতি থাকত তাঁর সহানুভূতি।

এই সহানুভূতি ব্যাপারটাই যেন জদীশচন্দ্রের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ঈশ্বরের স্থান নেই, কিন্তু শয়তানকেও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় মেনে নেননি। জগদীশ গুপ্ত ধর্মীয় সংস্কারকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিয়তির প্রতি আস্থাও এক ধরনের অন্ধ সংস্কার।

জগদীশ গুপ্ত মূল ধারার থেকে একেবারে আলাদা, তিনি অন্য কারুর মতন নন, সেই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাহিত্যের উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি, তবু অভিনবত্বের জন্যই তিনি স্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্রের সমালোচকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একজন। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত, দায়সারা প্রশংসাপত্রে। পয়োধি দই কিংবা দিশি কোম্পানির তৈরি ফাউন্টেন পেনের কালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-রকম সার্টিফিকেট দিতেন, কিছু কিছু তরুণদের রচনা সম্পর্কেও সে রকম সার্টিফিকেট দেওয়ার অভ্যেস ছিল তাঁর। এ ছাড়া হয়তো তাঁর উপায়ও ছিল না, কত বই তিনি পড়বেন? কিন্তু জগদীশচন্দ্রের উপন্যাস 'লঘু-গুরু'

পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন, সেটি সত্যিই বিস্ময়কর। যে উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ নেই, সে বইটি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি সময় ব্যয় করেছেন। জগদীশচন্দ্র অবশ্য এ সমালোচনা একেবারেই পছন্দ করেননি, এর একটি উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে রীতিমত অসম্মান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এ 'জজিয়তি বিপথগামী' এবং এর মধ্যে 'অভদ্র হুল' ফোটানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ওই সমালোচনাটি আমি আগে পড়িনি। সম্প্রতি পাঠ করে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ এমন বিশুদ্ধ সমালোচনা খুব কমই লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না। এই উপন্যাসের লেখককে একটুও নিন্দে করেননি রবীন্দ্রনাথ, কাহিনী ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তন্নতন্নভাবে। এক বাজারের বেশ্যা কিংবা কয়েকটি ব্যভিচারী ব্যক্তির কাহিনী বা বিষয়বস্তুকেও আক্রমণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, বরং বলেছেন, হ্যাঁ, এই সব নিয়েও সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল আপত্তি বাস্তবতা সৃষ্টির নামে অবাস্তবতা নিয়ে বাড়াবাড়ি। লঘু-গুরু উপন্যাসের চরিত্রটি একেবারেই অবাস্তব। প্রথমে মনে হয়েছিল উত্তম নামের গণিকাটি এক সাধারণ দেহোপজীবিনী, পরে জানা গেল, সে শুধু রূপসীই নয়, সে যথেষ্ট লেখাপড়া জানে, উপন্যাস পড়ে, প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারিণী, উচ্চ রুচি, রন্ধন পটীয়সী, আরও গুণের শেষ নেই। এমন একটি রমণী কেন গ্রামের গঞ্জের বেশ্যা হয়, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই, এ চরিত্র একেবারেই বাস্তবতার ধার ধারে না। এই উপন্যাসটি উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রিয়েলিজ্‌ম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা আজও প্রণিধানযোগ্য। দুটি মন্তব্য উদ্ধার করছি: "রিয়েলিজ্‌মের নাম দিয়ে একালের শৌখিন আধুনিকতাকে খুশি করা সহজ। যেটা সহজ, সেটাই তো আর্টের বিপদ ঘটায়। দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্রয় দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ, এই জন্যই দেশাভিমানী কাব্যে, গল্পে আর্ট জিনিসটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে।" অনেক লেখায় মাটির গন্ধ খুঁজে আমরা উল্লসিত হই, সে সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মন্তব্য, "বঙ্গ বিভাগের সময় দেশি চিনির চাহিদা বেড়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে, বিদেশি চিনিতে মাটি মিশিয়ে দেশি করা সহজ। আগুন জ্বালিয়ে রসে পাক দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা রসিকেরা মাটির রং দেখলেই অভিভূত হবে। সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়েলিজ্‌মের রং ধরবে, এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি।"

জগদীশ গুপ্ত বিস্মৃত বা বিলুপ্ত লেখক নন, তাঁর বইগুলিও দুষ্প্রাপ্য নয়। তবে তিনি কোনওকালেই সাধারণ পাঠকদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, ইদানীং তিনি সমালোচক ও গবেষকদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। তবে যে-সব উৎসাহী পাঠক বাংলা সাহিত্যের সব রকম রসের স্বাদ নিতে চান, তাঁরা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে অবশ্যই পাঠ্যতালিকায় স্থান দেবেন। আমি নতুন করে তাঁর বইগুলি পড়ে দেখলাম, তাঁর স্টাইল একালেও পাঠযোগ্যতা হারায়নি। নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় জগদীশ গুপ্তর রচনাবলীতে বহু তথ্য সংযুক্ত হয়েছে, যা গবেষকদের কাজে লাগতে পারে,

কিন্তু রচনাবলীর সব লেখাগুলি পড়ার ধৈর্য পাঠকদের থাকবে কিনা সন্দেহ। উপন্যাসগুলি না পড়লেও চলে। বছর পনেরো আগে সুবীর রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্তর গল্পের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, যাতে লেখক সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ও যুক্ত হয়েছিল। এমন সুনির্বাচিত ও সুসম্পাদিত গ্রন্থ বাংলায় বিশেষ তো চোখে পড়ে না।

॥ ২ ॥

আমি জগদীশ গুপ্তকে কখনও চোখে দেখিনি। তিনি বেঁচে ছিলেন একাত্তর বছর, মৃত্যু হয় উনিশ শো সাতান্ন সালে। সেই সময়ে আমরা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করছি, সেই পত্রিকাকে ঘিরে একটা বেশ বড় অতি তরুণ লেখক গোষ্ঠী জড়ো হয়েছিল। আমরা বাংলা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সব লেখাই তন্নতন্ন করে পড়তাম, অতি বিজ্ঞাপিত লেখকদের চেয়ে অল্পজ্ঞাত লেখকদের প্রতিই ছিল বেশি আকর্ষণ। কিন্তু সে সময়ে আমরা জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলাম না। তিনি বেঁচে আছেন কিনা জানতাম না। তাঁর একটি দুটি উপন্যাস ও কিছু গল্প পড়া ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনীর উপাদান এতই কম জানা ছিল যে, মনে হত, তিনি বুঝি কল্লোলেরও আগেকার লেখক, এবং কিছু কিছু সমালোচকের মত অনুযায়ী বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি। সেই সময়ে জগদীশ গুপ্তর বইগুলিও সুলভ ছিল না, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতায় তাঁর কলমও স্তব্ধ হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুও হয় অনেকেরই অগোচরে। তিনি বামপন্থীদের দলে যাননি, বড় পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হননি, তাই তাঁকে নিয়ে বিশেষ কেউ উৎসাহ দেখায়নি। প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রকাশক-পাঠকদের ঔদাসীন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুছে দিতে পারেনি তাঁর নাম, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন পাতা হয়ে গেছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, জগদীশচন্দ্র যখন অস্তমিত, সেই সময় বাংলা গদ্য লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম সতীনাথ ভাদুড়ী। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' প্রকাশের পর প্রমাণিত হয়ে গেছে, ইনি একজন বিরল প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক। আমি ছিলাম তাঁর অতি ভক্ত পাঠক, তাঁর প্রতিটি লেখা পড়েছি বারবার। মনে আছে, 'জাগরী' উপন্যাস পড়ার সময় এক দুপুরে আমি এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম যে আমার মা ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিলেন রান্নাঘর থেকে। অশ্রুবর্ষণ কিংবা চক্ষু সজল হওয়া সাহিত্য-শিল্প বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না তা জানি। কিন্তু যারা অন্য সময়ে, অন্য অনেক বিচ্ছেদে-বিপদে কাঁদতে পারে না, বই পড়ে কান্নাকাটি করাটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু-নীলু মা-বাবার ভুল বোঝাবুঝির জন্যই আমি কেঁদেছিলাম। পৃথিবীর বড় বড় ট্র্যাজেডিগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের জন্যই ঘটে না, আসল ট্র্যাজেডি মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝিতে।

আমরা সেই সময়ে 'কৃত্তিবাস' নামে পৃথক একটি গল্পের পত্রিকারও পরিকল্পনা

করেছিলাম, প্রথম সংখ্যায় চেয়েছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদারের গল্প। কমলকুমার গল্প দিয়েছিলেন, সতীনাথ ভাদুড়ী গল্প পাঠাননি, আমার চিঠিরও উত্তর দেননি। তখন ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই চিঠিতে ঠিকানা ভুল ছিল, নইলে আমাদের মতন ভক্তের ডাকে তিনি সাড়া দেবেন না কেন? অনেক পরে অবশ্য জেনেছি, ঠিকানা ভুল ছিল না, আমি পূর্ণিয়ায় গিয়ে ভাট্টাবাজারে খুঁজে বার করেছিলাম তাঁর বাড়ি। ততদিনে তিনি মৃত এবং তাঁর সাধের বাগান জঙ্গলাকীর্ণ। সেই বাগান ছিল তাঁর অসম্ভব ভালবাসার, বাগানটি বিষয়ে তাঁর ডায়েরিতে অনেক কথা পড়েছি, কালিদাসের কাব্য মিলিয়ে মিলিয়ে সহকার বৃক্ষের অর্থাৎ আমগাছের সঙ্গে তিনি মাধবীলতার বিবাহ দিয়েছিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর সেই অতি যত্নের বাগান এবং তাঁর রচনাবলী দুই-ই ধূলিধূসরিত হয়ে পড়ে।

প্রথম উপন্যাসের বিস্ময়কর সাফল্য যেমন একজন লেখককে অনেকখানি সাহায্য করে, আবার কিছুটা ক্ষতিও করে। সতীনাথ ভাদুড়ী সারা জীবন জাগরী উপন্যাসের জন্যই চিহ্নিত হয়ে রইলেন। যদিও জাগরীর তুলনায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' অনেক উচ্চাঙ্গের উপন্যাস, বিশ্ব সাহিত্যে এরকম নতুন আঙ্গিকের ও গভীর জীবনবোধের উপন্যাস বিরল, কিন্তু হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় লেখা এ উপন্যাস বাঙালি পাঠকের সমাদর পায়নি। এই উপন্যাসের একটি তৃতীয় খণ্ড রচনা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, পরে তা থেকে নিরত হয়েছেন, এবং নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন, যদি বইটি বিক্রি হত, তা হলে কি তিনি আরও খণ্ডে খণ্ডে উত্তরোত্তর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' লিখতেন না?

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য রচনার কাল মোটামুটি উনিশ বছর, জাগরী যখন ছাপা হয়, তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ, তাঁর মৃত্যু হয় উনষাট বছর বয়েসে। 'জাগরী' লেখার আগে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কতটুকু? অনেকেই কবিতা দিয়ে শুরু করে। সতীনাথ সে রকম ভাবে কবিতা লেখেননি, দু'চারটি কবিতা কখনও বানিয়েছেন খেলাচ্ছলে, কিছু স্যাটায়ারধর্মী লেখা লিখেছিলেন পত্রপত্রিকায়। যৌবনের অনেকগুলি বছর মগ্ন হয়ে ছিলেন রাজনীতিতে, জেল খেটেছেন বেশ কয়েকবার, তার মধ্যে সাহিত্যসাধনার সময় ছিল না। কিন্তু জীবিকা-অর্জন কিংবা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না, তিনি সাহিত্যকেই অবলম্বন করার চিন্তা করে রেখেছিলেন অনেক আগেই। তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কথা কারুকে জানতে দেননি। জেলখানাতে বসে তিনি তাঁর শিষ্যপ্রতিম, প্রখ্যাত হিন্দি লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবার লিখতে শুরু করো, আর দেরি কোরো না, অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সঞ্চিত হয়েছে, এ যেন তাঁর নিজের প্রতিও স্বগতোক্তি। তিনি নিজেও জেলখানায় বসেই প্রথম মন-প্রাণ ঢেলে লিখতে শুরু করেন। দেশ স্বাধীন হবার অল্প কিছুদিন পরেই সংস্রব ত্যাগ করেন রাজনৈতিক দলের। যেন তিনি বলতে চেয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, দেশ শাসন করা অন্যদের কাজ। ফণীশ্বরনাথ রেণুর মুখে শুনেছি, সতীনাথ ভাদুড়ীকে বিহারের মন্ত্রী করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী মন্ত্রী হয়ে গেলে বাংলা সাহিত্যের যে কী অপরিমেয় ক্ষতি হত, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে, রাজনীতি থেকে সরে আসার অব্যবহিত পূর্ব সময় থেকে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন করবেন বলে যিনি ঠিক করেছিলেন, তিনি কিন্তু খুব বেশি লেখেননি, তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো, এর মধ্যে সাতখানি উপন্যাস, একটি ভ্রমণকাহিনী, একটি নাটক, বাকিগুলি গল্প। মোট ষাটটি গল্প লিখেছিলেন তিনি, কখনও কোনও পত্রিকার তাগিদে কিংবা সম্পাদকদের অনুরোধে লিখতেন না, লিখতেন শুধু নিজের ইচ্ছে হলে। আমাদের কৃত্তিবাসের জন্য সেই জন্যই তিনি লেখা পাঠাননি, বুঝতে পারি। তা ছাড়া, লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ছিলেন না তিনি, বরাবর থেকেছেন পূর্ণিয়াতে, হয়তো কলকাতা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলির খবরও রাখতেন না। অবশ্য সাহিত্যকে জীবিকা করেননি তিনি, করার প্রয়োজন ছিল না, তবু তাঁর লেখা অনেকে পড়বে এটা নিশ্চয়ই চাইতেন, তাই বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকাতেই লেখা দিতেন। প্রথম দিকের দুটি উপন্যাস ছাড়া তাঁর অন্য সব উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকায় এবং অনেকগুলি গল্প।

তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিকে ঠিক ছোটগল্প বলা যায় না। প্রত্যেকটিই বেশ বড় আকারের গল্প, কোনও কোনওটিকে আজকালকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'উপন্যাসোপম বড় গল্প'ও বলা যেতে পারে। ছোটগল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাস করার রীতি আছে আমাদের দেশে, আর সতীনাথ যেন উপন্যাসের নির্যাস নিয়ে এক একটি গল্প লিখেছেন। তাঁর 'বন্যা' নামের গল্পটি অনায়াসে একটি উপন্যাস হতে পারতো। বনফুল 'কিছুক্ষণ' নামে এই ধাঁচেরই উপন্যাস লিখেছেন। সতীনাথের ওপর বনফুলের কিছুটা প্রভাব পড়া বিচিত্র কিছু নয়, কারণ বিহারের তৎকালীন দু'জন খ্যাতিমান বাঙালি লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুলের কাছে লাজুক সতীনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। গ্রন্থাবলীতে মুদ্রণের ক্রম অনুসারে তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'গণনায়ক'। এই গল্পটি আকারে যথেষ্ট বড় তো বটেই, চরিত্রের সংখ্যাও এত বেশি যে, ছোটগল্পের আয়তনে যেন ধরে না। চরিত্রগুলো সব ভালভাবে ফোটেওনি, 'গণনায়ক' বিখ্যাত হয়েছিল তার বিষয়গুণে।

দেশের স্বাধীনতা লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আত্মত্যাগ, কারাবরণ, পুলিশের হাতে অত্যাচার ও ফাঁসির দড়িতে জীবনদানের অনেক গৌরবময় কাহিনী আগে লেখা হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা পাবার সম্ভাবনার মুহূর্ত থেকেই, ব্রিটিশ শাসন যখন আলগা হয়ে যায়, তখনই যে একশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে স্বার্থ, লোভ ও মুনাফাবাজির খেলা শুরু হয়ে যায়, সে কথা সতীনাথই প্রথম লিখলেন। বিহার-বাংলার সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চল উনিশ শো সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টের দু' তিন দিন আগে ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে, তা নিয়ে খানিকটা অনিশ্চয়তা ছিল, দু' একবার উলটো ঘোষণা হয়েছিল। সেই সুযোগে এক স্থানীয় নেতা বিপন্ন মানুষদের জিনিসপত্র কিনে নিতে লাগলেন জলের দামে, শুরু করলেন চিনির কারবার, এমনকী হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে ব্যবসা করতেও দ্বিধা করলেন না। শুরু হয়ে গেল স্বাধীন ভারতের নৈতিক অবনতির ইতিহাস।

'বন্যা' গল্পটি বেশ সরল। কাছাকাছি গ্রামের ব্রাহ্মণ, ভুঁইহার, সাঁওতাল ও মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি, ছুঁৎমার্গ ও কোন্দল লেগেই থাকে। বন্যায় যখন গ্রামগুলি ডুবতে লাগল তখন সবাই এক উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিল। দেখা গেল তখন সব বিভেদ ঘুচে যাচ্ছে, আপৎকালীন আত্মীয়-স্বজনের মতন প্রত্যেকেই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তারপর বন্যার জল যখন কমে যেতে লাগল, জেগে উঠল নোংরা, পচা-গলা সব জিনিস, ক্লেদ, আর তখনই মানুষগুলোর মধ্যেও পুরনো হিংসে, স্বার্থপরতা, নীচতা ফিরে এল। এটাকে বলা যেতে পারে একটা আঞ্চলিক জীবনের খণ্ডচিত্র, ছোটগল্পের দীপ্তি এর মধ্যে নেই।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম দিকের গল্পগুলির কাহিনীর মতন ভাষাও সরল, যেন অতিমাত্রায় সরল। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় রয়েছে ঝকঝকে আধুনিকতা, সোফিস্টিকেশান, তারাশঙ্করের ভাষার মধ্যে আছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য। এমনকী জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি চাঁছাছোলা ধরনের হলেও কোথাও কোথাও ঝংকারবহুল, যেমন, "চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর মনে হইল, বায়ুমণ্ডল যেন লতার তাড়সে চিড় খাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাড়ির অন্ধকার যেন ঠিক অন্ধকার নয়, বিশাল পক্ষ একটা পক্ষী বাড়ির এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাকিয়া ও অগণ্য আনাগোনার একটি ষড়যন্ত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—সে যেন উঠি উঠি করিতেছে; সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগ্নস্তূপ ক্রিমির মতন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।..." (তৃষিত আত্মা)

এই তুলনায় সতীনাথের গদ্য, "ক্ষিয়রের বাড়ির মেয়েরা অন্য ভদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য উঠোনে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছেন। আঙিনার আর এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে।" (বন্যা)

এই বর্ণনায় একটা ছবি ফুটছে বটে, কিন্তু গদ্য যেন এলানো। প্রতিটি বাক্যের শেষে প্রায় একই রকম ক্রিয়াপদ, বাংলা গদ্যের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সতীনাথ পড়াশুনো করে লেখক, দেশ বিদেশের সাহিত্য বিষয়ে কৃতবিদ্য, তিনি প্রতিটি লাইন ভেবেচিন্তে লিখবেন, এটাই স্বাভাবিক। সারল্যও একটা স্টাইল। পড়ার সময় চতুর শব্দ ব্যবহারে হোঁচট খেতে হবে না, লেখকের স্টাইল একেবারে বোঝা যাবে না, এমন সারল্য আনা আসলে খুব শক্ত। সতীনাথ সম্ভবত সেই দিকেই এসেছিলেন, তাঁর পরের দিকের গদ্যে আছে স্তব্ধ নির্মলতা, যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'তে।

প্রথম দিকের গল্পগুলিতে সতীনাথের ঝোঁক ছিল কাহিনীর নতুনত্বের দিকে। কখনও লিখছেন অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের কথা, কখনও কাহিনী চলে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ইনকাদের পতনের ইতিহাসে, কখনও আধুনিক লন্ডনে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি, এই লেখকের মানসিকতায় ক্রোধ, তিক্ততা, নৈরাশ্যের কোনও স্থান নেই, জীবন যেমনভাবে বয়ে চলেছে, তাকে তিনি অবিকল সেইভাবে দেখাতে চান, তার মধ্যে খুব চাপাভাবে মিশে থাকে তাঁর মৃদু শ্লেষ এবং কৌতুক। তাঁর

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প মনে হয়, 'আন্টা বাংলা'।

নীলকর সাহেবদের প্ল্যান্টার্স ক্লাব সাধারণ লোকের মুখে মুখে হয়ে যায় আন্টা বাংলা। নীলকর সাহেবদের তখন এমনই প্রতাপ যে, সরকারি সাহেবদেরও তারা গ্রাহ্য করত না। নেটিভদের প্রবেশ অধিকার ছিল না সেই ক্লাবের ত্রিসীমানায়। কুলি-কামিনদের দিয়ে অবশ্য কাজ করাতে হত। ক্লাবের সেক্রেটারি বেঞ্জামিনের প্রখর মেজাজ। এক রবিবার বেঞ্জামিন ক্লাবের বার রুমটি নতুন করে তৈরি করাবে, কিন্তু বিরসা ওঁরাও নামে মজুরটি ঠিক সময় এসে পৌঁছয়নি। বিরসা এক নগণ্য ভূমিদাস। তাকে খেত থেকে ধরে আনা হল, তাকে এক পাদ্রী বলেছিল, রবিবারে কাজ করতে নেই। এই অপরাধে বেঞ্জামিন তাকে প্রথমে একটা কাঁটাভরা লতা দিয়ে চাবকালো, তারপর রক্তাক্ত বিরসাকে প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার মাথায় ইট চাপিয়ে দিতে বলল তারই পুত্রবধূকে। পুত্রবধূ মোট ছ'খানা ইট দিয়েছিল, সাহেব হুমকি দিয়ে আরও দু'খানা ইট চাপালো। মাথায় আটখানা ইট নিয়ে বিরসা দাঁড়িয়ে রইল সূর্যের দিকে মুখ করে। কোনও প্রতিবাদ নেই। শাস্তি দেওয়া যেন সাহেবদের জন্ম-জন্মান্তরের অধিকার। সাহেবরা চাবুক মারবে, লাথি মারবে, তাদের মেয়েদের ইচ্ছেমতন ভোগ করবে, কখনও দয়া দেখিয়ে এক টুকরো পাঁউরুটি ছুঁড়ে দেবে, এ রকমই তো চলে আসছে। এমনকী কোনও এক সময় তার পুত্রবধূ যখন চুপি চুপি এসে মাথা থেকে কয়েকখানা ইট কমিয়ে দেবার কথা বলে, তাতেও রাজি হয় না বিরসা।

এক সময় সেই ইটসুদ্ধু মাটিতে পড়ে গেল বিরসা, তার আর জ্ঞান ফেরেনি। এই এলেবেলে লোকটা যেহেতু ছিল ক্রিশ্চিয়ান, তাই এক সহৃদয় বুড়ি মেম তার কবরের ওপর ফলক বাঁধাবার খরচ দেয়। বিরসার নাতির হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয় মিষ্টি খাবার জন্য। তাতেই পুত্রবধূ ও নাতি অভিভূত।

বিরসার নাতির নাম বোটরা। তার বাবা নিরুদ্দেশ, ঠাকুর্দাকে সে খুব ভালবাসতো। সেই ঠাকুর্দাকে সে হারালো। মা ক্রমে এক সাহেবের রক্ষিতা হয়ে গেল, বোটরা নিজে টেনিস বল কুড়োবার চাকরি পেল। বোটরার মনে কোনও কিছুই রেখাপাত করে না, বেঁচে থাকাটাই তো বড় কথা। মূল গল্পটি এই বোটরারই জীবনকাহিনী। সে ক্রমশ বড় হয়, আন্টা বাংলাও বদলাতে থাকে। কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীলকর সাহেবরা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে শুরু করে। ক্লাবটা চলে টিম টিম করে, তবু বোটরা সেখানেই থেকে যায়। অন্য কোথাও চাকরির ডাক পেলেও সে যায় না। সে দিনরাত মদ খায় আর বার রুমটায় শুয়ে থাকে, অন্য কিছু মনে না থাকলে, সে প্রতি বছর ঠাকুর্দার মৃত্যুদিনটায় ঠাকুর্দার কবরে ফুল দিতে যায়। বিরসাকে আর সবাই ভুলে গেলেও তার এই মাতাল নাতিটা ঠিক মনে রেখেছে। বোটরা মাঝে মাঝে লক্ষ করে, এখনকার মজুররা মাথায় ছ'খানা করে ইট নিয়ে যায়, আটখানা নয়। ক্লাবটির আরও অধঃপতন হতে হতে উঠেই যায় এক সময়, সে বাড়িটাকেও ভেঙে ইট-কাঠগুলো বিক্রির প্রস্তাব ওঠে। বোটরা এর মধ্যে গাড়ি চালানো শিখে নিয়েছে, ড্রাইভারের চাকরি পেয়েছে, কিন্তু ওই জায়গাটা ছেড়ে সে

কিছুতেই যাবে না। অথচ এবার তাকে যেতেই হবে। শেষবারের মতন ঠাকুর্দার কবরে ফুল দিয়ে আসে বোটরা, তারপর গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট করে সে ওই ভূতপূর্ব আণ্টা বাংলার সামনেই মারা যায়। সামনের নতুন তৈরি রাস্তাটার গোটা আষ্টেক ইট খসে গেছে তার গাড়ির ধাক্কায়।

অত্যন্ত শান্ত, ধীরভাবে এগিয়েছে গল্পটি। অসম্ভব সংযমের পরিচয় দেখিয়েছেন লেখক, কোথাও আবেগ-উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নেই। এই গল্পের গঠনে যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন সতীনাথ, তার তুলনা পাওয়া ভার।

এই 'আণ্টা বাংলা' গল্পটির একটি বিচিত্র সমালোচনা লিখেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি এক শ্রেণীর সমালোচকদের মুখপাত্র বলা যায়। নীরেন্দ্রনাথ রায় সতীনাথের প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়েও আণ্টা বাংলা গল্পটি পড়ে 'শঙ্কিত' বোধ করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই ধরনের গল্প লিখলে সতীনাথের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে। 'গণনায়ক' গল্পে কিছু-কিছু কংগ্রেসীর এবং গান্ধী টুপি পরিহিত নেতাদের স্বরূপ ফুটেছে বলে তিনি খুশি কিন্তু 'আণ্টা বাংলা' গল্পটি তাঁর পছন্দ হয়নি। কারণ, সতীনাথ অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জনগণের কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের আভাস দেখাননি। তাঁর মতে, 'দুর্বার শ্রেণী সংগ্রাম, নিষ্করুণ আততায়িত্ব, শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান, কেবল যাহারই পরিণামে রচিত হইতে পারে শ্রেণীহীন সমাজ ও শান্তিময় পৃথিবী', এইসবও এই গল্পে দেখানো অপরিহার্য ছিল।

একজন লেখকের গল্পে দুর্বার শ্রেণী-সংগ্রাম কিংবা বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের কথা লিখলেই কি ওইসব ব্যাপারগুলি সংঘটিত হত? সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও গল্পটি যে একেবারে নষ্ট হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ধরনের সমালোচকদের পরামর্শে বাংলার রাশি রাশি গল্প-উপন্যাস নিছক অপাঠ্য-অসার রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। সেসব গল্প-উপন্যাসের শেষ দিকে একদল দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষ কৃত্রিমভাবে উদ্দীপিত হয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় একটা লাল সূর্য উঠত। সেই সূর্য কতটা আশার বাণী শোনাতে পেরেছে তা জানি না, কিন্তু সাহিত্যকে আলোকিত করতে পারেনি। সাহিত্যিকদের রচনার বিশ্লেষণ করবেন সমালোচকরা, কিন্তু তাঁদের উপদেশ দেবার অধিকার যে সমালোচকদের নেই, তা অনেকে ভুলে যান।

আণ্টা বাংলার রচনারীতিই একে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই গল্পের এমনকী শ্লেষ গোপন করেছেন সতীনাথ। বিরসা, বোটরা, তার মায়ের ব্যর্থ জীবনের প্রতিটি ঘটনাই পাঠকদের বুক মুচড়ে দেয়, সমাজের এই দুঃখী মানুষগুলি, যাদের দুঃখ-বোধ পর্যন্ত নেই, তাদের জন্য নীরব হাহাকার যেন ছড়িয়ে আছে প্রতিটি লাইনে, এর জন্য লেখকের কোনও মন্তব্যেরও প্রয়োজন হয় না। এর চেয়ে বেশি প্রতিবাদ জানাতে গেলে তা মেঠো বক্তৃতা হয়ে যায়, সাহিত্য হয় না।

জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যে-সব সমালোচকরা, তাঁরা সতীনাথের পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক

কাহিনী ছেড়ে সতীনাথ যখন মানুষে মানুষে জটিল সম্পর্ক ও হৃদয় রহস্য নিয়ে লিখতে লাগলেন, যেমন 'অচিন রাগিণী' কিংবা 'সংকট', তখনই অনেকে বিমুখ হলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের টুকিটাকি কিংবা প্রেম ভালবাসার কাহিনী এককালে অনেক সমালোচকের কাছে বিষবৎ মনে হত। প্রেম বাদ দিলে যে সাহিত্যের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তা অনেকেই বুঝতে চান না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর পরবর্তীকালের গল্পগুলি আকারে ছোট হতে থাকে এবং মৃদু শ্লেষের বদলে তীব্র, তির্যক ব্যঙ্গের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এককালে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে নিভৃতে, নিজের বাড়িতে বাগানের পরিচর্যা করতে করতেও রাজনীতি থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেননি। এককালের দেশ-সেবকদের দেশ-শোষকের ভূমিকা, সরকারি অফিসের অনাচার বিষয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছেন। 'চরণদাস এম এল এ', 'মা আম্র ফলেষু', 'পরকীয় সন-ইন -ল' ইত্যাদি এই জাতীয় গল্প। আবার কিছু কিছু গল্প বিশুদ্ধ কৌতুক রসের, যেমন 'পরিচিতা', 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ', 'পত্রলেখার বাবা' ইত্যাদি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, কৌতুকরসের গল্প লেখা বেশ কঠিন তো বটেই, সকলের হাতে খুলতেও চায় না, কিন্তু আমাদের সমালোচকরা এই ধরনের গল্পকে গুরুত্ব দেন না। তাঁরা সব সময় বক্তব্য খোঁজেন।

কোনও কোনও গল্প একবার পড়লেই সারা জীবনের মতন মনে দাগ কেটে যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্তত তিনটি গল্প আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে আছে। 'চকাচকি' তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ দুবে আর তার ষাট বছরের স্ত্রী দুবেনীর প্রেমকাহিনী। পরস্পারের সঙ্গে মধুর খুনসুটি সব সময় লেগেই আছে। দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যেন কিশোর-কিশোরীর মতন। পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পে লেখক এঁদের সম্পর্কে মুগ্ধ ছিলেন, তবু একদিন জানতে পারলেন, এই প্রেমের মধ্যেও একটা পাপ-বোধ আছে, এরা বিবাহিতা নয়, বহু বছর আগে দুবে তার স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে এই দুবেনীকে নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধে। অথচ কী নির্মল, নিষ্কলুষ দুই নারী পুরুষ, প্রেম এদের জীবনকে বিশুদ্ধ করেছে। তবু দুবে যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন দুবেনী তাকে ছেড়ে চলে যায়, এও প্রেমেরই এক দিক, কঠিন আত্মত্যাগ। মৃত্যুশয্যায় ছেলের হাতে জল পাবে না দুবে, তা কি হয়? দুবেনী তাই দূরে সরে যায়। ডেকে আনা হয় দুবের প্রথম পক্ষের ছেলেকে। কিন্তু কোথায় যাবে দুবেনী? ওরা যে অবিচ্ছেদ্য, দুবেকে যখন চিতায় তোলা হয়েছে, তখন শ্মশানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে অল্প শব্দ হয়। কোনও শেয়াল, না এক অশ্রু-কম্পিতা বৃদ্ধা?

দ্বিতীয় গল্পটি কোনও শারদীয় সংখ্যায় পড়েছিলাম 'স্বর্গ-নরকের দুয়ারে' এই নামে। এখন সেটি 'সংকট' উপন্যাসের একটি অধ্যায়। 'সংকট' বইখানি উপন্যাস না গল্পগ্রন্থ তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। অশ্রুত বাণী দিয়েও অনেক কিছু বলা যায় কিনা, এই গল্পে যেন তারই পরীক্ষা করা হয়েছে। মূল বিষয়টি যৌনতা, এক অপরিণত মস্তিষ্ক যুবকের যৌন জাগরণের, যার একদিকে মা ও অন্যদিকে ভ্রাতৃবধূ,

কিন্তু কী অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে এই কঠিন বিষয়টিকে গল্পে এনেছেন সতীনাথ। স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে দোদুল্যমান কয়েকটি মুহূর্তে এই গল্পের পরিণতি।

তৃতীয় গল্পের নাম 'বৈয়াকরণ'। এখানেও যেন কত সামান্য একটা কথাকে কত মহৎ প্রশ্ন করে তোলা যায়, তার একটি দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে সতীনাথ গল্প রচনা করেছেন। কোনও লেখকের সঙ্গেই অন্য কোনও লেখকের তুলনা করা যায় না। যে-যার নিজস্ব ধরনে বিশিষ্ট। তবু এক একটি লেখা পড়লে মনে হয়, এমনটি বাংলা ভাষায় অন্য কোনও লেখকের হাতে আসা যেন সম্ভব ছিল না। 'বৈয়াকরণ' সে রকম একটি গল্প। একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের শালা ও তার স্ত্রী এসেছিল বেড়াতে। স্টোভ জ্বালাবার সময় অসাবধানে সেই যুবতী বধূটির শাড়িতে আগুন ধরে যায়। আগুনের দাহে তার সর্বাঙ্গ বীভৎস হয়ে গেল, শুধু মুখে কোনও আঁচ লাগেনি। প্রাণপণ চিকিৎসায় তাকে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু বধূটির নিজেরই আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। একজন সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, তোমার সবটা তো পোড়েনি, এখনও মুখখানা কত সুন্দর আছে! তা সে শুনতে চাইল না। শেষনিশ্বাস ফেলার আগে হৃদয় নিঙড়ে সে বলে গেল, 'ওরা কি ওই চায়...'।

আগুনে পোড়ার ঘটনাটি আছে অতি সংক্ষেপে, কয়েক লাইনে, মৃত্যুপথযাত্রিণীর ওই শেষ কথাটাই মূল গল্প। কী বলতে চেয়েছিল মেয়েটি? পণ্ডিত ধাঁধায় পড়ে যান। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবার সময় ওই কথাটাই তাঁর মাথায় ঘোরে। ওরা মানে কারা, তারা কী চায়? স্বামী সম্পর্কে হয়তো ক্ষোভ ছিল নারীটির, কিন্তু বহুবচন ব্যবহার করল কেন? সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘেঁটেও এর উত্তর পাওয়া যায় না। হঠাৎ একদিন ক্লাসরুমে একটি ছাত্রীকে পড়াতে পড়াতে পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, এই 'ওরা' শব্দের মধ্যে তিনি নিজেও পড়ে যাচ্ছেন।

এই সব গল্প বারবার পড়লেও আশ মেটে না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাঁর 'জাগরী' ছাড়া অন্যান্য বইগুলি দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। জাগরীর কৃতিত্বে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাঁর আর সব রচনা। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা গ্রন্থগুলিতে, বিশেষত ছোটগল্প বিষয়ক রচনায় সতীনাথ ভাদুড়ীর উল্লেখ নিতান্ত দায়সারা গোছের। জাগরীর জন্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত কিংবা গোপাল হালদারের মতন সমালোচক পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের তেমন আলোচনা পাওয়া যায়নি। সতীনাথের বইগুলিও দুর্লভ হয়ে পড়ায় সনাতন পাঠক নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকার কলামনিস্ট কয়েকবার সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে লেখালিখি শুরু করে এবং তাঁর সমস্ত রচনা পুনঃপ্রকাশের দাবি জানান। উক্ত সনাতন পাঠকের পরিচিত এক প্রকাশক তাতে আগ্রহী হয়ে, অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনাবলী সযত্নে প্রকাশ করেন চার খণ্ডে। সম্পাদনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে এই সম্পাদকদ্বয় সতীনাথ সম্পর্কে বহু তথ্য, গ্রন্থ সমালোচনা, অন্যদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেছেন। উপরন্তু পাওয়া গেছে সতীনাথের মূল্যবান ডায়েরি, তাঁর অপ্রকাশিত অনেক রচনার খসড়া।

চার খণ্ডের এই সমগ্র রচনাবলী পাঠকরা গ্রহণ করেছেন। একাধিক সংস্করণ

হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয়, সমালোচকরা ঔদাসীন্য দেখালেও একালের পাঠকদের সমাদর পেয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালের লেখকদের জন্যও সতীনাথ অবশ্যপাঠ্য।

॥ ৩ ॥

কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ধাঁধা। এরকম কোনও লেখক হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, অথচ সত্যিই কমলকুমার মজুমদার নামে একজন লেখক বেশ কয়েক বছর বাংলা সাহিত্যে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করে গেছেন। সাহিত্য নিয়ে তিনি কি ছেলেখেলা করতে চেয়েছিলেন, না সাহিত্য তাঁর অস্থি-মজ্জায় মিশে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। আমি তাঁকে প্রায় কৈশোর বয়েস থেকে দেখেছি, বহু বছর তাঁর সঙ্গলাভ করেছি, তবু মানুষটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁর রচনাগুলির মতনই রচয়িতাটিও দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। যদিও আপাতত তিনি ছিলেন হাস্যময়, রসিকতামুখর, বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মিশে থাকত আদিরসাত্মক বাক্য। একটা কথা আছে যে, প্রকৃত বিদগ্ধ তাঁকেই বলে যাঁর মস্তিষ্কটি হবে অ্যারিস্টটলের মতন আর মুখের ভাষা হবে চাষার মতন। কলেজ স্ট্রিট এবং ওয়েলিংটন অঞ্চলে বহু দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে, কখনও পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি কখনও ফৈয়াজ খাঁর গান, কখনও গ্রাম্য শিল্পীদের ডোকরার কাজ, কখনও মার্সেল প্রুস্তের রচনা, কখনও দুবরাজপুরের ডাকাতদের চরিত্র, কখনও রামপ্রসাদী গানের ভাষা ব্যবহার, কখনও উইলিয়াম ব্লেকের কাব্য, কখনও সোনাগাছির গণিকাদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া, কখনও যামিনী রায়ের ছবি ইত্যাদি বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ে কথা বলতেন। তখন আমাদের মনে হত, আমাদের কাছে তিনি যেন অ্যারিস্টটলের মতনই এক চলন্ত শিক্ষক এবং তাঁর মুখের ভাষা অতি জীবন্ত, অর্থাৎ যাকে বলে কাঁচা বাংলা। অথচ তিনিই যখন নিজের লিখিত রচনার কয়েক পাতা শোনাতেন, সে ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যেত।

মানুষটির মধ্যে বৈপরীত্য ছিল অনেক। আমাদের সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ছিলেন নাট্য পরিচালক। চমকপ্রদ ছিল তাঁর নির্দেশনা। আমরা অবশ্য নাট্য-অভিনয় নিয়ে বেশিদিন মেতে থাকিনি, কিন্তু কমলকুমার পরবর্তীকালেও নাট্য প্রযোজনায় অনেক নতুন পরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব প্রমাণিত হলেও কখনওই শখের প্রযোজনার বাইরে গেলেন না, বড় রকমের কোনও উদ্যোগ কিছুতেই নিলেন না। বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে কমলকুমারের নাম লেখা থাকবে কিনা জানি না। এক সময় আমরা তাঁকে সর্বক্ষণ কাঠখোদাই করতে দেখেছি। জলরঙের ছোট ছোট ছবিও এঁকেছেন, চাইনিজ ইঙ্কে বহু স্কেচ করেছেন। এটাও মনে হয়েছিল তাঁর শখ, কিন্তু পরে জানা গেল, শিল্পী হিসেবে অসাধারণত্বের লক্ষণ ছিল তাঁর মধ্যে। মন দিয়ে শুধু ছবি আঁকলে শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হতে পারতেন। আমি নিজে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষের মুখে এমন কথা শুনেছি। কিন্তু কমলকুমার ছবি আঁকায় তেমন মন দিলেন না।

তবে কি সাহিত্যের জন্যই নিবেদিত ছিল তাঁর মন-প্রাণ? সেখানেও তো হেলাফেলার ভাব। দু' একটি উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে যখন কমলকুমার আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, আমাদের মনে হয়েছে এমন বর্ণাঢ্য, এমন উচ্চস্তরের রস, সম্পূর্ণ নতুন বাক-বিভূতিসম্পন্ন রচনা আমাদের অভিজ্ঞতায় আর নেই, তখনই কমলকুমার যেন ইচ্ছে করে তাঁর পাঠকদের দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। পুরস্কার কিংবা অর্থাগম সম্পর্কে নির্লোভ এবং মোহমুক্ত থাকতে পারেন কোনও কোনও লেখক, কিন্তু এমন লেখক কি সম্ভব, যিনি পাঠক চান না?

কলকাতার একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে কমলকুমার মজুমদার সুপরিচিত ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কাছে ফরাসি ভাষা শিখেছেন, বিজ্ঞাপন জগতের কেউকেটারা ছিলেন তাঁর আড্ডার সঙ্গী, কিন্তু তাঁরা অনেকেই কমলকুমারের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বোধ হয়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে পছন্দ করতেন, কিন্তু তাঁর রচনার স্বাদ পাননি। সিগনেট প্রেস ছিল এক সময়ে কলকাতার সবচেয়ে রুচিসম্পন্ন এবং জমজমাট প্রকাশক। প্রবীণদের সঙ্গে সঙ্গে নবীনদের গ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করতেন। সেই সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কমলকুমারের হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু দিলীপকুমার গুপ্ত নিশ্চিত কমলকুমারের লেখক পরিচিতি জানতেন না, জানলে অবশ্যই তিনি কমলকুমারের কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করতেন। আমাদের ঠিক আগের প্রজন্মের লেখকেরা, যাঁরা কমলকুমারের মোটামুটি সমবয়েসি, তাঁর কেউ কমলকুমারকে লেখক হিসেবে গণ্য করেননি। এ এক বিচিত্র ব্যাপার, বাংলা ভাষার একজন প্রধান লেখককে তাঁর সমসাময়িক লেখকরা চিনতেই পারলেন না।

কয়েকটি উদাহরণ দিই। বাংলা ছোটগল্পের দিকপাল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন আমার অতি প্রিয় লেখক। একটি ছোট পত্রিকা অফিসে এক সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সহকর্মী ছিলাম আমি। আমার খুব সাধ হয়েছিল, আমার দুই প্রিয় লেখককে এক জায়গায় মেলাই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তখনও পর্যন্ত কমলকুমার সম্পর্কে জানতেন না কিছুই। প্রস্তুতির জন্য আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে এক্ষণ পত্রিকার একটি কপি দিলাম, যাতে কমলকুমারের 'গোলাপ সুন্দরী' নামে অসাধারণ গল্পটি ছাপা হয়েছিল। কয়েকদিন পর তিনি বললেন যে পত্রিকাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। দিলাম আর একটি কপি। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, পত্রিকাটি তিনি বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে ফেলে গেছেন। নাছোড়বান্দা আমি, জোগাড় করলাম এক্ষণ পত্রিকার আর একটি সংখ্যা। এবার আমি কিছু জানতে চাইবার আগেই তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি, পড়েছি। বেশ ভাল লেগেছে। বুঝলাম, তিনি পড়েননি কিংবা পড়তে পারেননি, তাঁর কিছু অসুবিধে হয়েছে। গোলাপ সুন্দরী যে সম্পূর্ণ পড়েছে, তার পক্ষে এ রকম হালকা মন্তব্য করা সম্ভব নয়। এর পরে একদিন ওই দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দু'জনেই অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীতভাবে কিছু অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, ভাব জমেনি একেবারেই।

সন্তোষকুমার ঘোষ, যিনি ছাপার অক্ষরে বাংলা ভাষার যাবতীয় রচনা পড়তেন,

তিনি একদিন বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কমলের লেখা আমি এক পাতার বেশি পড়তে পারি না। তোমরা যে কেন ওকে নিয়ে এত হইচই করো। কোনও এক বছর সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণার পর আমরা একবার কৃত্তিবাস পত্রিকায় উষ্মার সঙ্গে লিখেছিলাম, কেন কমলকুমারকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না। সেই সংখ্যাটি পড়ে তখনকার জনপ্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে সরল কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই কমল মজুমদার কে?

কমলকুমারকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ কবি-গল্পকারেরা। মতিলাল পাদ্রী ও তাহাদের কথা, মাত্র এই দুটি গল্প ছাপা হয়েছিল দেশ পত্রিকায়, তা ছাড়া কমলকুমারের সমস্ত গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে শুধু বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে। লিটল ম্যাগাজিনগুলি তরুণদেরই রণক্ষেত্র, সেই তুলনায় কমলকুমার যথেষ্ট বয়স্ক। লিটল ম্যাগাজিনের মাপে আঁটে না এমনই বিরাট লেখক তিনি। কোনও একটি স্বল্পখ্যাত ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা'। সেই পত্রিকার অন্য আর সব রচনার সঙ্গে কমলকুমারের উপন্যাসটির যেন আকাশপাতাল তফাত। পত্রিকাটি থেকে শুধু নিজের উপন্যাসের অংশটি ছিঁড়ে নিয়ে কমলকুমার আলাদা সাদা মলাট দিয়ে সেলাই করেছিলেন, তারপর তার এক একটি কপি তিনি উপহার দিয়েছিলেন বিশেষ পরিচিতদের। তিনি বলেছিলেন, মাত্র একশো জন পাঠক হলেই তাঁর চলবে। জীবিত অবস্থায় খুব সম্ভবত একশো জনের বেশি আন্তরিক পাঠক তিনি দেখে যেতে পারেননি। এখন তাঁর সুমুদ্রিত একটি গল্পসমগ্র পাওয়া যায়, কিছু কিছু পাঠক সেটি গ্রহণও করেছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি খুবই দুর্লভ।

তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈপরীত্যের উদাহরণ দিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলির আলোচনা শুরু করা যাবে। যতদূর জানি, কমলকুমার দু'খানি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। একটির নাম 'তদন্ত'। সেটা বেশ সস্তা ধরনের রহস্য রোমাঞ্চ পত্রিকা। দারোগার দফতর ও খুন-জখমের কাহিনী তাতে ছাপা হত, অধিকাংশ লেখা তিনিই লিখতেন বেনামীতে। তাঁর ধারণা ছিল, ওই কাগজ চালিয়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হবে। হল না। অচিরেই সে কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পর তাঁর অতি অনুরক্ত সঙ্গী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় কমলকুমার বার করলেন আর একটি পত্রিকা, 'অঙ্ক ভাবনা'। উচ্চাঙ্গের গণিত এবং মেটাফিজিক্সের আলোচনা ছাড়া তাতে অন্য কিছু স্থান পেত না। একই ব্যক্তি একবার রগরগে গোয়েন্দা পত্রিকার সম্পাদনা করছেন, পরে আবার উচ্চাঙ্গের গণিত ও মেটাফিজিক্সের পত্রিকা, এ রকম আগে কখনও শোনা গেছে!

যৌবন বয়েসে কমলকুমার গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু মধ্য বয়েসে। 'মল্লিকা বাহার' তাঁর প্রথম দুঃসাহসী, চমকপ্রদ গল্প। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লেখার কথা বাংলায় আগে কেউ চিন্তাও করেননি। গল্পের ভাষা দেখেও বোঝা যায়, এ আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষা নয়, বিশুদ্ধ বর্ণনারীতি এর মধ্যে নেই, এর বাক্য গঠন ভিন্ন জাতের। "এখনও মল্লিকার আবক্ষ, সে

আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে অদ্য নিরীক্ষণ করে; কেমনধারা মুখটা হয়ে আছে যে তার, অথবা পুরুষোচিত ক্লান্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্র্যাকেটে, ওটা পাউডার এটা কাজল এটা এসেন্সের শিশি, তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল টসটসে ফিতে, কিছু কাঁটা—এ সকলই সদ্য মৃত কোনও জনের সমারোহ বা; আর যে, এই পুরুষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এ সকল যে, ম্রিয়মাণ, নিষ্ক্রিয়।" এই গদ্য বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। অথচ অনাস্বাদিতপূর্ব একটা ব্যঞ্জনা যে রয়েছে তা-ও ঠিক।

'মল্লিকা বাহার'-এর আগের পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প, 'লাল জুতো' এবং 'জল'। যতদূর জানা যায়, 'লাল জুতো' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। এটাকে একটা মধুর কৈশোর প্রেমের গল্প বলা যায়, যদিও গতানুগতিক প্রেমের গল্পের চেয়ে আলাদা। এই গল্প পাঠ করে কমলকুমারের ভবিষ্যৎ রচনাধারা কোন দিকে যাবে তা অনুমান করা যায় না। কিন্তু 'জল' গল্পটি এক পথিকৃৎ লেখককে চিনিয়ে দেয়। এটা বন্যাপীড়িতদের গল্প। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর বন্যার গল্পের চেয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে অন্যরকম। বন্যায় সব ডুবে গেছে, পেটে ভাত নেই, ঘরের চালা ফুটো, এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই অসহায় দুটি মানুষকে, নন্দ আর ফজল। আর কোনও উপায়ান্তর নেই দেখে এই ধর্মভীরু, দুর্বল মানুষ দুটি ডাকাতি করবে ঠিক করল। গভীর রাতে উঁচু বাঁধ দিয়ে হেঁটে আসছে এক বৃদ্ধ ও বালক, এরাও ওই দু'জনেরই মতন দরিদ্র ও অসহায়, আজকেই ওই পূজুরী বামুনটি এক ধনীর বাড়িতে পুজো করে কিছু চাল-কলা-সন্দেশ পেয়েছে এবং বালকটি কুইনিন চুরি করেছে। এরা হাঁটছে ভয়ে ভয়ে, আর ডাকাত দুটিও তো আসলে ভীতু, কোনও বলশালী, অস্ত্রধারী পথিককে আক্রমণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। পাছে ভুল করে ওরা নিজেদের নাম ধরে ডেকে ওঠে, তাই ছদ্মনাম নিয়েছে কানাই। দু'জনেই কানাই। পাপবোধ থেকে এই কানাই যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে যায়। সব দোষ কানাই-এর। "পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুনে নি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।...সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু ফজল থতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই।"

'জল' গল্পেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেখকের বাংলা গদ্য অন্য চালে চলতে শুরু করেছে।

'মল্লিকা বাহার' শুধু ভাষা ব্যবহারের জন্যই নয়, বিষয়বস্তুতেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। পুরুষের নিঃসঙ্গতা বোধ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, একজন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন নারীর সম্পর্কের কথাও সাহিত্যে নতুন নয়। 'মল্লিকা বাহার' গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি এসবের বিপরীত। হঠাৎ একদিন মল্লিকা নামের যুবতীটি একটি চাকরির চিঠি পায়। এবার থেকে সে স্বাধীন হবে। কিন্তু একথাও তার মনে পড়ে যে, এরপর আস্তে আস্তে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে। তার কোনও সঙ্গী নেই। সে নিঃসঙ্গ কিন্তু এর আগে কোনও যুবককে সে কাছে আসতেও দেয়নি। সে তখন বাড়ি থেকে

বেরিয়ে পড়ে তার পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেই সব পুরুষরা কেউ সংসারী, কেউ অতি সাধারণ হয়ে গেছে। কেউ মল্লিকাকে দেখে ভয় পায়। পথে দেখা হল শোভনাদির সঙ্গে। এই শোভনাও চাকরি করে। একলা চলাফেরা করে কিন্তু পুরুষদের ধার ধারে না। শোভনা মল্লিকার হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। গ্রীষ্মকাল। ছাদে গিয়ে মাদুর পেতে বসল দু'জনে। বেলফুলের মালা জোগাড় করে আনল শোভনা। গরমের জন্য সে গায়ের জামা খুলে ফেলল। তাদের পুরুষ বন্ধু নেই, কিন্তু এই দুই রমণী তো পরস্পরের বন্ধু হতে পারে। সেই বন্ধুত্বে শরীরই বা বাদ যাবে কেন? সোহাগ করে মল্লিকার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তার মুখ চুম্বন করে শোভনা। মল্লিকা আবেশে বিহ্বল হয়ে যায়। শোভনার মুখনিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লেগে থাকে।

পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছিলেন 'সোনার চাঁদ' নামে গল্প। দুই নারীর পরস্পরের প্রতি শারীরিক আকর্ষণের গল্প বাংলায় আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না। প্রখ্যাত উর্দু লেখিকা ইসমৎ চুঘতাই খানদানি মুসলমান পরিবারের নারীদের মধ্যে লেসবিয়ানিজ্‌মের কাহিনী লিখে প্রচুর শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। কমলকুমারের 'মল্লিকা বাহার' নিয়ে যে এ দেশের নীতিবাগীশেরা খড়্গহস্ত হননি, তার কারণ, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্প অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়েননি, পড়ার চেষ্টা করলেও অনেকে বোঝেননি।

'মতিলাল পাদ্রী' এবং 'তাহাদের কথা' গল্প দুটিতে কমলকুমারের ক্ষমতা এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিকশিত। বাংলা লেখার সব রীতিনীতি ভেঙে দিচ্ছেন তিনি। এতাবৎকাল সমস্ত কাহিনী লেখা হয়েছে ন্যারেটিভ স্টাইলে, ঘটনা পরম্পরায়। কিন্তু কমলকুমারের রচনায় যখন তখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলেমিশে যায়। ইদানীং বিদেশে ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম নামে একটা কথা চালু হয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কমলকুমারের এই সব গল্পে। চরিত্র ও পটভূমির বাস্তব নিছক চাক্ষুষ নয়, মানুষগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। কমলকুমারের সংলাপের ব্যবহারও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণ বাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এক একটা বাক্যের অর্ধেক কিংবা কয়েকটি শব্দেই সব বুঝিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

'তাহাদের কথা' গল্পটি মর্মন্তুদ হয়েছে প্রধানত এর আঙ্গিকের জন্য। দেশের জন্য অনেক ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন শিবনাথ, জেল খেটেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, দেশ বদলে গেছে, স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার যোদ্ধাদের আর মূল্য নেই। এসব দেখেশুনে শিবনাথ পাগল হয়ে গেলেন। উচ্চশিক্ষিত মানুষটা একেবারে বদ্ধ পাগল, পথে পথে ঘোরেন, পরনের কাপড়ের ঠিক থাকে না। ছেলেরা ঢিল মারে, সবাই দূর দূর করে। কোনও রকম উপার্জন নেই বলে তাঁর কিশোরী মেয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে কাজ নিয়ে লালসার শিকার হয়, ছোট ছেলে জ্যোতি বাবাকে বাঁচাবার জন্য সব সময় খোঁজাখুঁজি করে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে শিবনাথের হাত-পা শিকলে বেঁধে রাখা হবে, জ্যোতি তা কিছুতেই মানতে চায় না। এই নির্মম কাহিনীটি বেশি মর্মস্পর্শী হয়েছে, কারণ তা দেখানো হয়েছে ওই ছোট ছেলেটির

চোখ দিয়ে। সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এক বালকের অভিমান। এই সব গল্প সাধারণত রুক্ষ ধরনের হয়, কিন্তু এ গল্পের কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে যে কবিত্ব, তা আরও বেদনাবোধ জাগায়। জ্যোতির বাবাকে জন্তুর মতন শিকলে বাঁধা হবে, দেশের জন্য কারাবাসের পুরস্কার হিসেবে পুনরায় বন্দীদশা, ওদিকে এক ব্যবসায়ী, আত্মরাম মারোয়াড়ি পুণ্য অর্জনের জন্য খাঁচার পাখিকে মুক্তি দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। সেই অংশটি এ রকম: "আত্মরামবাবু এখানে উপস্থিত, ঠিক কাঁটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুখে তাঁর অনর্গল শ্লোকধারা। তাঁর পায়ের কাছে বেনারসী পাখমারা। ছেঁড়া জুতোর মতন মুখটা সকল সময়েই আড়াল করে, এটা তাদের মুদ্রাদোষ। এখন সে আঁঠারু লতার ঢাউস ঝুড়িটার মধ্যে হাত দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে কিছু নিশ্চয়ই খুঁজছিল। সহসা বলে উঠলো, আকাশ পাবি গো, ডর কি রে, আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরাণ। এবং অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে একটি পাখি বার করে আনলো। একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছুভাগ, বনের কিছুভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি। অনেকেই পাখি দেখে নমস্কার করেছিল।"

এই পর্যায়ের একটি অত্যন্ত নিখুঁত, সুন্দর জোরালো গল্প 'কয়েদখানা'। ভাষার নিখুঁত কারিগরি সৌন্দর্যে গল্পটি ঝলমল করছে। জগদীশ গুপ্ত কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁদের চরিত্রগুলির চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন না, দু'এক আঁচড়ে কিছুটা আন্দাজ দেন শুধু। কিন্তু কমলকুমার একজন শিল্পী, দৃশ্যগুলিকে ছবির মতন ফুটিয়ে না তুললে তাঁর তৃপ্তি নেই। এই গল্পে ঘোড়সওয়ার শাজাদকে আমরা প্রথম দেখি এই ভাবে: "জলাশয়ে মুক্তকেশী অন্ধকার। সুন্দর ভাট গাছ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া ডাল, সেখানে ঘোড়াটি—মাটির আধো সবুজ ঘোড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভাট ফুলের কমলালেবু রং অটুট হয়ে উঠল। ঘোড়াটি মুখ তুলে সুলক্ষণ কানদুটি খাড়া করে। ল্যাজটি নড়ল। কেশর স্থানচ্যুত হয়।

"টিলার লোকটি তাকে দেখল। লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবি তীরেলা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেট্টি, তার গায়ে নকশা করা ভারি কাঁথা ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা, কড়া হাঁটু—তার পাশেই আঁটিলি মাংসপেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত। কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে। হাতে হাত মিলাল, লোকটি অবাক হয়ে ঘোড়াটিকে দেখল, সম্পূর্ণ ছবি।" সব দৃশ্যই এরকম ছবি। পরিবেশের ইজেলে তেলরঙে আঁকা।

কাহিনীটি উন্মোচিত হচ্ছে খুব ধীর লয়ে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির কিছু অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রথমে। তারপর জানা যায় কাছাকাছি বড় গ্রামে জমিদার এসেছে। নতুন জমিদার, এখনও জমিদারি হালচাল পুরো রপ্ত হয়নি। পাছে লোকে তাকে আনাড়ি মনে করে তাই সে অবিরাম মদ গিলে গিলে যখন তখন হুমকি দেয়, বাইজি ও রক্ষিতা এনেছে ঠিকঠাক, মাঝে মাঝে বন্দুক তুলে শূন্যতাকে ভয় দেখায়। সে জানে যে জমিদারকে অত্যাচারী হতে হয়, না হলে লোকে মানে না। সেই ঝোঁকে সে হুকুম জারি করে দিল যে আমাদের পূর্ব পরিচিত শাজাদ ও অন্যান্য গরিব মানুষগুলোকেও এখন থেকে খাজনা দিতে হবে। যদিও ওই গ্রাম, রুনুখগাঁ, শুকনো

ডাঙা জমিতে ভরা, সেখানে কোনওদিন খাজনা লাগেনি। ঘোষণা শুনে বিস্মিত ভয়ার্ত মানুষগুলো জমিদারের কাছে দরবার করতে আসে। জমিদার মোহনগোপাল ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবে যে দয়া দেখানো মানেই দুর্বলতা। রুনুখগাঁ'র সামান্য খাজনায় তার প্রয়োজন থাক বা না থাক, এইসব প্রজাদের রাখতে হবে পায়ের নীচে। প্রথমেই সে জমিদার বাড়ির সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান কয়েদখানাটা দেখে আসতে বলে প্রজাদের। তারপর মাতলামির ঝোঁকে, নিতান্ত অকারণে শাজাদের ঘোড়াটিকে গুলি করে মারে।

নিরীহ, অসহায় প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী আমরা অনেক পড়েছি। এককালে এই সব জমিদারদের চেহারা ছিল ফর্সা, নাদুস নুদুস। ক্রমে এদের রং কালো হতে থাকে। এক শ্রেণীর লেখক এই সব জমিদারদের গায়ে কালো রঙের পোঁচ লাগাতে লাগাতে একেবারে কুচকুচে কালো, সমস্ত দোষে ভরা একটা জড় মূর্তি করে তোলেন। আর গরিবরা ফর্সা হতে থাকে। গরিব বা নিপীড়িত হলেই সাদা। জমিদার বা কারখানার মালিক বা শোষকশ্রেণীর সবাই কালো, আর শোষিত কৃষক-মজুর-বস্তিবাসী সবাই সাদা। লেখা হতে লাগল এই কালো আর সাদাদের লড়াইয়ের কাহিনী, দ্রুত তা একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হল। সম্পূর্ণ সাদা আর সম্পূর্ণ কালো। এই একরঙা মানুষদের নিয়ে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না।

এই গল্পে অবশ্য শাজাদ ও তার সঙ্গীরা মুসলমান-হিন্দুদের একটি মিশ্রিত দল দ্বিতীয় বার সাহস সঞ্চয় করে ফিরে এসেছে এবং আঘাত হেনেছে। প্রিয় ঘোড়াটিকে মারার প্রতিশোধ নিতে শাজাদ হত্যা করেছে ওই জমিদারকে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিশীল গল্পের সঙ্গে এই কাহিনী বিন্যাসের কোনও মিল নেই। এখানে লেখক ওই নব্য জমিদার মোহনলালের মধ্যে মৃত্যুবীজ আগেই দিয়ে দিয়েছেন। তার হাবভাব সব কিছুই বেমানান। যুগ বদলাচ্ছে। এখানে এই জমিদার শ্রেণীর বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। মোহনলাল নিজেও যেন জানে যে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে যেন জমিদারের ভূমিকায় এক ব্যর্থ অভিনেতা। তার মাতলামি তার নারী সম্ভোগের দেখানেপনা, তার বন্দুক নিয়ে আস্ফালন, এ সবই যেন তার মৃত্যুর আগে হাত-পা খিচুনি। শাজাদ এসে তার মাথায় আঘাত করার সময় সে কোনওরকম প্রতিরোধের চেষ্টাও করে না। এরকম চরিত্রচিত্রণের তাৎপর্য অনেক গভীর। 'কয়েদখানা' কিংবা 'নিম অন্নপূর্ণা'র মতন গল্পই সত্যিকারের প্রগতিশীল রচনার আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। এই পর্যায় পর্যন্ত গল্পে কমলকুমার আশ্চর্যরকম অসাম্প্রদায়িক। বেশ কয়েকটি হিন্দু-মুসলমান চরিত্র এসেছে, এমন স্বাভাবিকভাবে তারা মিলেমিশে আছে যে তাদের আলাদা করে চেনাই যায় না। যারা সবাই একই ধরনের গরিব, তাদের হিন্দুত্বে-মুসলমানত্বে কী যায় আসে?

'রুক্মিণীকুমার' ও 'লুপ্ত পূজাবিধি' থেকে কমলকুমারের লেখায় হঠাৎ এক পরিবর্তন এসে গেল। যে কোনও সাহিত্যের ইতিহাসেই এ রকম অদ্ভুত ঘটনা কৃচিৎ ঘটে।

সকলেরই জানা আছে যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যে সাধু ক্রিয়াপদ দিয়ে

বাংলা লিখতেন, প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগে তার একটা মোড় ঘুরে যায়। লিখিত ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য দেবার জন্য চলিত ক্রিয়াপদ এসে যায় প্রথমে গদ্যে, তারপর কবিতাতেও। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এটা গ্রহণ করায় সকলের মেনে নিয়ে সুবিধে হয়েছিল। তবু পুরোপুরি চালু হতে সময় লেগেছিল কিছু বছর। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই প্রথম জীবনে সাধু বাংলায় লিখেছেন। জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ীও এক সময় সাধু বাংলা ত্যাগ করে চলিত বাংলা অবলম্বন করেছেন। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কমলকুমারই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি বেশ কিছু বছর চলিত বাংলায় লিখে হঠাৎ সেই বাংলা ত্যাগ করে লিখতে শুরু করলেন সাধু ভাষায়। এ রকম বিপরীত পথে যাত্রা যেন অবিশ্বাস্য।

শুধু তাই নয়, তাঁর বাক্য গঠন এমনই জটিল ও অদ্ভুত হতে লাগল যে সহজে বোঝে কার সাধ্য! যেন তিনি ভাষা-বন্ধনে এক কঠিন দেওয়াল তৈরি করছেন। অত্যন্ত কসরত করে পাঠক যদি সেই দেওয়াল লঙ্ঘন করতে না পারে, তা হলে তাঁর কাহিনীর মর্মে প্রবেশ করতে পারবে না। এ যেন প্রায় শারীরিক পরিশ্রম করে সাহিত্য পাঠ।

'গোলাপ সুন্দরী' গল্পটি যখন লেখা চলছে, তখন আমি একদিন ওয়েলিংটনের সাঙ্গুভ্যালি চায়ের দোকানে বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম গল্পটার আর কতখানি বাকি! কমলকুমার মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমরা এই যে গল্পটা লিখছি, এতে খানিকটা সময় লাগছে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমরা' মানে? গল্প লেখায় আপনাকে কেউ সাহায্য করছে নাকি? তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, আমরা মানে শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমি, এই দু'জনে মিলে লিখছি। আমার একার পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব নয়।

আমি মনে করেছিলাম, এটা তাঁর নিজস্ব ধরনের একটা ঠাট্টা।

কিন্তু এরপরে তাঁর 'খেলার প্রতিভা' গল্পের আরম্ভ এরকম: "মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।" 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'অনিত্যের দায় ভাগ' গল্পগুলির আরম্ভ এরকম। তারপর থেকে এরকমই চলল।

সাঙ্গুভ্যালি রেস্তোরাঁয় সেই বিকেলটির কথা আমার আজও মনে পড়ে। দুর্বোধ্য মানুষটি তখন থেকে যেন আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিলেন। এর আগে যিনি ঠাকুর-দেবতা, ধর্ম-ঈশ্বর নিয়ে নানারকম রঙ্গ-রসিকতা করতেন, সেই মানুষটি এরপর থেকে মদ্যপানের আগেও স্মরণ করতেন রামকৃষ্ণের নাম।

'গোলাপ সুন্দরী' ও 'অন্তর্জলি যাত্রা' প্রকাশের পর তরুণ লেখকদের মহলে যখন হুলুস্থুলু পড়ে গেছে, অনেকে তাঁকে কাল্ট-ফিগারে পরিণত করতে চায়, তখনই কমলকুমার সরে গেলেন এই সুন্দর রহস্যময় রচনারীতি থেকে। তিনি যেন এই পাঠকদেরও চান না। ব্যাপৃত হলেন কঠিন থেকে কঠিনতরের সাধনায়। এই সময়েই তিনি বলতে শুরু করলেন যে রবীন্দ্রনাথ কোনও লেখকই নন, ওই দাড়িওয়ালা লোকটি বাংলা ভাষার অনেক ক্ষতি করেছেন, বাংলা ভাষার আসল লেখক হলেন

বঙ্কিম। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতাম, বঙ্কিমের ভাষা তো জটিল নয়, বেশ সরল। বঙ্কিম অনেক আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করতেন বটে, কিন্তু বাক্য গঠনে অস্পষ্টতা কিছু নেই। কিন্তু কমলকুমারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গদ্য ভঙ্গিমার সাযুজ্য কোথায়? সে গদ্য এই রকম: "বিদায় বিদায় হে অগ্নি তুমি আমা সবাকার চরিত্র নই, তুমি মৃত, তোমাকে তিনবার, আঘ্রাণ করিয়া হাসিলাম; যে বটে শোক করা ন অইসি।"

"পাঠক কেহ যদি থাক, যদি কেহ জাগিয়া থাক, তবে আকর্ষণ কর মদীয় খেদ সকল।"

"এখন বলিব ইহা এক কুহকময় রূপাশ্রিত শরৎকাল, ইদানীং অরুণোদয়ের পূর্বে, ভোরে উচ্চহাস্য শোনা যায়, যে এখন নৈরাশ্য নাই, বেশ্যা নাই, দুশমন নাই; সওদাগর নাই; হা এই মর জীবন। শস্য যাহার চেতনা দিবে, তাহা জীবন যুদ্ধ নামে অহংকার হইল..." (কালই আততায়ী)।

তবে কি কবিতার মতন এই গদ্যেরও প্রতিটি শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে বুঝে নিতে হবে। তাও যে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ভাষা বোঝার জন্য এত মল্লযুদ্ধ করতে হলে কাহিনীর মর্মে প্রবেশ করব কখন?

মাঝখানে কারা যেন রটিয়েছিল যে বাংলা গদ্যের ভিত্তি যেহেতু ইংরিজি সিনট্যাক্স, তাই কমলকুমার ওই গদ্য মানেন না। তিনি ফরাসি ভাষ্যবিদ, তিনি ফরাসি সিনট্যাক্সের প্রবর্তন করতে চান বাংলা গদ্যে। এই দাবি নিছক অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ফরাসি গদ্যে বিশেষ্য বিশেষণে কখনও কখনও স্থান পরিবর্তন হয় বটে, যেমন কালো বেড়ালকে বলা যায় বেড়াল কালো। কিছু উৎপ্রেক্ষারও তফাত আছে, কিন্তু ইংরিজি ও ফরাসি গদ্যের কাঠামো মোটামুটি এক। কমলকুমারের এই গদ্যের কোনও ব্যাকরণ নেই।

আগে অন্য কেউ কমলকুমারের রচনাকে দুর্বোধ্য বললে চটে যেতাম, এখন নিজেরাই হোঁচট খাই পদে পদে। সংলাপেও সাধু ভাষা, ছিল'র বদলে আছিল, নেহারিল, আভাসিল ইত্যাদি ব্যবহারের কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। একদিন সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন করেছিলাম, ভাষাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?

কমলকুমার বলেছিলেন, দ্যাখো, ভাষা নানা রকম হয়। একই ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করে। সকালে বাজারে গিয়ে এক রকম ভাষা, বাবা-মায়ের সঙ্গে আর এক রকম ভাষা, প্রেমিকার সঙ্গে অন্য ভাষা, তাই না? সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে সংলাপের ভাষা, তা আলাদা হতে বাধ্য!

কিন্তু দেবী সরস্বতীর মতন এক হাস্যমুখী, সুশ্রী যুবতী কেন খটোমটো বাক্য পছন্দ করবেন, তা আমার ঠিক বোধগম্য হয় না। ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে কেউ যদি বাক্যালাপ করতেই চায়, তবে প্রেমের ভাষাই তো প্রকৃষ্ট। ভাষা বিষয়ে যারা অজ্ঞ, তারাও প্রেমের ভাষা বোঝে।

মোট পঁয়ষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন কমলকুমার। এর মধ্যে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন শেষ কুড়ি বছর। গল্প লিখেছেন মাত্র তিরিশটি, তাও দু'তিনটি অসমাপ্ত। এর মধ্যে অর্ধেক গল্প ভাবনার ঐশ্বর্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্মিতিতে, কাব্য ও চিত্রশিল্পের

মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। আর দ্বিতীয়ার্ধের গল্পগুলি ভাষার কঠিন ব্যূহের জন্য ঠিক মতন বিচার করা যায় না। সেগুলি কি এক লেখকের খামখেয়াল না আরও বড় সম্পদ তা কে জানে! আমি সেই গল্পগুলির রসের সন্ধান এখনও পাইনি। মাঝে মাঝেই সেগুলি পড়ি, হয়তো সারা জীবনই পড়ে যেতে হবে!

পূর্ণিয়া জেলার উইলিয়াম ফক্‌নার

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে এই উপন্যাসখানি সন্ত তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত মানস'-এর আদলে লেখা। তুলসীদাসের গ্রন্থখানি অন্তত চার শতাব্দী ধরে সারা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। বাঙালিরা অবশ্য এ বইয়ের স্বাদ তেমন করে পায়নি, বাঙালিরা রামায়ণ পেয়েছে কৃত্তিবাস মারফত। প্রতিভার নিরিখে তুলসীদাস অনেকটা ঝাপসা পরিচয়ের, কৃত্তিবাসের চেয়ে বহুগুণ বড়। তুলসীদাসের ভাষাও খুব দুর্বোধ্য নয়, অনেকটা ব্রজবুলির মতন। হিন্দু বাঙালিরা রামকেও দেবতা হিসেবে তেমন উচ্চে স্থান দেয়নি, তাদের আরাধ্য কৃষ্ণ কিংবা শিব। তুলসীদাসের প্রভাবে সমগ্র হিন্দিভাষী অঞ্চলে রামই একমাত্র ভগবান। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চলের অক্ষর পরিচয়হীন সাধারণ মানুষও জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে রামচরিতমানসের কোনও না কোনও শ্লোক থেকে নির্দেশ খুঁজে পান।

তুলসীদাসের নায়ক রাম, সতীনাথের নায়ক ঢোঁড়াই। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলে ছোট শহরটির নাম জিরানিয়া, রামায়ণের জীর্ণারণ্যের সঙ্গে এর মিল কষ্ট-কল্পনা করা যায়। তার অদূরে তাৎমাটুলি। তাৎমারা কোনও এক কালে তাঁতি ছিল, এখন সে পেশা ভুলে গেছে, নিছক এটা-সেটা করে একবেলা পেট ভরাবার মতন অন্নসংস্থান করে। মধ্যে একটা পাক্কি, অর্থাৎ পাকা রাস্তা, তার ওপাশে মেথরদের বস্তি। এই দুই অন্ত্যজদের গ্রামই উপন্যাসটির মূল পটভূমি। তাৎমাটুলির ছেলে ঢোঁড়াই অতি অল্প বয়েসে বাবাকে হারায়। তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করার সময়, ছেলেকে সঙ্গে রাখা সম্ভব নয় বলে তিন বছরের ঢোঁড়াইকে এক সাধুর পায়ের কাছে রেখে আসে। মহাকাব্যের নায়ক রামের সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠতে থাকে এই অনাথ ঢোঁড়াই।

উপন্যাসের এই পরিকল্পনাটাই বিস্ময়কর।

বাঙালিদের কাছে বিহার খুবই পরিচিত। বহু বাঙালি এককালে ছড়িয়ে ছিল বিহারের সর্বত্র, যাতায়াতও অনবরত। বাংলা সাহিত্যে বিহারের কিছু কিছু ছবি পাওয়া গেছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। সে সবই আংশিক। বিহারের দরিদ্র, সাধারণ মানুষের কথা আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকে। খুবই উচ্চাঙ্গের বই নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিভূতিভূষণ অতি রোমান্টিক, মানুষের চেয়েও প্রকৃতি তাঁর কাছে অনেক সময় প্রধান হয়ে ওঠে, তাঁর চক্ষু সব সময় সৌন্দর্যসন্ধানী। আরণ্যক-এর সঙ্গে ঢোঁড়াই চরিতমানসের কোনও তুলনাই চলে না।

অন্যান্য লেখকরা লেখেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সতীনাথের যেন কোনও দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। এমনকী তিনি যে বাঙালি লেখক, তাও কোথাও বোঝা যাবে না। অত্যন্ত কুশলতায় তিনি জিরানিয়া-তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলির যে জনজীবনের কথা লিখেছেন, তা যেন আপনা আপনি ফুটে উঠছে, লেখকের কোনও ভূমিকাই নেই এখানে। ভাষাটা বাংলা বটে, কিন্তু চরিত্রগুলির সংলাপে, এমনকী বর্ণনাতেও অনর্গল দেহাতি হিন্দি শব্দ, তুলসীদাসের দোঁহার টুকরো ছড়ানো যে মনে হয়, সমগ্র উপন্যাসটি ওখানকার নিজস্ব ভাষাতেই রচিত। এই দক্ষতা তুলনাহীন, নিজেদের পরিচিত গণ্ডির বাইরের কথা যারা কিছুই জানে না, দেশ সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণাই নেই, সেই রকম একটা তুচ্ছ অঞ্চলের মানুষের ওপর গাঁধীজী ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে পড়তে পারে, তা সতীনাথের আগে আমাদের কেউ দেখাননি। এই মানুষগুলির অন্ন নেই, তবু একটা বিশেষ জীবনবোধ আছে, এমনকী সংস্কৃতিও আছে। সেই জন্যই উপন্যাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঞ্চলিক হয়েও সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

ঢোঁড়াই ছেলেটি দোষে-গুণে ভরা। একটি জীবন্ত চরিত্রকেই মডেল হিসেবে নিয়েছিলেন সতীনাথ। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সে ছাপিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব পরিবেশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অঞ্চলটি একটু একটু বদলাচ্ছে। অতি ধীর ও সূক্ষ্ম সেই পরিবর্তন, সম্পূর্ণ নাটকীয়তা বর্জিত। এখানে কোনও উচ্চ আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইচ্ছাপূরণেরও কোনও স্থান নেই, সেই জন্যই এই বর্ণনা অসাধারণ। লকলক করছে প্রখর বাস্তব, কিন্তু আদিখ্যেতা করা হয়নি দারিদ্র্য নিয়ে।

অনাথ ঢোঁড়াই এক সময় গোরুগাড়ির চালক হল। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে তরুণ ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে তার পচ্ছিমে স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদে। তুলসীদাস বলেছেন, যদিবা আরশির ওপর নিজের ছায়া ধরে রাখা সম্ভব, কিন্তু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়। অত ভালবেসেও স্ত্রীর কেন মন পাওয়া গেল না, তা বুঝল না ঢোঁড়াই, রাগে-দুঃখে সে বিবাগী হয়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ডে ঢোঁড়াই-এর অভিজ্ঞতার জগৎ আরও বিস্তৃত হয়। বিপ্লবী বা ক্রান্তিদলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। রামায়ণ ছাড়াও অন্যান্য কেতাবের কথা সে শোনে। নতুন রামায়ণ আর পুরনো রামায়ণে জট পাকিয়ে যায় তার মনে।

এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড বা পরপর আরও অনেক খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল সতীনাথের। লিখলেন না, মধ্যপথে ছেড়ে দিলেন। প্রথম কারণ তাঁর অপূর্ণতাবোধ। তিনি ভেবেছিলেন, ঢোঁড়াইদের মতন মানুষদের চরিত্র মানস সরোবরের মতন বিশাল ও গভীর, সেটা তিনি ঠিক ফোটাতে পারছেন না। শিল্পী মাত্রেরই এ রকম অতৃপ্তি থাকে, আমাদের আফশোস, কেন তিনি আরও লিখলেন না।

না লেখার আরও একটি কারণ তিনি কৌতুকচ্ছলে জানিয়েছেন। ঠিক করেছিলেন, তৃতীয় খণ্ডে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ঢোঁড়াইদের মনের রূপরেখার পরিবর্তনও ধরে রাখবেন। সে খণ্ডের নাম দেবেন 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। সে

পরিকল্পনা শিকেয় তুলে রাখলেন, তার কারণ, এই উপন্যাস বাংলার পাঠকরা ঠিক মতন গ্রহণ করেনি। বইটি বিক্রি হয়নি, প্রকাশক বেজার হয়েছিলেন। সতীনাথ ডায়েরিতে লিখেছেন, "বইখানা যদি খুব বিক্রি হত, তা হলেও কি নায়কের চরিত্রের অপর্যাপ্ততার কথা তোমার মনে আসত? তা হলে কি তুমি, শুধু উত্তর ঢোঁড়াই চরিত কেন, উত্তরোত্তর ঢোঁড়াই চরিত পর্যন্ত লিখে চলতে না?"

আমাদের অধীত বিদ্যার মধ্যে উইলিয়াম ফক্‌নারের কথা বিশেষ মনে পড়ে এই উপন্যাস প্রসঙ্গে। সতীনাথ ভাদুড়ী আজীবন পূর্ণিয়াতেই কাটিয়ে গেলেন। সেখানকার পারিপার্শ্বিকের যে-সমস্ত মানুষজন তিনি দেখেছেন, তাঁদের কথাই বেশি লিখে গেছেন। ফক্‌নারেরও একটা নিজস্ব অঞ্চল ছিল। নিজের বাসস্থানের কুড়ি মাইল গণ্ডির মানুষজন, সাদা, কালো বা লাল, তাদের কথাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একের পর এক উপন্যাসে। ফক্‌নারের সেই অঞ্চলটির নাম 'ইয়োক্‌নাপাটাওফা কাউন্টি', (Yoknapatawpha County), যার ভিত্তিতে 'স্যারকুচয়ারি', 'লাইট ইন অগাস্ট', 'দা আনভ্যাংকুইশ্‌ড', 'দা হ্যামলেট', 'গো ডাউন মোজেজ' প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। আঞ্চলিক হয়েও সেগুলি সর্বজনীন।

ফক্‌নার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। যে-সব উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তার অনেকগুলিই তো আমরা পড়ে দেখি। সেই মানদণ্ডে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলার একাধিক লেখক নোবেল পুরস্কার অনেক আগেই পেতে পারতেন। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' অবশ্যই সে রকম পুরস্কারের যোগ্য। নোবেল কমিটির দুর্ভাগ্য, তাঁরা এরকম রচনার সন্ধান পান না।

ফক্‌নারের সঙ্গে তুলনাটা আরও কিছুদূর টানা যায়। ফক্‌নার বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাহবা পেলেও জনপ্রিয় হননি। জীবনের একটা সময় তাঁর বই বিক্রি খুবই কমে যায়, প্রকাশকরাও বিমুখ হন, চল্লিশের দশকের গোড়ায় ফক্‌নার প্রায় বিস্মৃত, একটিমাত্র বই ছাড়া আর কোনও বইই পাওয়া যেত না। ফক্‌নারের সৌভাগ্য, জীবদ্দশাতেই তিনি পুনরাবিষ্কৃত হন, রবার্ট পেন ওয়ারেন-এর মতন তরুণ লেখকরা তাঁর বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন, যার ফলে র‍্যান্ডম হাউজের মতন বড় প্রকাশক আকৃষ্ট হয়ে পুরনো বইগুলি ছাপতে শুরু করে আবার, পুরস্কারও আসতে থাকে একে একে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস, 'জাগরী'র জন্যই রবীন্দ্র পুরস্কার পান, অনেক মান্য সমালোচকের প্রশস্তিও পেয়েছেন, কিন্তু সে রকম জনপ্রিয়তা কখনও পাননি, বেঁচে থাকতে থাকতেই তা আরও কমতে থাকে। মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি যেন বিস্মৃত লেখকের পর্যায়ে চলে যান, তাঁর বইগুলিও দুর্লভ হয়ে পড়ে। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' আর ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যু ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে।

১৯৭২ সালে সনাতন পাঠক নামে এক তরুণ কলমনবীশ সতীনাথ ভাদুড়ীর বইগুলির অপ্রাপ্যতা বিষয়ে আক্ষেপ করে একাধিকবার লিখেছেন এই 'দেশ' পত্রিকায়। তিনি এই পত্রিকায় তখন নিয়মিত সাহিত্য সংবাদ লিখতেন। তখন সতীনাথের দাদা ভূতনাথ ভাদুড়ী উক্ত সনাতন পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করে

বইগুলি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করতে চান। কোনও বড় প্রকাশক আগ্রহী হননি, তবে সনাতন পাঠকের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হন অরুণা প্রকাশনী। অচিরকালের মধ্যেই শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্যের অতি সযত্ন ও সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং সুমুদ্রিতভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে। সেই রচনাবলীই এখনও সুলভ।

ঢোঁড়াই চরিতমানস: সতীনাথ ভাদুড়ী
(দুই খণ্ড ১৯৪৯, ১৯৫১)

দৈত্যকাহিনী

১.

হোয়াইট ওয়ে লেড ল নামে একটি সুবিখ্যাত দোকান ছিল কলকাতায়। অত বড় দোকান এখন আর কলকাতা শহরে একটাও নেই। সেখানে সুচ সুতো থেকে আলমারি কিংবা চটিজুতো থেকে বাইবেল পর্যন্ত সবই পাওয়া যেত। সেই দোকান বাড়িটিই এখন ঘড়িওয়ালা মেট্রোপলিটন বিল্ডিং। নীচে ইউ এস আই এস, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি।

সেই বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় একটি ফ্ল্যাটে এক বিকেলবেলা, সদ্য কৈশোর-ছাড়ানো আমরা কয়েকজন সমবেত হয়েছিলাম। সেটা উনিশ শো তিপ্পান্ন সাল, আমি তখন সিটি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি, দীপক মজুমদার স্কটিশচার্চ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ; আমার সহপাঠী মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল। দীপকের সহপাঠী আনন্দ বাগচী। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার চেয়ে দু'-এক বছরের সিনিয়ার, দেবেশ রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সমসাময়িক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তখন চিনি না। সেই বছর কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠা।

সেই বছরই আমরা 'হরবোলা' নামের একটি নাটুকে দল গড়েছিলাম। প্রাক্তন হোয়াইট ওয়ে লেড ল বাড়ির ওপরতলার ফ্ল্যাটে সেদিন আমাদের হরবোলার প্রথম দিনের অধিবেশন ; অবিকল তারিখটা মনে নেই। আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা উৎসাহদাতা, বা নাটকের ভাষায় যাঁকে বলে অধিকারী, ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত, সংক্ষেপে ডি. কে., যাঁর অন্য পরিচয় আমাদের কাছে তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, শুধু তাঁকে জানতাম সিগনেট প্রেসের পরিচালক হিসেবে। ওই ফ্ল্যাটটিই ডি. কে.-র বোন কল্যাণী মজুমদার ও তাঁর স্বামীর, যাঁর পুরো নাম ভুলে গেছি, শুধু মিঃ মজুমদার বলেই জানতাম।

আমার সংগঠন-প্রতিভা নেই। কৃত্তিবাস পত্রিকা বা হরবোলার জন্য, আমাদের পক্ষ থেকে মূল উদ্যোগ নিয়েছিল দীপক, আমি ছিলাম তার সহচর মাত্র। আরও কয়েকজন ছিল, যেমন ভাস্কর দত্ত, আশুতোষ ঘোষ, উৎপল রায়চৌধুরী ইত্যাদি।...এঁরা আমার বাল্যবন্ধু, সাহিত্যের পাঠকরা এঁদের সঙ্গে পরিচিত নন।

সেই দিনই প্রথম বোধহয় আমি লিফটে আরোহণ করি। পুরনো আমলের পেল্লায় লিফট আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল ফ্ল্যাটের দরজায়, সেখানে সাদা উর্দি পরা এবং মাথায় মুরেঠা বাঁধা বেয়ারা আমাদের সেলাম করে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিল। একখানি ঘরের আয়তন টেনিস কোর্টের মতন এবং এমনই চাকচিক্যভাবে সাজানো যে, আমরা বেশ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের পায়ে ধুলো, প্যান্টের বোতাম

সব ক'টা ঠিকঠাক আছে কিনা এ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। সরু থেকে মোটা হয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম কাচের গেলাসে অবিলম্বে আমাদের হিমেল শরবত পরিবেশন করা হল, ডি. কে. আমাদের প্রত্যেককে একটি করে নতুন খাতা ও একটি আস্ত পেন্সিল দিলেন এবং জানালেন যে আমাদের নাট্য পরিচালক এখুনি এসে পড়বেন।

তিনি যখন এলেন, প্রথম দর্শনে আমরা খানিকটা হতাশই হলাম। যে-রকম পরিবেশ ও যে-ধরনের আদর-আপ্যায়ন, তাতে মনে হয়েছিল, নাট্য পরিচালক নিশ্চিত হবেন প্রমথেশ বড়ুয়ার মতন রূপবান ও সাহেবি ব্যক্তিত্বময় কেউ। যিনি এলেন তিনি একজন কুচকুচে কালো চেহারার বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা, খুব পরিষ্কার নয়, হাতে একটি চটের তৈরি রেশন ব্যাগ। তাঁকে অনেকটা আমাদেরই মতন মানুষ দেখে স্বস্তি পাওয়া উচিত ছিল, তবু যে খানিকটা নিরাশ হয়েছিলাম, তার কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে বোধহয় খানিকটা সুপ্ত স্নবারি থাকে।

তিনি কমলকুমার মজুমদার। সেই প্রথম দেখা। এর আগে শুধু নাট্যজগৎ কেন, কোনও জগতেই তাঁর নাম আমরা শুনিনি। ডি. কে. এবং অন্যান্যদের খাতির তিনি গ্রহণ করলেন অত্যন্ত বিনীত ভাবে। কার্পেটের ওপর আসন নিয়ে তিনি আমাদের সকলের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁর ভাষা এই রকম, বাবুটির নাম কী? বাবুটির কী করা হয়? বাবুটির পিতার নাম? থাকা হয় কোথায়? এই ধরনের ভাষা আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বইতে পড়েছি, হঠাৎ কারুর মুখ থেকে শুনলে হকচকিয়ে যেতে হয়ই। কমলকুমারের বয়েস তখন চল্লিশের বেশি নয়।

সেদিন দু'-চারটি বই থেকে কিছু পাঠ করে আমাদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা হয়েছিল, আর কিছু না। সেইদিনই, কিংবা আর দু'-চারটি অধিবেশনের পর, কমলকুমার ঘোষণা করেছিলেন, এমন কেতাদুরস্ত ফ্ল্যাটে থিয়েটারের রিহার্সাল চলবে না। বোধহয় তিনি বলেছিলেন, 'এরকম বাঁধানো জায়গায়'।

ডি. কে. ওই জায়গাটি ঠিক করেছিলেন শহরের কেন্দ্রস্থলে বলে। সেখান থেকে হরবোলা সরে গেল কিছু দক্ষিণে। এলগিন রোডে, সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ির প্রায় উলটো দিকেই, আর. সেনের বিশাল জাহাজ মার্কা প্রাসাদ। সেই বাড়ির ধার ঘেঁষে বড় বড় পাম ও দেবদারু ও রেনট্রি শোভিত খানিকটা মোরাম বিছানো টানা পথ। তার শেষ প্রান্তের গৃহটি সিগনেট প্রেসের। বাড়িটি ইংরেজ-পছন্দ, সামনে পোর্টিকো ও সবুজ ঘাসে ভরা চত্বর, দোতলা।

প্রথম ডানদিকের মস্ত বড় কক্ষটি সিগনেট প্রেসের অফিস এবং ডি. কে.-র নিজস্ব কাজের ঘর। অসংখ্য দেশি বিদেশি বইতে ঠাসা, এমনকী সংলগ্ন বাথরুমটিতে পর্যন্ত দুটি বইয়ের র‍্যাক। পর পর অনেকগুলি টেবিল পাতা, প্রতি শনি-রবিবার, সেইসব টেবিল ও সোফা-কৌচ সরিয়ে দিয়ে পাতা হয় বিরাট শতরঞ্চি। ডি. কে. নিজে গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে কোনওদিন বহুবাজারের ভীম নাগের দোকান, কোনওদিন বালিগঞ্জের গাঙ্গুরাম থেকে নিয়ে আসেন বাছাই করা সন্দেশ ও শিঙাড়া, সেগুলি অফুরন্ত। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই হাঁক পাড়লে দোতলা থেকে নেমে আসে সুদৃশ্য কাপে তিরিশ বত্রিশ

কাপ চা। অন্তত চার পাঁচবার। আর শতরঞ্চির ওপর এদিক ওদিক ছড়ানো থাকত কয়েকটি গোল্ড ফ্লেকের টিন। আমার বয়েস তখন ছিল উনিশ, কলেজ জীবনে আমি ছিলাম একটি আদর্শবাদী ছোকরা, সিগারেট খাওয়াকেও অন্যায় মনে করতাম। (পরে অবশ্য সব পুষিয়ে নিয়েছি!) কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ সেই সিগারেটের টিন কাত করে একসঙ্গে দশ-বারোটা নিয়ে পকেটে ভরতো।

ডি. কে. ছিলেন সব দিক থেকেই একজন বড় সাইজের মানুষ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছিলেন বিশাল, তাঁর হৃদয়খানা ছিল তাঁর শরীরের চেয়েও বড়। তিনি জমিদারপুত্র ছিলেন না, এক-এক সময় উপার্জন করেছেন প্রভূত, এবং ব্যয়ও করেছেন জলের মতন। শেষ জীবনেও তিনি একটি বাড়ি বানাননি বা অঢেল বিষয়সম্পত্তি রেখে যাননি, যতদূর জানি। আমাদের প্রত্যেক দিনের রিহার্সালে তিনি খরচ করতেন অন্তত দুশো টাকা, সেই চব্বিশ বছর আগে। —একটু রাত হলে আমাদের মতন কয়েকজনকে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতেন এলগিন রোড থেকে শ্যামবাজার। যারা হাওড়া বা বেহালা থেকে আসত, তাদের পকেটে জোর করে দশ-পনেরো টাকা গুঁজে দিয়ে খুব মৃদুভাবে বলতেন, ট্যাক্সি নিও। হরবোলার কোনও সদস্য কখনও চাঁদা দেয়নি, কোনও অভিনয় অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি করা হয়নি, সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন ডি. কে. একলা। সবই শখের জন্য। এসব শৌখিন মানুষ এখন আর একজনও আছে কিনা জানি না। যদিও ডি. কে.-র চেয়ে হাজার গুণ ধনী অন্তত এক হাজার বাঙালি এখনও আছে কলকাতায়। ডি. কে. সামন্ততন্ত্রকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু মনে মনে তিনি ছিলেন যেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শৌখিন পুত্র।

তিনি তখন একটি সাহেবি কোম্পানির বাঙালি কর্ণধার। তা ছাড়া সিগনেট প্রেসের কাণ্ডকারখানায় বাংলা সাহিত্য ও প্রকাশক জগতে ঘটিয়ে দিয়েছেন হুলুস্থুল। তিনি উদ্যমী পুরুষ হিসেবে পরিচিত। আসলে, তিনি মানুষটি ছিলেন লাজুক। তিনি বাইরের সভা-সমিতিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া-আসা করতেন না বিশেষ। নিজের বাড়ির পরিবেশে এক এক সময় মন ও মুখ খুলতেন। এঁর মতন বিখ্যাত আড্ডাবাজ কদাচিৎ মেলে। ডি. কে.-র সঙ্গে আড্ডায় বসলে মন্ত্রমুগ্ধের মতন আটকে যেতে হত। তাঁর সঙ্গে প্রথমদিন সাক্ষাৎকারে আমরা গিয়েছিলাম সকাল ন'টায়, উঠেছিলাম দুপুর প্রায় তিনটেয়—তাও আমরাই আগে থেকে। অথচ উনি ছিলেন খুবই ব্যস্ত লোক।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল, আমাদের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ। তখন তাঁর বয়েস আমাদের অন্তত দ্বিগুণ। অথচ, তিনি বহুদিন পর্যন্ত আমাদের সকলকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সাধারণত ওঁর মতন বয়েসিদের কাছে আমার বয়েসিদের সিগারেট লুকোবার কথা, অথচ তিনি নিজে সরবরাহ করতেন মূল্যবান সিগারেট, আমাদের যুক্তি ও মন্তব্য তিনি শুনতেন মন দিয়ে এবং ব্যবহার ছিল যেন তিনি ও আমরা সমান সমান। অথচ তা হতেই পারে না। আমাদের তুলনায় ডি. কে.-র সাহিত্যপাঠ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ডস্টয়েভস্কি ও ফ্রানৎস কাফকার রচনার বিষয়ে তিনি প্রথম আমাদের আকৃষ্ট করেন। এবং তিনিই ছিলেন অত্যন্ত বেশি রকমের

বাঙালি, বাংলা সাহিত্যকে তিনি এমন ভালবাসতেন যেন এর গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলে তাঁর নিজের শরীরে রক্তপাত হবে।

হরবোলাকে নিছক নাটুকে দল করার ইচ্ছে তাঁর একদম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, সেখানে সমবেত হয়ে আমরা সকলে সংগীত-সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে অনুরক্ত হব। কোনও কোনও সন্ধে শুধু আধুনিক শিল্পীদের ছবি বিষয়ে আলোচনায় কেটে যেত। কখনও গান। নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রত্যেকের গান গেয়ে গলা সাধা দরকার এই বিশ্বাসে তিনি ডেকে এনেছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর এক শিষ্য সন্তোষ রায়কে, কিছুদিন পর এসেছিলেন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আমাদের বটুকদা। আমার গলায় একদম সুর নেই তবু আমাকে দিয়ে গান গাওয়াবার জন্য ওই দু'জন কত পণ্ডশ্রম করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমি কোরাস দলে কোনওক্রমে পেছনের দিকে স্থান পেয়েছিলাম। বটুকদার কাছ থেকে শেখা গান, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'—পরবর্তীকালে আমরা পঞ্চাশের কবিরা নিজস্ব ন্যাশনাল অ্যানথেম করে ফেলেছিলাম।

নিজে গান গাইতেন না ডি. কে., কিন্তু গান সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর রেকর্ড সংগ্রহ ছিল দেখবার মতন। তাঁর স্বভাবের অনেক কিছুই বিচিত্র। শুনেছি, তিনি রোজ রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপর স্নান করে খেতে বসতেন রাত তিনটের সময়। যাযাবরের দৃষ্টিপাতের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশ না করে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ভূমিকায় লেখককে মৃত বলে মিথ্যে রটিয়ে দেওয়া তিনি অরুচিকর মনে করেছিলেন। এবং তিনিই অতি তরুণ কবি নরেশ গুহ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন অতি সম্মানের সঙ্গে।

জীবনানন্দ দাশের কোনও কবিতার বই-ই যখন পাওয়া যেত না, তখন ডি. কে. প্রকাশ করলেন 'বনলতা সেন' এবং পরপর কাব্যগ্রন্থগুলি। সেই আমরা প্রথম জীবনানন্দ দাশকে চিনলাম। ছাতা হাতে নিয়ে জীবনানন্দকে দু'-একবার আসতে দেখেছি ডি. কে.-র কাছে। 'বনলতা সেন'-এর চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। যদিও কবি সেই মলাট সম্পর্কে নাকি পরে বলেছিলেন, মুখখানা অনেকটা রাজকুমারী অমৃত কাউরের মতন কি? এ গল্পও ডি. কে.-র কাছে শোনা।

কমলকুমার মজুমদারও গায়ক নন। কিন্তু তিনি সবসময় গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন। এতে কণ্ঠস্বর ভাল থাকে, তিনি বলতেন। ওই গুনগুনানি ও লবঙ্গ প্রতিনিয়ত তাঁর মুখে। একটি পিরিচ ভর্তি লবঙ্গ প্রতিদিন রাখা হত তাঁর সামনে, ফুরিয়ে গেলেই আবার লবঙ্গের জন্য হাঁক। একসঙ্গে অত লবঙ্গ খেতে আগে কারুকে দেখিনি।

কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও ডি. কে.—এই তিনজন এক একদিন এমন সব প্রসঙ্গ তুলতেন যে আমরা থ হয়ে শুনতাম। আই পি টি এ-র স্বর্ণযুগে আমরা ছিলাম বালকমাত্র, বটুকদা বলতেন সেই সময়ের কথা। বটুকদার মুখে সব সময় একটা কৌতুকের হাসি মাখানো থাকত। তিনি বলতেন ছোট ছোট বাক্য, হঠাৎ হঠাৎ করতেন অন্যের কণ্ঠস্বর নকল কিংবা শুরু করে দিতেন প্রাসঙ্গিক গান। কমলদা

ভালবাসতেন তাঁর বয়েসের চেয়েও বেশি আগেকার গল্প বলতে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-হিন্দু ঝগড়ার কাহিনী উনি এমনভাবে বলতেন, যেন ওসব তাঁর নিজের চোখে দেখা। যাঁরা শুধু কমলকুমারের রচনা পড়েছেন, তাঁরা কল্পনাই করতে পারবেন না কমলকুমারের মুখের ভাষা কত সরাসরি ও জীবন্ত। তাঁর মুখের ভাষাকে বলা যায়, কাঁচা বাংলা। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মুখের ভাষা যেমন জীবন্ত কাঁচা বাংলা। এর মধ্যে খুব সাবলীল ভাবে এসে পড়ত আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ। বটুকদা গলাখাঁকারি দিয়ে তখন বলতেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আঠারো বছর বয়েস হলে সবাই বন্ধু। কমলদা এসব কিছু গ্রাহ্যই করেননি কখনও। সেই সময় আমাদের এক বন্ধুর উপর্যুপরি বাবা ও মা মারা যান। তাঁরা রেখে যান কিছু বিষয়সম্পত্তি। সে বার্তা শুনে কমলদা সহাস্যে বলেছিলেন, এসো, এবার ওকে একটু বখানো যাক! তারপরই 'সধবার একাদশী' কোট করে বলতেন, একজন বড়মানুষের ছেলে বখলে দশজন মাতালের প্রতিপালন হয়! (অথবা, এই মর্মে কিছু!) অবশ্য, খালাসিটোলা নামে এক অলীক প্রমোদস্থানে কমলদার সঙ্গে আমরা যাতায়াত শুরু করেছিলাম এর বেশ কয়েক বছর পরে।

কমলদার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ছিল বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রহননে। একবার তিনি একটি খরগোশের কথা বলেছিলেন ওর গোঁফ অবিকল আশু মুখুজ্যের মতন। তারপর সেই খরগোশটার ক'টা বাচ্চা হল, তার মধ্যে একটার গোঁফ আবার শ্যামাপ্রসাদের মতন হুবহু। তখনকার একজন সাড়া-জাগানো তরুণ গদ্যলেখক, আমাদের প্রিয়, তাঁর সম্পর্কে কমলদা বলেছিলেন, ও তো টিপসই দিয়ে মাইনে নেয়। আর একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বলেছিলেন, হ্যাঁ ওমুক তো, ঠিক বুটজুতোর মতন মুখখানা।

ডি. কে. শুধু গল্প উসকে দিতেন। হঠাৎ হয়তো বললেন, মনে আছে, বিচিত্রা ভবনের সেই মিটিং-এ রবীন্দ্রনাথ...। অমনি কমলদা বা বটুকদা সেই প্রসঙ্গে নানা ঘটনা বলতে লাগলেন। ডি. কে. উপভোগ করতে করতে বারবার চিবুক ছোঁয়াতে লাগলেন নিজের বুকে। একেবারে শেষে এমন একটা মন্তব্য করতেন, যাতে হাসিতে ফেটে পড়তাম সবাই। রসিকতা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সব কথাবার্তাই বাঁধা থাকত খুব উঁচু পরদায়। এলেবেলে কথা বা স্থূল টক কোনও পাত্তাই পেত না। তখনও অবশ্য আমরা কমলদার লেখক পরিচয় জানতাম না বিশেষ কিছু। জানতাম, উনি ছবি আঁকেন। আমাদের সামনেই অনেক সময় স্কেচ করতেন, এবং সে সময় কিছু উড-কাট নিয়ে মগ্ন ছিলেন। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে কমলদা একদিন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে হালকা ভাবে বলেছিলেন, এ গোপাল ঘোষ, ছবি এঁকে খায়। জলরঙের ছবি ও স্কেচের জন্য তখন গোপাল ঘোষের খুব নাম। তিনিও হালকা ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি তো আর মন দিয়ে ছবি আঁকলেন না কমলবাবু! তা হলে আমাদের ভাত মারতেন!

কিছুদিন পর অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহর মুখে শুনেছিলাম, কমলদা একসময় সাহিত্যপত্র ও চতুরঙ্গে গল্প লিখতেন। বরাবরই দেখেছি, কবিরাই কমলদার

রচনার বেশি অনুরাগী। পরবর্তীকালেও একদল কবিই কমলদাকে নিয়ে খুব হইচই করেছে। হরবোলায় আমাদের সঙ্গে চেনাশুনো হবার কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয় কমলদার প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'। তারপর তাঁর একটি গল্প 'ফৌজ-ই-বন্দুক' এবং একটি উপন্যাস 'সুহাসিনী পমেটম' ছাপা হয় কৃত্তিবাসে।

হরবোলা নাট্য সংস্থায় থাকতে থাকতেই আমরা কয়েকজন প্রকাশ করি কবিতার পত্রিকা কৃত্তিবাস, ডি. কে.'র প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। ডি. কে.-ই আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওই পত্রিকায় শুধু তরুণতম কবিদেরই রচনা থাকা উচিত। কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা নয়। এখানে শুধু বলি হরবোলার কথা।

আমাদের প্রথম পালা ছিল সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। এই নাটিকার গানগুলি সুকুমার রায়ই সুর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই স্বরলিপি উদ্ধার করে প্রতিটি গান শেখানো হল আমাদের। 'আমাদের' কথাটা প্রকৃত সামগ্রিক অর্থেই ব্যবহার করা হল। তখনও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন প্রবলভাবে দানা বাঁধেনি, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সকলকে চমকিত করেছে এবং 'বহুরূপী' দল ধারাবাহিক ভাবে আমাদের রুচি বদলের কাজ করে যাচ্ছে। ভাঙা মঞ্চে শিশির ভাদুড়ী করে যাচ্ছেন তাঁর শেষ অভিনয়গুলি। কমলদার নির্দেশনা আমাদের কাছে সব অর্থে নতুন। মেঝেতে খড়ির দাগ কেটে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা তো ছিলই। এ ছাড়া তিনি আমাদের প্রত্যেককে পুরো নাটকটি সব গান সমেত মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে একা একা নাটক বলতে পারতাম।

রিহার্সাল চলেছিল ন' মাস। নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে। এই নাটকের মধ্যে ছিল অনেক ছোট ছোট নাটক। বাড়ির সামনে মুক্তাঙ্গনে বাঁধা হল মঞ্চ। মডার্ন ডেকরেটার্স কৃত। সেই মঞ্চও রইল দেড় মাস। এত দীর্ঘ সময় মঞ্চ বেঁধে রাখা যে কী বিপুল খরচের ব্যাপার, আমরা তখন বুঝিনি। প্রতিদিন স্টেজ রিহার্সাল হয়। একেবারে ত্রুটিহীন না হলে পালা অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে না। কিন্তু ত্রুটিহীন কার কাছে?

প্রথম দিনই, মঞ্চ বাঁধা সম্পূর্ণ হবার পর কমলদা সেটি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, কাটতে হবে।

তক্ষুনি মানে বুঝিনি। পরে বোঝা গেল, কমলদার মতে মঞ্চটি চার ইঞ্চি বেশি উঁচু হয়ে গেছে। ফলে দর্শকদের চোখের সীমারেখা ঠিক থাকবে না। মঞ্চ তো কাটা যায় না, পুরোটা খুলে আবার বানাতে হয়। পাঁচ না দশ হাজার কত টাকা ব্যয়ে যেন গঠিত সেই মঞ্চ ভাঙার প্রস্তাবে আমরা নির্বাক। ডি. কে. কিন্তু কিছুতেই দমে যান না। একটুক্ষণ চিন্তা করেই বললেন, আর এক কাজ করলে হয়। লরি করে মাটি এনে পুরো চত্বরটাই যদি উঁচু করে দেওয়া যায় চার ইঞ্চি? থিয়েটারের কারণে মাঠ উঁচু করে ফেলার প্রস্তাব এর আগে কেউ কখনও দিয়েছেন কিনা ইতিহাসে লেখা নেই। এটা প্রায় কাজে পরিণত হতে যাচ্ছিল, এমন সময় নীলিমা দেবী, যিনি সিগনেট প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের বন্ধু সুনন্দ গুহঠাকুরতার মা এবং ডি. কে.-র শ্বশ্রূমাতা, তিনি ডি. কে. এবং কমলদাকে সহাস্য ধমক দিয়ে বললেন, এসব কী হচ্ছে পাগলামি।

মঞ্চ চার ইঞ্চি ছোট-বড় হলে কী আসে যায়। পৃথিবী উলটে যাবে? আপনারা কি অমর-নাটক করতে যাচ্ছেন? হোয়াট কনসিট!

ডি. কে. একবার পরিকল্পনা করেছিলেন রাবণ মঞ্চে নামবে হেলিকপ্টার থেকে। কী একটা সামান্য কারণে সেটা বাতিল হয়। তারপর তিনি বললেন, রাবণের কুড়ি হাত হবে কোলাপসিবল। এমনিতে দুটো হাত, হঠাৎ সে দুটি উঁচু করলেই ঘট ঘট করে আরও আঠারোখানা হাত বেরিয়ে পড়বে! কিন্তু তা হলে ন' খানা কোলাপসিবল মুখেরও ব্যবস্থা রাখতে হয়। এ ভূমিকার অভিনেতা সুনন্দ ওরফে বুড়ো নিজের একাধিক মুখ বিষয়ে আপত্তি তুলে ওটা বানচাল করে দেয়।

কমলদা তাঁর প্রতিভা দেখান পোশাকের ব্যাপারে। পোশাক ভাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। চরিত্র অনুযায়ী পোশাকের তিনি ছবি এঁকে দিলেন। ডি. কে. বললেন, এইসব পোশাক তৈরি হবে আমাদের চোখের সামনে। চলে এল দু'-তিনজন ওস্তাগর, সেলাইকল সমেত। ঘর্ঘর শব্দে সেলাই হতে লাগল পোশাক। হঠাৎ মাঝপথে তাদের একজনকে থামিয়ে কমলদা বললেন, সুগ্রীবের পোশাকের জন্য ডামাসেন্ট ক্লথ চাই। সেটা কী বস্তু কে জানে! ডি. কে. লোক লাগালেন সারা কলকাতায়। বড়বাজার থেকে অতি কষ্টে জোগাড় করা গেল, সেটা একটা মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু কাপড়, তাতে তৈরি হল পোশাক, তা দেখেই কমলদা বললেন, হবে না, চলবে না, বেশি চকচক করবে— বারো আনা গজের লং ক্লথ আনো।

বলাই বাহুল্য, বারো আনা গজে গামছার কাপড়ও পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল-এর অভিনয় হয়েছিল পরপর দু' দিন। তাতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার সুধীসমাজের বেশ বড় একটি অংশ। দর্শকরা সবাই নির্বাচিত আমন্ত্রিত। ফ্রি পাশ বন্ধ।

পরের নাটক 'মুক্তধারা'। কমলদা রবীন্দ্রভক্ত নন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করতেন দাড়িবাবু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধারার মানুষ, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তাঁর জাত-বিরাগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনি অনেকখানি ডিঙিয়ে এসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখক হিসেবে মানেন। কিন্তু 'মুক্তধারা' নির্বাচিত হবার পর তিনি বললেন, এর থেকে একটি লাইনও কাটা হবে না। প্রত্যেকের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। মুক্তধারা নাটক সম্পূর্ণভাবে আগে কখনও অভিনীত হয়নি, রবীন্দ্রনাথও করেননি। প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্নজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর দরকার। ডি. কে. ঠিক করলেন, এই 'মুক্তধারা' নাটকের সম্পূর্ণাঙ্গ অভিনয় হবে।

সামনের জাহাজ মার্কা বাড়িটি আর. সেন নামে এক ব্যবসায়ীর। সে বাড়ির মেয়ে দীপান্বিতাকে বিয়ে করেছেন তরুণ রায়। তিনিও দলবল নিয়ে সেই বাড়িতে 'মুক্তধারা' রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, আমরা আওয়াজ শুনতে পেতাম। তরুণ রায় প্রস্তাব দিলেন দুটো দল মিলিয়ে অভিনয় করার—একই নাটক যখন। কমলদা রাজি হলেন না। এ ছাড়াও, কখনও কালী ব্যানার্জি, কখনও অরূপ গুহঠাকুরতার মতন খ্যাতিমান কয়েকজন এসেছেন, কমলদা নিতে রাজি হননি। তিনি সম্পূর্ণ নতুনদের গড়েপিটে নিতে চাইতেন। আমাদের মধ্যে দীপক মজুমদারের অভিনয় ও গানে যথেষ্ট দক্ষতা

ছিল, বাকি সবাই আনাড়ি, কিন্তু সবাই মিলে দারুণ মেতেছিলাম। মুক্তধারার একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এক ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী তরুণী, তিনি পরে গৌরী আইয়ুব।

হরবোলা চলাকালীনই ডি. কে. আর একটি বিরাট কাণ্ড করেছিলেন। সিনেট হলে কবি সম্মেলন। তার আগে কবি সম্মেলন জিনিসটার অতটা চল ছিল না। হঠাৎ ওই কবি সম্মেলনের চিন্তা ডি. কে.-র মাথায় কেন এসেছিল, তা বলতে পারব না আমি, তখনকার কালের প্রতিষ্ঠিত কবিরাই ছিলেন এ ব্যাপারে ডি. কে.-র সহায়তাকারী। অত বড় কবি সম্মেলন, তার আগে তো কখনওই নয়, পরেও এ পর্যন্ত আর একটাও হয়নি। সিনেট হল ছিল বোধহয় কলকাতার পেল্লায়তম হল, সেখানে দু' দিন ধরে কবি সম্মেলন, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কবির। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ সবাই বেঁচে। যতদূর মনে পড়ে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর চমৎকার কণ্ঠস্বরে নিজের অনেকগুলি এবং তাঁর বন্ধু প্রবাসী অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ ঝড়ের বেগে পাগলাটে গলায় পর পর অনেকগুলো কবিতা পড়ে গেলেন। কী দারুণ সিরিয়াস মুখ করে তিনি পড়েছিলেন 'সেই সব শিয়ালেরা—'। আর কোনও প্রকাশ্য সভায় তাঁকে আর দেখা যায়নি। দু'দিনের অনুষ্ঠানের প্রায় শতাধিক কবিদের নামের তালিকায় সবচেয়ে শেষের নামটি ছিল আমার।

সেই কবি সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে যদিও নাম ছিল আরও দু'জনের, নীহাররঞ্জন রায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব—কিন্তু ব্যবস্থাপনা সব ডি. কে.-রই। ডি. কে. কোনওদিনই ছোট আকারের কিছু ভাবতে পারতেন না। খরচপত্রও নিশ্চয়ই সব তাঁর পকেটেরই। এবং তিনি প্রত্যেককে বলে দিতেন, মাইক থেকে কতটা দূরে মুখ রাখতে হবে, শব্দের শেষ অক্ষরটির ওপর কেমনভাবে জোর দিতে হবে। এমনকী, তিনি হরবোলার মঞ্চে এই কবি সম্মেলনের একটি প্রাক রিহার্সালেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনওমতে একটা কবিতা পড়ে দিলেই হল না। প্রতিটি বাক্য ও শব্দ যেন শ্রোতাদের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছয়, সেজন্য প্রস্তুতি দরকার। ডি. কে.-র এই উদ্যোগের জন্যই সিনেট হলের অন্তত হাজার পাঁচেক শ্রোতা পিন ফেলার শব্দ না করে সব কবিতা শুনেছিল।

যে কোনও কারণেই হোক, কমলদা এই কবি সম্মেলনের ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করেননি। আমাদের নাটকের রিহার্সালের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কিছুদিনের জন্য এই কবি সম্মেলন নিয়ে মাতামাতি করাটা তিনি খুব সুনজরে দেখতেন না। পরে এই জন্য তিনি আমাদের একই পার্ট অন্তত পঞ্চাশবার পুনরুক্তি করিয়ে খুব শাস্তি দিয়েছিলেন।

ডি. কে. ও কমলদার বন্ধুত্ব ছিল খুবই প্রগাঢ়। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ ছিল না। দু'জনেই পরস্পরকে বুঝতেন খুব সঠিকভাবে। কমলদা মাঝে মাঝে ডি. কে.-কে খোঁচা মারতেন বড়লোক বলে। ডি. কে. মুচকি মুচকি হাসতেন। কারণ কমলদাও কলকাতার এক বিশিষ্ট বনেদি বাড়ির মানুষ। মাঝে মাঝে একখানা জামেয়ার গায়ে জড়িয়ে আসতেন, যার দাম অন্তত আট-দশ হাজার টাকা। ওঁদের সেই বন্ধুত্বের মধ্যে হঠাৎ একদিন বজ্রপাত হল।

কতদিন ধরে মুক্তধারার রিহার্সাল চলেছিল মনে নেই, এক বছর তো হবেই। এর মধ্যে সকলেই এক আধ দিন অনুপস্থিত থেকেছে। একমাত্র ডি. কে. ছাড়া। প্রত্যেকদিন পাঁচ ছ' ঘণ্টা ধরে তিনি বসে থাকতেন একটানা। তিনি নিজে অভিনয় করেন না। তিনি নাট্য-পরিচালক নন। অথচ ওই নাটকই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কী তীব্র শখ। রিহার্সালের সময় কারুর উচ্চারণ বা ডেলিভারি পছন্দ না হলে তিনি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলতেন, কমলবাবু।

কমলদা মাঝে মাঝে কিছু দুষ্টুমি করতেন। জিনিসটাকে মজা বলেই ধরতাম। এক-একদিন এসেই বলতেন, আজ আধঘণ্টা পরেই কিন্তু চলে যাব। কিন্তু থাকতেন পাঁচ ঘণ্টা। আবার কোনওদিন তিনটের সময় আসব বলে আসতেন সাতটায়। কিন্তু যে কোনও ব্যবহারই কমলদাকে মানায়। দেরিতে আসা বা তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য তিনি চমকপ্রদ সব কারণ দেখাতেন। যেমন, আজ মশারি কাচতে হল বাড়িতে। আজ ঠাকুরের শয়ান দিতে হবে, ইত্যাদি। কোনওদিন কমলদা এসে হয়তো ঘোষণা করলেন, সেদিন তিনি এক ঘণ্টার বেশি কিছুতেই থাকতে পারবেন না। এক ঘণ্টা পরে আমরা বললাম, কই কমলদা, যাবেন না? কমলদা এক ধমক দিয়ে বলতেন, থামো তো। বেশি বাঙালপনা কোরো না।

মুক্তধারা অভিনয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মঞ্চ বাঁধা হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে, পরিপূর্ণ রিহার্সাল চলছে। ডি. কে. অত্যন্ত পারফেকশানিস্ট। কারুর সামান্য পদক্ষেপের ক্রটিও তিনি পছন্দ করেন না। তা ছাড়া কমলদা একেবারে শেষ মুহূর্তে দু' একটা মন্ত্রগুপ্তি শিখিয়ে দেন, তাতে এক-একটা চরিত্রের ব্যাখ্যা একেবারে বদলে যায়। আমরা তার অপেক্ষায় আছি। অভিনয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসে, ততই ডি. কে.-র মুখ-চোখ খুব সিরিয়াস হয়ে আসে। যেন সমস্ত পরীক্ষাটা তাঁরই।

অন্য কেউ এতটা নিখুঁতভাবে করতে পারলে ডি. কে.-র মতন খুশি হতে আর কোনও মানুষকে দেখিনি। সেই জন্য, ডি. কে.-কে খুশি করবার জন্য, তাঁর মুখের হাসি দেখবার জন্যই আমরা প্রাণপণে খাটতাম।

সেদিন এক বুধবার, তার ঠিক দু'দিন বা তিনদিন পরেই আমাদের প্রকাশ্য অভিনয়। কার্ড বিলি করা হয়ে গেছে। সেদিন পূর্ণ রিহার্সাল হবে। কমলদা সেদিন কেন যেন গোড়া থেকেই চঞ্চল। মাঝে মাঝেই বলছেন, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পনেরো-কুড়ি মিনিট পর পরই তিনি বলছেন, তোমরা যা ভাল বোঝো করো। আমি যাচ্ছি। একথা শুনে ডি. কে. চওড়াভাবে হেসে কমলদার দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃশব্দে। আমরা সবাই কমলদার এই খেলাটা জেনে গেছি। কিন্তু কমলদা সেদিন বারবারই ওই কথাটা বলতে লাগলেন এবং দু' একবার যেতে উদ্যত হলেন পর্যন্ত। এক সময় ডি. কে. জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আজ পালাবার কারণটা কী?

কমলদা বললেন, আজ পৌষ সংক্রান্তি, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পিঠে খেতে হবে।

ডি. কে. সেইরকমভাবে হেসে হাঁক দিলেন, গোবিন্দ!

গোবিন্দ ও বাড়ির ভৃত্য। সে অবিলম্বে বহু প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এল। নানারকমের

পিঠে। ডি. কে.-র সব কিছু খেয়াল থাকে, সেদিন আর সন্দেশ শিঙাড়া নয়, আমাদের জন্য পিঠে এসেছে।

কমলদা তার কিছুই স্পর্শ করলেন না। কমলদা একেবারেই ভোজনবিলাসী নন। কোনওদিনই উনি খাবার-টাবার খান না। সুতরাং আমরা ভেবেছিলাম পিঠের ব্যাপারটা ছুতো। যথারীতি কমলদা শেষ পর্যন্ত থেকেই যাবেন।

কিন্তু সেদিন তিনি মন দিতে পারছিলেন না। রিহার্সালের মাঝে মাঝেই বলছিলেন, আমি এবার যাই।

ডি. কে. জিজ্ঞেস করলেন, এবার কেন যাবেন কমলবাবু? পিঠে তো এসেছে।

কমলদা বললেন, ও পিঠে নয়। আমার স্ত্রী পিঠে করেছেন, সেটা খেতে হবে।

—সে তো যখন বাড়ি ফিরবেন, তখনই খেতে পারবেন।

—না, সে একটা ব্যাপার আছে।

কমলদার মুড ছিল না বলেই হয়তো আমরাও সেদিন অভিনয়ে নানারকম ভুল করছিলাম। ডি. কে. ক্রমশ বেশি সিরিয়াস হয়ে উঠছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কোনও ত্রুটি থাকুক, তিনি চান না।

হঠাৎ রিহার্সালের মাঝপথে কমলদা আবার বললেন, তোমরা করো, আমি চলি।

ডি. কে. বললেন, আর একটু থাকুন, আর এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

কমলদা বললেন, না, না, আমার আর থাকার উপায় নেই। বুঝলেন না, পিঠে খেতে হবে বাড়িতে গিয়ে—

হঠাৎ যেন মাঠের মধ্যে একটা বোমার বিস্ফোরণ হল। ডি. কে. গম্ভীর গর্জনে বললেন, আই হ্যাভ এনাফ অব দিস...। তারপর পেছন ফিরে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বললেন, ননসেন্স।

আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট সত্যিই কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার মতন। তলায় তলায় কোথায় কতখানি টেনশান তৈরি হয়েছিল, ঠিক বুঝিনি। সত্যিই, ডি. কে.-কে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল ধৈর্যের শেষ সীমায়। আবার একথাও ঠিক, কমলদার গলায় সেদিন আন্তরিকতাও ছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষেই চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। সোজাসুজি মাঠটা পার হয়ে এসে কমলদা আমাকে বললেন, বইটা দাও তো, সুনীল।

কমলদার হাতে রোজই একটা করে ফরাসি বই থাকে, যার মধ্যে তিনি টাকা রাখেন। বইটা আমার কাছে ছিল সেদিন। সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে তিনি হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই ঝগড়ার দৃশ্যে আমরা বাক্যহীন স্থাণুবৎ হয়ে রইলাম। ডি. কে. ওপরে উঠে গেলেন, কমলদাকে বাধা দেবার কথাও মনে এল না।

প্রত্যেকদিনই আমরা কমলদার সঙ্গে ফিরি। আমরা সবাই তখন থাকি শ্যামবাজারের দিকে। কমলদা শ্যামবাজার পর্যন্ত এসে তারপর হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যান। কিংবা কোনওদিন হঠাৎ তিনি দৌড়ে উঠে পড়েন একটা চলন্ত বাসে। ডি. কে. যেসব দিন আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দিতে আসতেন, সেদিনও কমলদা কিছুতেই

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে আর যেতে চাইতেন না কারুর সঙ্গে। অর্থাৎ কমলদা কারুকে তাঁর বাড়ি চেনাতে চাইতেন না। শুনেছিলাম তিনি অজ্ঞাতবাস করতেন। কোন রহস্যময় কারণে তিনি সেটা করতেন, তা এখনও জানি না। কলকাতা শহরে কেউ তাঁর ঠিকানা জানত না। সে সময় কমলদার কোনও নির্দিষ্ট জীবিকাও ছিল না। খুব সম্ভবত তিনি সে সময় সিগনেট বুকশপের শিল্পসজ্জার পরামর্শদাতা ছিলেন এবং 'তদন্ত' নামে একটি গোয়েন্দা কাগজ বার করেছিলেন কিছুদিন। সেই পত্রিকায় 'দারোগার দপ্তর' নামে দুর্লভ বইটির পুনর্মুদ্রণ হচ্ছিল মনে আছে, আর কমলদার সম্পাদকীয়গুলি হত অনবদ্য।

ডি. কে. আর সে রাত্রে ওপর থেকে নামলেন না। বুড়ো ওপর থেকে ঘুরে এসে জানাল, এখন ডি. কে.-কে ঘাঁটাতে গেলে আরও গোলমাল হবে। এদিকে কমলদাও অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আমাদের নাটক বন্ধ হয়ে গেল কিনা বুঝতে না পেরে আমরা বাকরুদ্ধ অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। একটিমাত্র বাক্যের এমন মহান বিবাদের দৃশ্য কবে কে দেখেছে আর!

পরদিন ডি. কে.-র ছোটভাই মানিক গুপ্ত এসে শ্যামবাজারে দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে। মানিকদা বললেন, কীসব ছেলেমানুষি কাণ্ড বলো তো। এখন অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবে। সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে। ডি. কে. সেই থেকে নিজের ঘরে বসে আছে। দরজা খুলছে না, কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। কোথায় কমলবাবু?

আমরাও কম ত্যাঁদোড় ছেলে ছিলাম না। কমলদা অজ্ঞাতবাস করতে চাইলেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারেননি। অনেক গোয়েন্দাগিরি করে কমলদার বাড়ি খুঁজে বার করা হল। কমলদা প্রায়ই শিল্পী সুনীল পালের নাম করতেন। তাঁর গড়া মূর্তি একটু একটু করে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা দেখতেন, যেমন যাওয়া-আসার পথে ওঁকে দেখেন, এই রকম। আমার কলেজের বন্ধু শিবশম্ভুকে ধরে গেলাম সুনীল পালের বাড়ি। সেটা যশোর রোডের ধারে পাতিপুকুরে। তিনি বললেন, কমলবাবুর বাড়ি, এই তো পাশেই।

একটি ছোট্ট নতুন একতলা বাড়ি। সংক্ষিপ্ত বাগানের সামনে কঞ্চির গেট। সেই গেট খুলে ঢুকছি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। দু'বার তাঁর নাম ধরে ডাকতেই তিনি গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এসে সহাস্য সুরে বললেন, এসো, এসো।

আমরা এসে, জাদুঘরের মতন অসংখ্য জিনিসে সাজানো কমলদার বাইরের ঘরে বসলাম গুটি গুটি। কমলদা পাশের ঘরের দরজার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে দরাজ গলায় বললেন, বড়বউ, এইসব ছেলেরা এসেছে, ওদের একটু মিষ্টিমুখ করাও।

ডি. কে.-র ভাই মানিক গুপ্ত একজন ডাকাবুকো লোক। তিনি বললেন, আরে কমলবাবু, আপনার বাড়ি যদি খুঁজে না পেতাম, তা হলে কী হত বলুন তো! আপনি আর যেতেন না? হাজারখানেক লোককে কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে—

কমলদা সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে হেসে উঠলেন হা হা করে। তারপর অন্য পাঁচরকম রঙ্গরসিকতা শুরু করলেন এমন ভাবে যে আমাদের ভয় হল, উনি বোধহয়

আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবেন। উনি রাগারাগি করলে বরং আমরা নিশ্চিন্ত হতাম।

এক সময় আমরা বললাম, কমলদা আপনাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

কমলদা বিনা বাক্যব্যয়ে জামা পরে এলেন। সদলবলে আমরা এলাম হরবোলায়। বাইরে সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডি. কে.। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে সহাস্যে 'কী কমলবাবু' বলে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

এরপর চার শনি রবিবার ধরে হয়েছিল মুক্তধারার অভিনয়। কোথাও কোনও কিছুর অভাব ছিল না। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন সূক্ষ্ম চিড় কি রয়ে গিয়েছিল? আমরা ঠিক টের পাইনি। মুক্তধারা নাটকে আমার ছিল যন্ত্ররাজ বিভূতির ভূমিকা। অর্থাৎ ভিলেন। গলায় একটা মস্ত গাঁদা ফুলের মালা, নাটকের শেষ দৃশ্যে, কমলদা বলে দিয়েছিলেন, বাঁধ কে ভাঙলে কে ভাঙলে—এই চিৎকার করতে করতে আমি মালাটাকে ছিঁড়ে ফেলব। আমি ঝোঁকের মাথায় এমন জোরে হাত চালালাম যে, সেই ছিন্নমালা উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ল দর্শকদের মাঝখানে চিত্রতারকা অরুন্ধতী মুখার্জির কোলে। হাসির ধুম পড়ে গেল তাই নিয়ে।

এর পরও অবনীন্দ্রনাথের লম্বকর্ণ পালার রিহার্সাল চলেছিল কিছুদিন। তারপর একসময় নিজস্ব নিয়মে হরবোলা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়।

২.

শ্যামবাজার পাঁচমাথার কাছে ইউনাইটেড কফি হাউস নামে অধুনালুপ্ত একটি সরাইখানাতে একদা আমাদের আড্ডা ছিল। সেখানে কোনও এক রবিবার সকালে কমলকুমার মজুমদার তাঁর প্রথম উপন্যাস আমাদের কয়েকজনকে উপহার দেন। উপন্যাসটি বেরিয়েছিল একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকায় ক্রোড়পত্র হিসেবে, পত্রিকাটির নাম আমরা জানতে পারিনি, কেননা, কমলকুমার পত্রিকাটি থেকে তাঁর রচনাংশ ছিঁড়ে আলাদা কাগজে নিজে মলাট সেলাই করে একটি সম্পূর্ণ পুস্তক হিসেবেই দিয়েছিলেন আমাদের। উপন্যাসটির নাম অন্তর্জলী যাত্রা, যার শুরুতেই ভোরবেলার বর্ণনা এইরকম : আলো ক্রমে আসিতেছে। আকাশ মুক্তা ফলের ন্যায় হিম নীলাভ।

কমলকুমার মজুমদারের রচনার সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। মানুষটিকে এর বছর কয়েক আগে থেকেই চিনি, ১৯৫৩ সালে সিগনেট প্রেসের পরিচালক দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি. কে. নামে পরিচিত ছিলেন ছোট-বড় সকলের কাছে) আমাদের মতন সদ্য কলেজে পড়া ছোকরাদের নিয়ে হরবোলা নামে গড়েছিলেন একটি নাটকের দল, তার পরিচালক হিসেবে আসেন কমলকুমার, সেই সূত্রে তাঁকে আমরা কমলদা বলে ডাকি। কুচকুচে কালো রঙের একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধুতি ও লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবি পরা, কণ্ঠস্বর গমগমে। তিনি সর্বক্ষণ এলাচ ও লবঙ্গ খেতেন, অত এলাচ-লবঙ্গ মানুষের সহ্য হবার কথা নয়, পরে জেনেছিলাম, আমাদের কাছ থেকে ওঁর মুখের দেশি মদের গন্ধ লুকোবার জন্যই ওই প্রকার চেষ্টা। হাস্য পরিহাসে, বুদ্ধির প্রাখর্যে ও বাকবৈদগ্ধ্যে অতুলনীয়, কিন্তু কোনও এক রহস্যময় কারণে তিনি একটি সাধারণ চটের থলে (কাঁধে ঝোলান শান্তিনিকেতনী ঝোলা নয়,

যাকে বলা হয় রেশন ব্যাগ) বহন করতেন সব সময়, যার মধ্যে থাকত তাঁর সর্বক্ষণ পাঠ্য বইপত্র ও টাকাপয়সা। চটের থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকা তুলে এনে ট্রাম বাসের টিকিট কাটতে আমরা আগে কখনও কারুকে দেখিনি। হিসেব অনুযায়ী তখন তাঁর বয়েস আটত্রিশ, কিন্তু তিনি এমন ভাব করতেন যেন জন্মেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরদের স্বচক্ষে দেখেছেন। স্কারোঁ নামে এক মধ্যযুগীয় ফরাসি কবির রচনা এখন অনেক ফরাসিই পড়েন না, কিন্তু কমলদা যখন তখন স্কারোঁ কিংবা ভিয়োঁর মতন কবিদের মূল রচনা উদ্ধৃত করতেন, আবার বাংলায় কাঙ্গাল হরিনাথ রচিত 'হারামণি' থেকেও স্তবক উদ্ধার করতেন সাবলীলভাবে।

আমরা 'হরবোলা' প্রতিষ্ঠানের চ্যাংড়ারা আমাদের মোশান মাস্টার কমলদার অন্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম প্রথম দিন থেকেই, কিন্তু তাঁর রচনা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না আমাদের। ক্রমে লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম যে একদা উনি লেখক ছিলেন। নরেশ গুহ সিগনেট প্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তখন, তিনি একদিন বলছিলেন, তোমরা জানো না, কমলবাবু এক সময় চমৎকার কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছেন 'চতুরঙ্গ' ও 'সাহিত্য পত্রে'। ডি. কে.-ও বলতেন, কমলবাবু, আপনি আর লেখেন না কেন? কমলদা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। মনে হত যেন, লেখার ব্যাপারে ওঁর কোনও অভিমান বা বিরাগ জন্মে গেছে। আমরা তখন কবিতা রচনার ব্যাপারে খুব মাতামাতি করছি এবং সদ্য দাঁত ওঠা কুকুরছানার মতন কামড়ে বেড়াচ্ছি একে তাকে, কমলদা পরিহাস করতেন আমাদের।

'হরবোলা' কয়েক বছরের মধ্যেই উঠে যায় কিন্তু আমরা তখনও কমলদার সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকতাম। এই সময় তিনি হঠাৎ আবার লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস দেখেই আমরা স্তম্ভিত। এরকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে। গুরু-চণ্ডালী শব্দের এমন অবাধ মিশ্রণ আগে কখনো দেখিনি, কিছু কিছু শব্দ যেন সদ্য আবিষ্কৃত। উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রও এক চণ্ডাল ও এক ব্রাহ্মণী, এবং বাক্যবন্ধও অতি জটিল, বাংলা ব্যাকরণের কোনও নিয়মের ধার ধারে না। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, বাংলা গদ্যভঙ্গি ইংরেজি সিনট্যাক্স অনুযায়ী চলে, ফরাসি ভাষায় পণ্ডিত কমলকুমার ফরাসি সিনট্যাক্সে বাংলা চালু করছেন। এ কথাও পুরোপুরি সত্যি নয়, ফরাসিতে বিশেষণগুলি কর্তার পরে বসে, লাল ফুলের বদলে ফুল লাল যেরকম, তা ছাড়া ফরাসি ধাতুরূপ ইংরিজির চেয়ে বেশি, কিন্তু সংস্কৃতের মতন। এর চেয়েও বড় কথা, যতদূর জেনেছি, ফরাসি গদ্য ফরাসিদের মুখের ভাষারই অনুসারী, পৃথিবীতে সব ভাষাতেই গদ্য ও মৌখিক ভাষা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, কৃত্রিম অলংকারবহুল ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তার বাহক না হয়ে বাধা হয়, কিন্তু কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে তাঁর লিখিত বাক্যের হাজার যোজন ব্যবধান। তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি মধ্য কলকাতার, অনেক সময় যাকে আমরা বলি কাঁচা বাংলা, (অর্থাৎ অতিশয় পরিপক্ক) এবং সব সময় রঙ্গরস মিশ্রিত। অথচ তাঁর লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বারবার না পড়লে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষণাৎ অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা,

অনেকটা কবিতার মতন বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি শব্দের প্রতি এমনই মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই জাদু।

এর পর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অন্য রচনাগুলি, বছরে একটি বা দুটি, কখনও বা দু' বছরে একটি, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প, 'মতিলাল পাদ্রী' এবং 'তাহাদের কথা', তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয় বেশিরভাগই ছোট পত্রিকায়, এক্ষণেই বেশিরভাগ, আমরা কৃত্তিবাসের গোটা একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলাম তাঁর বড় উপন্যাস 'সুহাসিনীর পমেটম'। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নাম 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', 'শ্যাম নৌকো', 'খেলার প্রতিভা', 'কয়েদখানা', 'রুক্মিণীকুমার'—এর মধ্যে পুস্তকাকারে পাওয়া যায় দু' একটি মাত্র এবং তাঁর 'গল্প সংগ্রহ' এবং 'নিম অন্নপূর্ণা' নামে গ্রন্থ। তবু কমলকুমার মজুমদার বরাবরই রয়ে গেলেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে, বাইরে। কোনও সংকলনে তাঁর গল্প নেওয়া হয়নি, কোনও সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তাঁকে (তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন কিনা, সেটা আলাদা কথা), বেশিরভাগ পাঠকের কাছেই তিনি রয়ে গেলেন অজ্ঞাত, সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন কিন্তু তাঁর রচনা পড়েননি এক লাইনও। নিজের রচনার দুরূহতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তিনি, 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, আমার বই উনতিরিশখানা বিক্রি হয়েছিল, তারপর তিরিশ জনই দোকানে বই ফেরত দিয়ে গেছে। তবু, দিন দিন যেন আরও বেশি দুরূহতার সাধনায় ব্রতী হলেন।

খুব দুর্মুখ ছিলেন, বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটানোর আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর, সমসাময়িকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি ছোট দল, পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট দল তাঁর লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছে, বিশেষত কবিরা। ওয়েলিংটনের কাছে একটি বাংলা মদের দোকানে কমলকুমার মজুমদারের সান্নিধ্যে কেটেছে আমাদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বছর। পুরো এক গ্লাস নীট বাংলা মদ (৩৫ শক্তি, আজকাল পাওয়া যায় না) এক চুমুকে খেয়ে ফেলে অবিচলিত থাকার মতন দ্বিতীয় মানুষ আমি সারা পৃথিবীতে দেখিনি। এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টাব্যাপী প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে কথাবার্তায় চুম্বকাকৃষ্ট করে রাখার ক্ষমতাই বা ক'জনের থাকে। বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নতুন চিন্তা, নিজে ছবি আঁকতেন ও খ্যাতনামা চিত্র সমালোচক ছিলেন, গ্রামের জীবন, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও কথা ভাষায় রূপান্তর—এমন কতদিকে ছিল তাঁর আগ্রহ। সাহিত্য তো ছিল তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাক্যকে তিনি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতেন, আমায় রসেবশে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। ওয়েলিংটনের সেই সান্ধ্য আসর থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল স্বল্পজীবী পত্রিকা, একটি নাম 'তদন্ত', যেটি গোয়েন্দা ও অপরাধ কাহিনী বিষয়ক ও আর একটির নাম 'অঙ্ক ভাবনা', যেটির বিষয় গাণিতিক দর্শন। হ্যাঁ, একই ব্যক্তি এই দুটি পত্রিকার কথা চিন্তা করেছিলেন।

তিনি এই পৃথিবীতে ৬৪ বৎসর থেকে গেলেন। শেষ জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে, যদিও শুনেছি, তাঁর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। কয়েক বছর খুব কষ্ট পেলেন হাঁপানি রোগে, তাতেও তাঁর তীক্ষ্ণতা ও রসবোধ এক বিন্দু কমেনি, নবীনতর কিছু লেখকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গেছে বরাবর।

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই বিষয়ের গভীরতায় অসাধারণ, ঠিক এমন চোখ দিয়ে মানুষের জীবন আর কেউ দেখেননি। ভাষার কঠিন আবরণের জন্য তা পাঠকদের কাছে পৌঁছয়নি, রচনাগুলি রইল ভবিষ্যৎ কালের জন্য, ভবিষ্যতের উদ্যমশীল রসভোক্তাদের জন্য।

আমি কমলকুমার মজুমদারকে আমার একটি বই উৎসর্গ করেছি। সেই বইয়ের এক কপি তাঁকে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, কমলদা, এ বইটা আপনার বাড়ির কোনও খাট বা টেবিলের পায়া যদি ঠকঠক করে তখন সেই পায়ার নীচে গুঁজে দেবার জন্য বইটা রেখে গেলাম।

বিস্মৃত লেখক

পূর্ণিয়া শহরের ভাট্টাবাজারে বাস থেকে নেমেই মনে পড়ল সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা। আমার কাছে পূর্ণিয়া শহরের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর নামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একটি পেট্রোল পাম্প ও বেশ বড় আকারের মনোহারি দোকান। দোকানের পরিচালকরা বঙ্গভাষী। সেখানে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়িটা কোথায় ছিল বলতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

আমি পুনশ্চ সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম বললাম। তিনি ঠিক চিনতে পারলেন না, কিংবা ওই নামটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দোকানের অপর একজন পরিচালককে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই দ্যাখো তো এই ভদ্রলোক কাকে খুঁজছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে আমার প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলাম। তিনি দু' এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি কার বাড়ি খুঁজছেন? ঠিকানা জানেন?

আমি বললাম, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি, যিনি লেখক ছিলেন।

সাধারণত কোনও সত্যিকারের লেখকের নামের আগে বা পরে, লেখক শব্দ ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে না। তবু অবস্থা বিপাকে করতেই হয়। সাহিত্য অনেকেই পড়ে না, অনেকেই সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য মানুষ মনে করে না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, পূর্ণিয়া শহরেও বাঙালিদের কাছে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম নিশ্চয়ই পরিচিত হবে, শুধু লেখক হিসেবে নয়, সমাজ সেবক হিসেবেও।

দোকানের সেই পরিচালকদের কাছেও সতীনাথ ভাদুড়ীর নামটা পরিচিত ঠিকই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর এত বছর বাদে হঠাৎ তাঁর বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে প্রশ্ন শোনার কথাটা খুবই অপ্রত্যাশিত বলেই ধরতে পারছিলেন না।

বুঝতে পেরে বললেন, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন।

আমি রীপ ভ্যান উইঙ্কল নই যে, এ খবর জানব না। বললাম, আমি ওঁর বাড়িটা কোথায় ছিল, তাই জানতে চাইছি।

কেন, সে বাড়িতে গিয়ে কী করবেন। সেখানে তো কেউ থাকে না।

এবার আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। সত্যিই তো, সতীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ির খোঁজ করছি কেন? কী হবে সেখানে গিয়ে? আমরা নিজেদের অনেক গতিবিধির মানে জানি না। সতীনাথ ভাদুড়ীকে আমি কোনওদিন চর্মচক্ষে দেখিনি, তাঁর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনও ইচ্ছে আমার হয়নি। এখন তাঁর বাড়িতে কেন যেতে চাই?

একটা ছুতো খুঁজে পেয়ে গেলাম। সতীনাথ ভাদুড়ীর নানা লেখায় তাঁর বাড়ির বাগানের উল্লেখ আছে। বাগান করা তাঁর প্রিয় ব্যসন ছিল। সহকারের সঙ্গে মাধবীলতা মেলাবার সেই বিখ্যাত কৌতুক। বললাম, ওঁর বাগানটা দেখতে চাই, খুব নাকি ভাল বাগান—

সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। সেসব বাগান টাগান আর...। ভদ্রলোকের গলায় আফশোসের সুর ছিল। স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে কীসব চেষ্টা হয়েছিল, সে কথাও বললেন। তা সত্ত্বেও আমি বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম। বছর কয়েক আগের কথা, তখন বাড়িটার সদর ছিল তালাবন্ধ, গেটের সামনে আগাছা। এখন কী অবস্থা জানি না।

লেখকদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা কিংবা মৃত লেখকের বাড়ির বাগান দেখতে যাওয়া আমার স্বভাবের অন্তর্গত নয়। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে আমার দুর্বলতা অত্যধিক। বিশেষত যত দিন যাচ্ছে ততই বাংলা ভাষার পাঠকদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে বিস্মরণ এসে যাচ্ছে বলে আরও বেদনা বোধ করি। ইদানীংকালের অনেক নবীন পাঠক এঁর নামও শোনেননি, এঁর অনেক বই এখন ছাপা নেই। এই লেখকের স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা হবে না। সতীনাথ ভাদুড়ী জীবিতকালে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেননি কখনও, কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে দেখাশুনা করেননি বিশেষ, প্রায় সমস্ত লেখাই ডাকে পাঠাতেন। কোনওদিন সেরকম কোনও সভা সমিতিতে যাননি। তিনি শুধু লিখতেন। এবং তাঁর লেখার সঙ্গে অর্থোপার্জনের সম্পর্কটাও ছিল অপ্রত্যক্ষ। এবং এরকম লেখক বাংলা ভাষায় খুব বেশি জন্মায়নি। প্রথম বইটিতেই তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর পরের বইগুলিও ভারতবর্ষের সব ক'টি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। যদি পুরস্কার অর্থে স্বীকৃতি ও সম্মান বোঝায়। সতীনাথ প্রত্যেকটি বই লিখতেন নতুন পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এবং এই একজন বিরলজাতের লেখক, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে পেরেছেন নিজের রচনা থেকে।

তাঁর যে-কোনও বই পড়লেই বোঝা যায়, কী অসম্ভব শক্ত এই ধরনের বই লেখা। তাঁর রচনার গতি কোথাও দুর্বার নয়, বিন্দু বিন্দু রস চয়ন করে মৌচাক সৃষ্টির মতন। জাগরী ছাড়া তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই আমার কাছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দুই খণ্ড, 'অচিন রাগিণী', 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', 'জলভ্রমি' এবং 'সঙ্কট'। ঢোঁড়াই চরিত মানসের কথা আমি বারবার নানা জায়গায় উল্লেখ করেছি। এরকম বিস্ময়কর বই যে-কোনও দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। এই বইখানি বাংলার আধুনিক ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। রিক্ত সর্বহারাদের নিয়ে বাংলায় কিছুই লেখা হয়নি এই অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই অবশ্য ঢোঁড়াই চরিত মানস পড়েননি। পড়লেও বোধহয় পছন্দ হবে না। কারণ বইখানি শেষ পর্যন্ত শান্ত রসের। বস্তিবাসীর জোলো প্রেমকাহিনী যেমন এটা নয়, তেমনি এতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিকটাও বড় করে দেখানো হয়নি। নিদারুণ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের কথা আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে অধ্যাত্মরসে এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ সরল নিম্নবিত্ত মানুষ

আশ্রয় ও সান্ত্বনা পেতে চায়, সতীনাথ ভাদুড়ী সেই জীবন-সত্যের কথাই বলেছেন। সাহিত্যের বিচারে বইটি আশ্চর্য সার্থক। বইটি সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজেরও খুব প্রিয় ছিল; কারণ অন্য একটি লেখায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এই বইটি পাঠকদের সমাদর লাভ পায়নি। যদি পেত তিনি বইটার আবার পরিমার্জন করতেন, আরও এক খণ্ড লিখতেন। বাংলা সাহিত্য সেই লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখার কথা ভাবলে বাংলাদেশের এই দুঃসময়ের কথাও মনে পড়ে। মনে হয় সত্যিকারের সৎ ও অকৃত্রিম সাহিত্যের আজ সমাদর নেই। এক একজন লেখকের মৃত্যুর পরই পাঠকরা তাঁদের ভুলে যায়—হঠাৎ কোনও হুজুগে তাঁদের পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা হলে তা হলে জীবিতকালে কে আর অমরত্বের সাধনায় সাহিত্য রচনা করতে চাইবে? তাৎক্ষণিক হাতে-গরম লেখার যুগই বুঝি কায়েম হয়ে গেল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

জ্যোতির্িন্দ্র নন্দীর চেহারা ও ব্যবহার ছিল অবিকল একজন খাঁটি লেখকের মতন। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে যে-রকম লেখকের ছবি থাকে। তিনি কোনও গল্পের নায়কের মতন রূপবান ও সুপুরুষ নন, তিনি বীর বা যোদ্ধাদের মতন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নন, রাজনীতিবিদ বা অধ্যাপকদের মতন তুখোড় বাক্যবাগীশ নন, জাদুকরের মতন মোহিত করে দিতে পারেন না। তাঁর শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা, ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতন, মানুষটি লাজুক স্বভাবের। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অন্য কেউ তাঁর দিকে তাকাবে না, কিন্তু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবেন সকলকে। এই সব মানুষই স্রষ্টা। কোঁকড়ানো চুল ও পুরু লেন্সের চশমা সমন্বিত মুখটি দেখলে মনে হতে পারে একটি অতি সাধারণ মানুষের মুখ, এই মানুষটি সাধারণ নন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পুরোপুরি সাহিত্য জগতে ডুবে থাকা মানুষ। অর্থাৎ নারী, পুরুষ, শিশু, গাছপালা, গিরগিটি, শালিক, চড়ুই, পিঁপড়ে ইত্যাদি যা কিছুই দেখছেন, এই সব কিছুকেই ভাষার বন্ধনে বাঁধবার জন্য তাঁর মন সারাক্ষণ নিযুক্ত। সাহিত্য তাঁর জীবনে অতি তীব্র নেশার মতন। তিনি পাঠকদের মনোরঞ্জনের কথা চিন্তা করে লেখেননি, এমনকী অমরত্বও তাঁর লক্ষ্য ছিল না, সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট ও পাঠকদের অবজ্ঞা সহ্য করেও লিখে যাবেন এই আশায় যে মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার যোগ্য সমাদর হবে, এরকম রোমান্টিক ধারণাও তাঁর ছিল না। তিনি লিখতেন, তার কারণ লেখা ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল না, এবং সমস্ত প্রকৃত লেখকেরই যেমন লেখাটাই জীবিকা হয়, তাঁরও শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁর শরীর ও মন এই দুটিরই সমান টান ছিল সাহিত্যের জন্য। জীবনের অন্য কোনও দিকে তিনি কীর্তি স্থাপন করেননি, মনোযোগ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনও চাকরিও করতে পারেননি, তিনি শুধু সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর রক্তক্ষরণ ও আয়ুক্ষরণে তাঁর রচনাগুলি এক একটি উজ্জ্বল মণি হয়ে উঠেছে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার যেমন খেয়াল হয় সেই রকম লিখি। আমার যা মাথায় আসে, আমার যা ইচ্ছে হয়, যে-রকম খেয়াল হয়, সেই রকম লিখে যাই। খেয়াল কথাটার ওপর একটু জোর দিয়ে বলতেন। কোনও উপন্যাসই আগে থেকে ছক কেটে কিংবা প্লট ভেবে লেখেননি। একটা কোনও মুড বা বিশেষ একটা কোনও চরিত্র কিংবা 'খেয়াল' নিয়ে লিখতে শুরু করেছেন। এই রকম পরিকল্পনাহীন একজন লেখকই কিন্তু প্রায় প্রথম থেকেই নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করতে পেরেছিলেন। এটা বড় কম কথা নয়। তাঁর নিজস্ব ভাষা ব্যবহার এবং বিশেষ রকমের পর্যবেক্ষণ

শক্তির জন্য তিনি বরাবরই আলাদা ধরনের লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী থেকেই তাঁর এই নিজস্বতা টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে তাঁর এই উপন্যাস রীতিমত দুঃসাহসী।

কুমিল্লা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। গ্রাম্য প্রকৃতি তাঁকে সারা জীবন ছাড়েনি, কিন্তু জীবন বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্য রকমের নাগরিক। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁকে এই কথা বলেছিলেন। কুমিল্লা থেকেই লেখা শুরু করেন তিনি; ডাকে লেখা পাঠাতেন, ছাপা হয়েছিল ঢাকার 'সোনার বাংলা' ও অন্য দু' একটি কাগজে, দেশ পত্রিকাতেও ছাপা হয় এই রকম ডাকে-পাঠানো গল্প। ওঁর নিজের ভাষায়, "পাঠকদের স্বীকৃতি পাবার আগেই সম্পাদক ও অন্যান্য লেখকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।" কলকাতায় এসে উনি বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানিতে কেরানিগিরি করতেন, সেখানকার প্রচার সচিব ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিনি ওই নবীন লেখককে ডেকে আলাপ করে বলেছিলেন, তোমার লেখা পড়েছি। তুমি গ্রাম থেকে এসেছো। আগে কখনও কলকাতা দেখোনি? অথচ শহর সম্পর্কে তোমার কনসেপশান তো খুব পরিষ্কার।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে মিশিয়ে সৌন্দর্য-সন্ধানই ছিল তাঁর লেখার মূল সুর। তাঁর প্রকৃতি কিন্তু বিশাল কোনও পাহাড়, নিবিড় দুর্গম অরণ্য বা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র নয়। যেমন তাঁর রচনার মানুষরাও অতি সাধারণ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, সেই রকম তাঁর প্রকৃতিও ছোটখাটো ব্যাপার। একটা পুকুর, কিছু বুনো ঝোপ বা আগাছায় জঙ্গলে পরিণত হওয়া বাগান। তিনি অনেকদিন থাকতেন শিয়ালদার ওপারে, তখনও ওই সব অঞ্চলে কিছু কিছু সবুজের অস্তিত্ব ছিল, পুকুর, ডোবা, ঝোপঝাড় দেখা যেত। কলকাতা থেকে তিনি ফেরার সময়ে ট্রামে-বাসে না চড়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করতেন। কলকাতায় ব্যস্ত মানুষ, যন্ত্রের শব্দময় জীবন দেখতে দেখতে তিনি চলে যেতেন অন্যদিকের নিরালায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলিতে এই সব ব্যাপার মিলেমিশে আছে।

তাঁর সমস্ত গল্প উপন্যাসেই নারীর রূপ বর্ণনার সময় সুর মিলিয়ে এসে গেছে প্রকৃতির কথা। যেমন তাঁর চোখে নারী ও প্রকৃতি সমান। এ কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের নারী ও প্রকৃতি নয়, এর মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা নেই, এর মধ্যে আছে রূপদর্শন। তিনি প্রকৃতির বন্দনাকারী নন। তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়, সৌন্দর্য কোনও বস্তুবিশেষে নেই, তা শুধু আছে দেখার চোখে।

যেমন উদাহরণ হিসেবে গিরগিটি গল্পটি বলা যায়। এই গল্পের বৃদ্ধটি দেখে ভাড়াটে বাড়ির বউটির স্নানের দৃশ্য। বুড়োটির মনে যৌন-বাসনা নেই। সে দেখে এক উদ্ভাসিত রূপের প্রকাশ। এক নব-যুবতী অনেকখানি নিরাবরণ হয়ে স্নান করছে কুয়োর ঠাণ্ডা জলে, তার একাকিত্ব ও তার রূপ যেন সাবানের ফেনা ও গায়ের চামড়ার মতন মিলেমিশে আছে। মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে কতটা সুন্দরী তা আমরা জানি না, কিন্তু সেই বৃদ্ধটির চোখ তাকে সুন্দরীতমা করে তোলে। মেয়েটিও দেখে, সে

দেখে নির্জনতার মধ্যে কুয়োতলার শ্যাওলায় পড়েছে রোদ, কচু গাছে উড়ে এসে বসে প্রজাপতি, জলের চিক্কণ ধারা, একটি গিরগিটি, সব মিলিয়ে একটা নির্মাণ। বস্তুত বৃদ্ধ ও মেয়েটি একই রূপ দেখছে, যাকে গাল-ভরা কথায় বলা যায়, নিখিল বিশ্বের রূপ, বুড়ো ও নগ্ন মেয়েটিও ওতপ্রোতভাবে যার অন্তর্গত।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দর্শনের এমন দুঃসাহসী গল্প বাংলা কেন, যে-কোনও ভাষাতেই ক্বচিৎ লেখা হয়।

এক সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনা সম্পর্কে অশ্লীলতার অপবাদ উঠেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী থেকে শুরু করে প্রায় সব উপন্যাসই, এবং ছোট গল্পের মধ্যে ছিদ্র, সোনার চাঁদ, এমনকী গিরগিটিটি সম্পর্কেও অনেকে এই অভিযোগ এনেছে। এ বড় আশ্চর্য কথা। তাঁর গল্পের তথাকথিত অশ্লীলতা একেবারেই নেই, কারণ তিনি কখনও সম্ভোগ কিংবা যৌন উল্লাসের কথা লেখেন না, তাঁর সমস্ত বর্ণনাই সৌন্দর্য চেতনার। এবং সামগ্রিক বর্ণনা না হলে সৌন্দর্য মূল্যহীন। তিনি একটা কাঁটা গাছ বা কাঠ পিঁপড়ের ঝাঁক বা একটা ল্যাম্পপোস্টের কথা লিখতে গিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তাদের সম্পূর্ণতা ফুটিয়ে তোলেন, যে-কোনও গল্পে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবং তারা পৃথক থেকেও মানুষের মনের ভেতরকার কাঁটা গাছ বা কাঠ পিঁপড়ের ঝাঁক বা ল্যাম্পপোস্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সুতরাং তিনি নারী-পুরুষের শরীরকেও কখনও অসম্পূর্ণ রাখেন না। শরীরের রূপকে যিনি সীমাহীন জায়গায় নিয়ে যেতে চান, সেই রকম লেখকের বর্ণনার মাঝখানে কোনও সীমারেখা টানার কথা কল্পনাও করা যায় না।

ছোটগল্পের জন্যই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বেশি প্রসিদ্ধ। চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা ছোটগল্পে একটা স্বর্ণযুগ চলছিল। সেই সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছোটগল্পে পাঠকদের বিস্ময়বোধ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'শালিক কি চড়ুই'-এর মতন গল্প-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় চিরকালের মতন স্থান পাওয়ার যোগ্য।

তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বারো ঘর এক উঠোন' সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের এরকম ছবি গড়তে বোধ করি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ পারেননি। আমার সবচেয়ে প্রিয় তাঁর 'মীরার দুপুর'। এতে অবশ্য কোনও বাস্তববাদী ছবি নেই, বস্তুত উপন্যাসটিতে কাহিনীর অংশ অতি সামান্য কিন্তু যে তীব্র আবেগ ফুটে উঠেছে এর মধ্যে, ভাষা ব্যবহারের যে অপূর্ব কৃতিত্ব, তা কিছুতেই ভুলতে পারি না। 'প্রেমের চেয়ে বড়' এবং 'এই তার পুরস্কার' বাঙালি পাঠকদের, যারা শুধু মর্ম-সন্ধানী, তাদের জন্য গভীর উপলব্ধির উপহার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আনন্দ পুরস্কার ছাড়া কোনও পুরস্কারই পাননি।

এবারে দু' একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তাঁর রচনা ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে নিশ্চয়ই উপযুক্ত বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ যথাসময়ে আলোচনা করবেন। তাঁর বিচ্ছেদ সময়ে কিছু স্মৃতিচারণের ইচ্ছে হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল অনেকদিন আগে। একটি ছোট দৈনিক সংবাদপত্র অফিসে সে সময় তিনি চাকরি

করতেন, আমিও তখন সেখানে রবিবাসরীয় সম্পাদক হিসেবে পার্টটাইম কাজ নিয়েছিলুম। তখন আমি শুধু কবিতা লিখি, কফি হাউসের আড্ডার বাইরে আমাকে কেউ লেখক বলে চেনেই না। একই অফিসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে কাজ করব জেনে আমার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল। তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, তাঁর প্রতিটি রচনার আমি মুগ্ধ পাঠক, কিন্তু আমার মতন একজন অকিঞ্চিৎকর ছোকরাকে তিনি হয়তো পাত্তাই দেবেন না। তাঁকে আমি জানাতেও পারব না যে আমি তাঁর কতখানি অনুরাগী।

একদিন নিজেই তিনি বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই চাইতে এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। মজলিশি বা আড্ডাবাজ মানুষ না হলেও অন্তরঙ্গ পরিবেশে বেশ কথা বলতে পারতেন। তবে কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়, ইনি আর পাঁচজন মানুষের মতন নন। আগাগোড়া পারম্পর্য রেখে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই, তাঁর বাক্যগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, এক একটা শব্দের ওপর অত্যন্ত বেশি জোর দেন মাঝে মাঝে, যখন তখন হেসে ওঠেন। সত্যিকারের ইনট্রোভার্ট ধরনের মানুষ। চশমার পাওয়ার খুব বেশি বলেই হয়তো তাঁর দৃষ্টি খুব গাঢ় ও মর্মভেদী বলে মনে হয়। এবং অবান্তর বা ছেঁদো কথা বলার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, তবে এক হিসেবে প্রায় সাহেবদের মতন তিনি আবহাওয়ার প্রসঙ্গ একবার না একবার তুলতেনেই। অর্থাৎ আজকের রোদ বেশি তেজী না নরম, আকাশ আজ মেঘলা না নীল, এটা তিনি দেখতেন। সাহিত্য ঘটিত এবং জীবনযাপনের যে-সব ব্যাপার সাহিত্যের সঙ্গেই জড়িয়ে যায়, সেই সম্পর্কেই কথা বলতে ভালবাসতেন।

তবে তাঁর মুখে অপর কোনও লেখকের নিন্দা শুনিনি কখনও, সাহিত্যের বাজারের ওঠা-পড়া নিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতেন না, পুরস্কার-টুরস্কার নিয়ে কক্ষনো মাথা ঘামাননি। শুধু তাঁর লেখা কখনও সে রকম জনপ্রিয় হল না বলে তাঁর মনে একটু ক্ষোভ ছিল, যদিও এ ব্যাপারটাও তিনি উল্লেখ করতেন হাসতে হাসতে। এরকম সময়ে তিনি নিজেকে শালা বলে সম্বোধন করতেন, বলতেন, আমার শালা কিছু হল না।! তার একটু পরেই কিন্তু তিনি নিজের নতুন কোনও লেখার কথা সবিস্তারে বলতেন, অর্থাৎ লেখার আনন্দেই মশগুল হয়ে থাকতেন।

একবার তিনি হঠাৎ তাঁর ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। এত লিখেও তিনি কখনও আর্থিক সাচ্ছল্যের মুখ দেখেননি। কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে সখেদে বলেছিলেন, এবার থেকে আমি বিমল মিত্রের মতন লিখবো। তোমরা আমার যে-সব গল্পের প্রশংসা করো, তা লিখে কী হলো? দূর শালা, এখন থেকে শুধু গপ্পো লিখব.গপ্পো।

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, জ্যোতিদা, আপনি শত চেষ্টা করলেও বিমল মিত্রের মতন লিখতে পারবেন না। বিমল মিত্রের মতন লেখাও সহজ নয়, তা হলে তো অনেকেই ওঁকে অনুসরণ করত। আপনি আপনার মতনই লিখতে বাধ্য। অন্য কিছু লেখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার কথা অস্বীকার করে তিনি বারবার অসন্তোষের সঙ্গে মাথা নেড়েছিলেন।

আমাদের সৌভাগ্য, মুখে ওরকম বললেও, দারিদ্র্য মেনে নিয়ে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কখনও স্বধর্মচ্যুত হন নি।

তাঁর সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গতা হবার পরও একটা বিস্ময়বোধ আমার ছিলই। মানুষ হিসেবে তাঁকে মনে হত খুবই সরল ও অনেকটা শিশুর মতন, অথচ ইনিই মানুষের অতি জটিল কামনা-বাসনা হিংসার কথা লেখেন কী করে, ভেবে অবাক হয়ে যেতুম।

আরও দুটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত একটা বয়েসের পর লেখকদের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব আসে। যা লিখেছি যথেষ্ট লিখেছি কিংবা আমি যা লিখি তার কোনওটাই খারাপ হতে পারে না, এরকম আত্মশ্লাঘার ভাব প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। আমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ, তখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরিণত বয়স্ক এবং অনেকগুলি দারুণ লেখা লিখেছেন। অথচ সে সময়েও তাঁর অনবরত চিন্তা ছিল কী করে লেখা আরও ভাল করা যায়। এজন্য তাঁর কৌতূহল ছিল সদাজাগ্রত, নতুন ছেলেমেয়েরা কী ভাবে, তা জানার চেষ্টা করতেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আধুনিক সাহিত্য কী রকম হচ্ছে তা জানার জন্য নিয়মিত বিদেশি বই পড়তেন। এমনকী আমার মতন মূর্খকেও তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, ইংরিজিতে নতুন কোন্ কোন্ লেখকের বই পড়া যায় বলো তো?

বাংলা ভাষাতেও তিনি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের লেখা পড়তেন মন দিয়ে, সাহিত্য যে একটা সচল ব্যাপার, নতুন কালের লেখকরা যে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এই ধারণা তাঁর খুব পরিষ্কার ছিল এবং সেই গতির স্পন্দন তিনি বোঝবার চেষ্টা করতেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

সেই ছোট সংবাদপত্রের চাকরিতে আমরা দু'জনেই বেশিদিন থাকিনি। কিন্তু তার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং দেখা হলেই তাঁকে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতন মনে হতো। সাগরময় ঘোষ ওঁর যৌবন-সুহৃদ, ওঁদের দু'জনের একটা স্থায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, প্রত্যেক বছর অষ্টমী পুজোর সন্ধেবেলা দু'জনের দেখা হবেই। সেদিন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের শরীরকে ও মনকে কিছুটা অতিরিক্ত পান-ভোজনে প্রশ্রয় দিতেন। শেষের দিকে কয়েকবার আমরাও জুটে যেতুম সেই আড্ডায়।

১৩৭৬ সালের দেশ-এর সাহিত্য সংখ্যায় আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ ছিল, এখানে তার কিছু কিছু আবার বলতে চাই। তাঁর মুখে তাঁর কোনও ভবিষৎ-গল্পের বর্ণনা শোনা ছিল একটা অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অনেকটা এই রকম....তারপর বুঝলে, দু' বন্ধু গেল, পুরীতে...একটা বাসা ভাড়া করে রইলো, বুঝলে, রাত্রে মেয়েটা বুঝলে, তারপর মেয়েটা তো খুন হয়ে গেল, বুঝলে, তখন পাশের ঝাউবনে সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, বালির মধ্যে ঝাউগাছগুলোর পাতায়...।

মেয়েটার খুন হওয়ার ব্যাপারে তিনি সামান্য গুরুত্বও দিলেন না, কিন্তু পাশের ঝাউবনের সাঁ সাঁ ঝড়ের বর্ণনায় তাঁর অদ্ভুত উত্তেজনা দেখা গেল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি ঝড়ের আন্দোলন বোঝাতে লাগলেন। তাঁর চোখ মুখ তখন

একেবারে পালটে গেছে, যেন তিনিই সেই ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন।

আর একদিন তিনি খুব চিন্তিত মুখে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার একটা গল্পের বই বেরুবে, কী নাম দেওয়া যায় বলো তো? 'সমুদ্র' না 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা'?" এ-রকম অদ্ভুত অলটারনেটিভ আমি আগে কখনও শুনিনি।

সেই ছোট সংবাদপত্র অফিসে কমলকুমার মাঝে মাঝে আসতেন আমার কাছে। হয়তো আমার মাধ্যমেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দু'জনের লেখা দু' রকমের হলেও কোথাও যেন আমি একটা মিল খুঁজে পেতুম। কিন্তু এক পালকের পাখিরা একই জায়গায় বসবাস করলেও এক জাতের লেখকরা পরস্পরের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকেন। ওঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওঁরা কেউই কারুর কোনও লেখা পড়েননি। এবং খুব আন্তরিকভাবে স্বভাব-বিরোধী কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বললেন, বুঝলেন কমলবাবু, লেখার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা দরকার, বুঝলেন কিনা, অনেক ঘোরা দরকার, অনেক দেশ ও মানুষ দেখা দরকার, বুঝলেন, অনেক জায়গায় যাওয়া দরকার, বুঝলেন, এমনি এমনি কি হয়? কমলকুমার মজুমদার গম্ভীরভাবে বললেন, আমার কিন্তু তা মনে হয় না, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, অভিজ্ঞতার জন্য তো ঘোরাঘুরির কোনও দরকার নেই। সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাওয়া যায় গ্রন্থের মধ্যে, মানুষের মনীষার যা কিছু সবই তো গ্রন্থের মধ্যে আছে, অভিজ্ঞতার জন্য বাইরে তাকাবার কোনও মানে হয় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কমলকুমার সেই সময় ছিলেন ডাকাবুকো ধাতের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ, আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঘর-কুনো, একা-চোরা ধরনের।

আমাদের সেই কার্যালয়ের উলটোদিকে একটি নতুন চায়ের দোকান খুলল, সেখানে পরিবেশনকারিণী তিন-চারটি মেয়ে। কলকাতায় তখন এই রকম একটি হুজুগ উঠেছিল। অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে আমার এই ঘটনাটা মনে পড়ল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমায় একদিন বললেন, তোমায় একটা টাকা দিচ্ছি, তুমি ওই দোকানে গিয়ে চা আর কাটলেট খেয়ে একটু দেখে এসো তো, মেয়েগুলো কী করে? আমি সরলভাবে বললুম, আপনিও চলুন না। উনি প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, না, না, আমার চা সহ্য হয় না। বাইরের খাবার খাই না। তা ছাড়া ওই সব মেয়ে-টেয়ে, বুঝলে, তোমার কম বয়েস, তুমি বরং, বুঝলে...।

সেই চায়ের দোকানে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিদা বা আমি কেউই যাইনি, দোকানটিও অবিলম্বে উঠে যায়। কিন্তু চায়ের দোকান নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অবিস্মরণীয় গল্প লিখেছেন তার কিছু পরেই।

বিদায়, জ্যোতিদা। আবার দেখা হবে।

বৈঠকী মেজাজের এক উপেক্ষিত সাহিত্যিক

পত্রান্তরে অনুজপ্রতিম লেখক শ্রী শৈবাল মিত্র কিছুদিন আগে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের খুব একচোট বকুনি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ এই যে, যখনই এই সব ব্যক্তিদের প্রশ্ন করা হয়, আপনারা গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য কী কী বই পড়েছেন, তখন অবধারিতভাবে প্রায় সকলেই কিছু ইংরিজি বই বা বিদেশি সাহিত্যের সুখ্যাতি শুরু করেন। তাঁরা কি বাংলা বই পড়েন না? নিজেরা বাংলা ভাষার লেখক হয়েও অপর কোনও বাঙালি লেখকের রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না? না কি বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কিছু লেখাই হয় না।

এই অভিযোগে সত্যতা আছে। পাণ্ডিত্য প্রমাণ করার জন্য অনেকেই বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন; পাণ্ডিত্য কিংবা স্নবারি যাই হোক, বাংলা বই-টই এর মধ্যে আসে না। কফি হাউসের বুদ্ধিজীবীদের হাতে বাংলা বই রাখার রেওয়াজ নেই। ঢেউয়ের মতন কখনও মার্কেজ, কখনও দেরিদা-গ্রামসি, কখনও টনি মরিসন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওষ্ঠের ওপর খেলা করে যান।

বিদেশি সাহিত্য ও তত্ত্বগ্রন্থ পাঠ করা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনাযোগ্য কোনও গ্রন্থ লেখা হয় না, এমন যদি মনে করা হয় তা হলে বাংলা ভাষা নিয়ে এত গর্ব করারই বা কী আছে? বিদেশি সাহিত্য পাঠ করলেই বরং বোঝা যায়, সম্প্রতি অন্যান্য ভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা বাংলার তুলনায় এমন কিছু আহামরি উচ্চাঙ্গের নয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ'-এর মতন উপন্যাস কিংবা জয় গোস্বামীর 'পাগলী, তোমার সঙ্গে'-র তুল্য কাব্যগ্রন্থ ইদানীং কোন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে?

যাই হোক, আমার পক্ষে এরকম পণ্ডিতিপনা কিংবা স্নবারি দেখাবার কোনও সুযোগই নেই; কারণ গত এক বৎসরে আমি বিদেশি সাহিত্য কিছুই পড়িনি। এমনকী ইংরিজি অক্ষরে লেখা নিতান্ত কয়েকখানা পুরনো ইতিহাস-জীবনীগ্রন্থ ছাড়া কোনও গল্প-উপন্যাস চোখেও দেখিনি! বন্ধু-বান্ধবরা কেউ যখন সাম্প্রতিক কোনও সাড়া-জাগানো বইয়ের প্রসঙ্গ তুলে জিজ্ঞেস করে, তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই? আমাকে সসংকোচে স্বীকার করতেই হয়, না ভাই, পড়িনি। কিংবা বিদেশ থেকে ফিরে এলে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, ও দেশের হালফিল সাহিত্যের ধারা কী দেখলে, আমি মাথা চুলকোই। জানি না, খবর নেবার সময় পাইনি! লন্ডনে গিয়ে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আমি পুরনো পুঁথিপত্র ঘেঁটেছি, একটাও নতুন ইংরিজি কবিতার বই কিনিনি, এটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয়। এটা আমার একটা অধঃপতনের চিহ্ন

হিসেবে গণ্য হতে পারে। একসময়ে আমি 'অন্য দেশের কবিতা' অনুবাদ করেছি, বিভিন্ন ভাষার সাম্প্রতিকতম কবিতা পড়া ও কবিদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আমার শখ ছিল!

কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে বিমানে ফিরছি, হাতে একখানা বই। ট্রেনে বা বিমানযাত্রায় বই পড়ার প্রকৃষ্ট সময়, বেশ মনঃসংযোগ হয়। দূর থেকে এক সহযাত্রী উঠে এল আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। সে আমার বহুদিন-পরিচিত, অতি ব্যস্ত ব্যুরোক্রাট, প্রতি সপ্তাহে একবার-দু'বার বিমানে হিল্লি-দিল্লি যাতায়াত করে, আমার সঙ্গে এরকম যাত্রাপথেই মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে সে আমার হাতের বইখানা দেখে আঁতকে উঠল। আমার হাতে 'নিবেদিতা লোকমাতা'। বিমানযাত্রীরা কেউই বাংলা বই পড়ে না। আমার পাঠ্য শুধু বাংলা বই নয়, 'ধর্মের বই'? এর আগে সে আমার হাতে দেখেছে আর্থার সি. ক্লার্কের 'স্পেস অডিসি ২০৬১', কিংবা টনি মরিসনের 'বিলাভেড', কিংবা অমিতাভ ঘোষের 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড'। চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে নিশ্চয়ই ভাবল, সুনীলকে তো জানতাম ধর্ম-টর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, হঠাৎ এত পরিবর্তন হয়ে গেল কবে, রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে নাকি!

না, আমি এখনও ধর্ম-আশ্রিত হইনি, কোনও মিশনে দীক্ষা নেবার প্রশ্নই ওঠে না। এই সব বই আমি পড়ছি প্রাণের দায়ে। কী কুক্ষণে আমি গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের ইতিহাসের পটভূমিকায় এক উপন্যাস ফেঁদে বসেছি, এখন তার জন্য উপাদান-সংগ্রহ ও তথ্য-যাচাই করতে করতে আমার সমস্ত সময় হরণ হয়ে যাচ্ছে। এখন হলদেটে রঙের, পোকায় কাটা, জীর্ণ পত্রপত্রিকা ও বইয়ের পৃষ্ঠায় আমাকে দিনের পর দিন দৃষ্টিক্ষয় করতে হয়। কোনও বইয়ের ফুটনোটে আর তিনটি অজানা বইয়ের নাম দেখলে সেগুলিও সংগ্রহ করার ঝোঁক চাপে। শুধু একবার নয়, কোনও বই বারবার পড়তে হয়, ইংরিজিতে যাকে বলে 'ইন বিটুইন দ্য লাইন্স', তা খোঁজার জন্য। এত মন দিয়ে ছাত্র বয়েসে পড়াশুনো করলে আমি ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারতাম।

কত কবিতার বই-ই তো হাতে আসে, সব কি আর পড়া হয়? তবু আমি অনঙ্গমোহিনী দেবী নাম্নী এক কবির 'শোক-গাথা' কাব্যগ্রন্থটি পড়ছি কেন? কাব্যরসের সন্ধানেও নয়, প্রাণের টানেও নয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে, এই অনঙ্গমোহিনী ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের কন্যা এবং সেই রাজ্যের উজির গোপীকৃষ্ণ দেববর্মার পত্নী। কাব্য নয়, নিছক ইতিহাসের উপাদান। এরকম প্রচুর নীরস গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে দু-একটি এমন বইও পাওয়া যায়, যা পাঠ করে আমি বিমল আনন্দ পেয়েছি। সেইরকমই, অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এক লেখকের কিছু রচনার কথা এখানে জানাতে চাই।

স্বামী বিবেকানন্দর দুই ভাইয়ের নাম মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ প্রখ্যাত বিপ্লবী, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তারপর দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান,

পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা হন। মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথই আমাদের আলোচ্য। মহেন্দ্রনাথ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অনুজের তুলনায় তিনি বিবেকানন্দের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন অনেক বেশি, কিন্তু তিনি মিশন বা মঠে যোগদান করেননি। তিনি দেশ-বিদেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন, বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল, অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও গেরুয়া ধারণ করেননি।

মহেন্দ্রনাথের বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দি ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশোর কাছাকাছি। বিস্ময়কর তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য। তাঁর অনেক বইই এখন খুবই দুর্লভ। 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' নামে বইটিই এখনও পর্যন্ত কিছুটা পরিচিত, যাঁরা পুরনো কলকাতা নিয়ে প্রবন্ধ বা গল্প-উপন্যাস লেখেন, তাঁদের কাজে লাগে।

মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যখন তাঁর গুটিকয়েক শিষ্য সংসার ত্যাগ করে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরানগরে ও আলমবাজারে আখড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করলেন, মহেন্দ্রনাথ সে সব জায়গায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত মহারাজদের তিনি অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার লন্ডনে বক্তৃতা দিতে আসেন, তখন মহেন্দ্রনাথও পড়াশুনোর জন্য সেখানে ছিলেন, বেশ কিছুদিন তিনি অগ্রজের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সারির শিষ্যদের জীবনের অনেক ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শী এই মহেন্দ্রনাথ। এই সব বিষয়ে তিনি অনেকগুলি স্মৃতিকথা লিখেছেন। 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' নামে লিখেছেন তিনটি বই, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'ও লিখেছেন তিন খণ্ডে। ভক্তিরসের কথা বাদ দিয়ে যারা বাংলা ভাষায় রস-সাহিত্য পাঠে আগ্রহী, তাদের এই বইগুলি অবশ্যপাঠ্য।

মহেন্দ্রনাথকে অনায়াসেই বলা যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর পূর্বসূরি। বাংলা ভাষায় বৈঠকী মেজাজের রচনার আদিপুরুষ হিসেবে যদি ধরা হয় হুতোম প্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহকে, তা হলে সেই ধারারই আর একজন প্রধান লেখক এই মহেন্দ্রনাথ। তাঁর বইগুলির গুরুগম্ভীর বা সাধু-সন্ন্যাসী জড়িত নাম দেখে হয়তো অনেকে বিমুখ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় রয়েছে প্রকৃত রসের ধারা এবং বাংলা ভাষাকে নিয়ে ইচ্ছেমতন খেলা করার দক্ষতা ছিল তাঁর। সাধু ও কথ্য ভাষার এমন সাবলীল সংমিশ্রণ খুব কম লেখকই ঘটাতে পেরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দর গদ্যরচনাও এই ধরনেরই, তাঁর গদ্যরীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অথচ মহেন্দ্রনাথ একেবারেই উপেক্ষিত, এটা একটা দুঃখের কথা। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬) নামে আকরগ্রন্থটিতে কত বিস্মৃত, অকিঞ্চিৎকর লেখকের নাম আছে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের উল্লেখমাত্র নেই!

সাধারণ মানুষ যাঁদের মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করে, তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বায়োগ্রাফি হয় না, হয়ে যায় হোজিওগ্রাফি। অর্থাৎ জন্মকাল থেকেই তাঁরা অসাধারণত্বে উন্নীত, কোনওরকম মানবিক দুর্বলতা যেন তাঁদের থাকতে পারে না, শ্রদ্ধা ও ফুলচন্দনে

ঢেকে দেওয়া হয় তাঁদের ধুলো-মাখা পা। এর ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়। এর চেয়ে সাধারণ অবস্থা থেকে অসাধারণত্বের স্তরে ক্রমিক উত্তরণের কাহিনী অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক, সাধারণ মানুষ তার থেকে সত্যিকারের প্রেরণা পেতে পারে। প্রকৃত লেখক কখনও বাস্তব-বিমুখ হতে পারেন না। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীণ রূপ ফোটাতে চান। কুমোরটুলির শিল্পীরা যখন দুর্গাঠাকুরের প্রতিমা গড়েন, তখন সামনের দিকটা হয় অপূর্ব সুন্দর, নিখুঁত বলা যেতে পারে, কত রকম তার সাজসজ্জা; কিন্তু পেছন দিকটা থাকে উদোম, অসম্পূর্ণ, এমনকী খড়-বাঁশও বেরিয়ে থাকে। অর্থাৎ সামনের দিকটা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে জনসাধারণকে দেখান হয়। পেছনের দিকটা রাখা হয় চোখের আড়ালে। কিন্তু খাঁটি কোনও শিল্পী বা ভাস্কর যখন মূর্তি গড়েন, তখন তিনি কোনও দিকটারই প্রতি অবহেলা করেন না। সন্ত-জীবনীকাররা ওই কুমোরটুলির শিল্পী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্যিক।

মহেন্দ্রনাথের রচনায় ধারাবাহিকতা নেই। যখন যে ঘটনা মনে পড়েছে, সেই ভাবে লিখেছেন, ছোট ছোট এক একটি পরিচ্ছেদ, তাতে রচনাগুলি আরও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। নিছক ঘটনা বর্ণনার বদলে তিনি মানুষগুলির চেহারা, পোশাক, মুখের ভাষার বৈচিত্র্য ও পরিবেশের নিখুঁত বিবরণ দিতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দশ-বারোটি যুবক ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই নিছক জেদের বশে বরানগরের একটি ভাড়া-বাড়িতে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই বাড়িটির বর্ণনা এই রকম: "মঠের বাড়িটা অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটিতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে; শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থান। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতলের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে তো দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা-জানালাগুলির তক্তা খানিকটা আছে, খানিকটা নাই; ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ি তো সত্যিই ভূতের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তর দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ—যেটিকে কালী বেদান্তীর বা 'কালী তপস্বীর ঘর' বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ।...মেঝের উপর শয্যা স্থাপন করা হইয়াছিল, পালঙ্ক তখন একটাও ছিল না। দানাদের ঘরে (কালী তপস্বীর ঘরটি ব্যতীত অপর যে একটি বড় গৃহ তাহার নাম 'দানাদের ঘর') বালন্দা পটপটীর খান দুই তিন মাদুর সংযুক্ত করিয়া মেঝেতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; অপর এক জায়গায় সতরঞ্চি রহিয়াছে—'চোরের বিশ্বাসী', কোনও জায়গায় টানাটা রহিয়াছে, অপর জায়গায় পড়েনটা রহিয়াছে—জেলের জালবৎ। মাথার বালিশ-বালন্দার চ্যাটাইয়ের নীচে নরম নরম ইট দেওয়া। শীত করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শয়ন, বা তাহাতে শীত না ভাঙিলে রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তি লড়িয়া লওয়া; শরীর গরম হইলে শীত পলাইয়া যাইত।"

মঠের সেই আদিপর্বের এমন নিখুঁত বর্ণনা আর কেউ দেননি। মেঝেতে যে মাদুর পাতা হত, সেটা এমনই জরাজীর্ণ যে চোরেও ছোঁবে না, তাই 'চোরের বিশ্বাসী'। এই

বর্ণনার সবচেয়ে কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে মাথার বালিশ হিসেবে নরম নরম ইট। 'নরম নরম ইট' কী বস্তু?

সেই মঠে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ছিল কীরকম? "কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না ইহা স্থির করিয়া সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার যে চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্রখণ্ডের উপর তৎসমুদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়ে বসিতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন, কখনও বা তেলাকুচাপত্রের ঝোল হইত। জলপানের জন্য একটি মাত্র ঘটি ছিল। একটি বাটিতে নুন-লঙ্কার ঝোল থাকিত; সকলেই এক গ্রাস করিয়া একবার ভাত মুখে লইতেন ও একবার ওই ঝোল হাতে করিয়া মুখে দিতেন, জিহ্বায় অত্যন্ত ঝাল ঝাল লাগিত। গুরুসেবা ও গুরুভাইকে সেবা করা একই, এই ভাবটি তখন অত্যন্ত প্রবল ছিল।"

কিন্তু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। কারণ এঁদের কাউকেই ভিখিরির মতন দেখতে নয়। স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছেলেরা যখন ভিক্ষে করে, তখন তাদের প্রতি মানুষের করুণার বদলে অবজ্ঞা ও সন্দেহই বেশি জাগে। এক সন্ন্যাসীর এক দিনের ভিক্ষে অভিযানের অভিজ্ঞতা এই রকম: "যোগানন্দ স্বামী বলিতেন, 'একদিন আলমবাজারের একটি খোড়ো বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলুম। সকালে একটি স্ত্রীলোক মেটে দাওয়ার সম্মুখে উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। উঠানের সম্মুখে একটি নারিকেল গাছ। গেরুয়াধারী যুবা পুরুষ ভিক্ষে করতে এসেছে, মাথা নেড়া, শিখাও নেই, কণ্ঠিও নেই, কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করছে না, এ তো বৈরাগী বাবাজী নয়, তবে এ লোকটা কে? স্ত্রীলোকটি দেখে তো রেগে অগ্নিশর্মা; বললে—যা মিন্সে, যা, এখানে ভিক্ষা পাবিনি; খেটে খেতে পারিস নি? দিনের বেলা ভিক্ষের ছলে সব ঘরদোরের সন্ধান নিয়ে যাবি, আর রাত্তিরে সিঁদ কেটে চুরি করতে আসবি।' এই বলে স্ত্রীলোকটি রাগে গরগর হয়ে নারকেল গাছটার গোড়ায় শপ শপ করে ঝাঁটা মারতে লাগল।' যোগেন মহারাজ যদিও জমিদার-সন্তান এবং মহা কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষুক, হাসিবার উপায় নাই। অগত্যা স্থির চিত্তে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং মঠে পদার্পণপূর্বক নানাপ্রকার ব্যঙ্গচ্ছলে স্ত্রীলোকটির অভিনয় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'মাগীটার আছেটা কী? একখানা খোড়ো ঘর, দু'খানা ছারপোকাওয়ালা ছেঁড়া কাঁথা, আর শতেক তাপ্পি মারা একটি তামার ঘটি।'"

'কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না', এই শপথ অবশ্য বেশিদিন রাখা যায়নি, ভিক্ষান্নেও খিদে মেটাতে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য কয়েকজন চাঁদা দিতেন, সেই টাকায় মঠের কাজ চলত। সংসারীদের মধ্যে অনেকেই যদিও এই হুল্লোড়বাজ সন্ন্যাসীদের পছন্দ করতেন না। সেইসব সাধারণ মানুষের মনোভাব মহেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেছেন, "সাধারণ লোকের ভিতরে কথা উঠিল, 'নরেনটা পাগল হয়ে গেছে, তার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কী বকে যে তার মাথামুণ্ডু নাই, আবার বলে বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ...আমরা তো কোনও কালে এসব কথা শুনি নাই বাপু। আর শিখেছেন কতকগুলি বচনের ঝুড়ি। কাজকর্ম করিবার নাম নেই, চাকরি-বাকরি করার নামগন্ধ মুখে নেই। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পেট ঠেসে আসে, আর কাজের মধ্যে

কতকগুলি ছোঁড়াকে বকিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে নিয়ে কীরকম করছে সব—একটা কর্মনাশার দল করেছে।'"

মঠের জীবনে কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং রসে-বশে সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দও পরিহাসপ্রবণ, অন্য শিষ্যরাও কেউ সব সময়ে গুরুগম্ভীর মুখ করে থাকতেন না, কেউ চাইলেও অন্যরা থাকতে দিতেন না। এঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন, বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন, কখনও কখনও ধ্যান ও আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, আবার এরই মধ্যে মধ্যে চলত নানারকম হাস্যকৌতুক। সেইরকম অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায়। অধ্যাত্ম বিষয় ছাড়াও তাঁরা যে সাহিত্য ও ভাষা নিয়েও আলোচনা করতেন, তার একটি উদাহরণ:

"শিবানন্দ স্বামী কঠোর জপ-ধ্যান করিতেন, চক্ষু ঢুলুঢুলু বিভোর, মাঝে মাঝে হাসিতেন। তিনি তখন বড় কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। মাইকেল (বিষয়ে) কথাবার্তা শুনিয়া একদিন তাঁহার মনে খেয়াল হইল, বাংলা ভাষার সংস্কার করিতে হইবে। তিনি আরম্ভ করিলেন, 'দ্যাখ, বাংলা ভাষায় একটি ক্রিয়াপদের সহিত দুই-তিনটা শব্দ যোগ না করিলে ক্রিয়া হয় না। ওরূপ চলিবে না। অন্য শব্দ সংযোগ না করিয়া একটি মাত্র ক্রিয়াপদেতেই ভাব প্রকাশ পাইবে।' তিনি দাঁড়াইয়া কোমর কিঞ্চিৎ সামনের দিকে বক্র করিয়া ডান হাতের তর্জনী সম্মুখে চালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কেন, ইংরাজিতে হয়, বাংলায় হবে না কেন? এক কথায় ক্রিয়াপদ করিতে হইবে।' একজন কৌতুক করিয়া বলিল, 'মহাপুরুষ আলুর দম করতে হবে। এটা এক কথায় কী করে হবে?' তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কেন, বলবে, আলুটা দমিয়ে দাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, লুচি ভাজবে কথাটা এক কথায় করতে হবে। আচ্ছা, লুচিটা লুচ্চাইয়া দাও।' এই বলে নিজে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন, 'আরে ছি ছি, এ যে বেখাপ্পা হয়ে গেল, এক আধটা চলবে না।' আর সকলেই বিদ্রূপ করিয়া আরম্ভ করিল—'মহাপুরুষ তামাকটা তমকাইয়া দিবেন।' সম্মুখে গুপ্ত বসিয়া ছিল, 'ওরে গুপ্ত, তামাকটা তমকাইয়া দে না!'"

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়মিত বক্তৃতাসভায় কীভাবে ইংরেজ শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন এবং ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার বর্ণনা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং আরও কেউ কেউ। কিন্তু স্বামীজীর প্রতিদিনের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি ঘটনার কথা লিখে গেছেন মহেন্দ্রনাথ। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ও অনেকগুলি বক্তৃতাসভায় হাজির থাকতেন। সেইজন্য মহেন্দ্রনাথের বিবরণের ওপর কিছুটা নির্ভর করতে হয়েছে পরবর্তী কালের জীবনীকারদের। স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ মানুষটি।

মহেন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে যান, তখন তিনি সদ্য যুবা। তাঁর দাদার বয়েস তখন তেত্রিশ। সেই বয়েসেই বিবেকানন্দ বেশ বিখ্যাত এবং তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বে বহু মানুষ মুগ্ধ। মহেন্দ্রনাথ যেমন সেই রূপটি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন ঘরোয়া পরিবেশের মানুষটিকেও। বক্তৃতাসভায় যাঁর সিংহ-বিক্রম, বাড়ির মধ্যে তিনিই একজন স্নেহপ্রবণ

মানুষ, কখনও কিছুটা খামখেয়ালি, কখনও অস্থির, কখনও ক্লান্ত। ছোট ভাইকে দেখেই তিনি নিজের সোনার কলম উপহার দেন, তার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে কিনা সেই খবর নেন। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বেশ সচেতন, ভাল জাতের পাইপের তামাক না পেলে তাঁর মন ওঠে না, তাঁর ঝাল-প্রীতির জন্য সারা লন্ডন খুঁজে খুঁজে তিনটি কাঁচালঙ্কা সংগ্রহ করে আনতে হয়!

লন্ডনে এসেও মহেন্দ্রনাথের চোখ ধাঁধিয়ে যায়নি। সেখানকার জীবনযাত্রা অন্যরকম, রীতিনীতি কিছুটা আলাদা, কিন্তু তাতে গদগদ হবার কিছু নেই। তিনি লক্ষ করেছেন, বিলেতের অনেক বাড়িতে যেসব মাদুর ও কার্পেট পাতা থাকে সেগুলি বাংলা দেশের মাদুর এবং মির্জাপুরী গালচে। এখানকার লোকেরা ঝিনুক ও গুগলি খায়। ঝিনুক বা অয়েস্টার অন্য জাতীয় হলেও গুগলি আমাদেরই মতন। 'যদি হুগলির কোনও লোক লন্ডনে গিয়া গুগলির ব্যবসা করে তা হলে বেশ ব্যবসা চলিবে।'

মহেন্দ্রনাথ পারতপক্ষে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন না। অনেক বিলিতি দ্রব্যের তিনি চমৎকার বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে নিয়েছেন। যেমন ইজিচেয়ার হচ্ছে সুখাসন এবং ফায়ার প্লেস হচ্ছে আতশীখানা।

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীমতী হেনরিয়েটা মুলার এবং স্টার্ডি দম্পতি। শ্রীমতী মুলারের বাড়িতেই থাকতে হয়েছে বেশিদিন। এই শ্রীমতী মুলার ছিলেন ধনবতী মহিলা এবং ভারতের প্রতি অনুরক্ত, বেলুড় মঠ নির্মাণের সময়ে এবং জমি কেনার জন্য তিনি অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। জীবনীগ্রন্থগুলিতে এই কারণেই শ্রীমতী মুলারের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি মানুষটি কীরকম ছিলেন, তা জানতে পারি শুধু মহেন্দ্রনাথের লেখনীর সুনিপুণ বর্ণনায়।

এই প্রৌঢ়া মহিলাটির চেহারা পুরুষালি, ঠোঁটে স্পষ্ট গোঁফের রেখা এবং থুতনিতেও সামান্য চুল ছিল, গালে অবশ্য দাড়ি ছিল না। স্বভাবটা বদ মেজাজি, কখন যে কী মূর্তি ধরবেন তার ঠিক নেই। স্বামীজীকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, খাওয়াচ্ছেন-পরাচ্ছেন। বক্তৃতাসভার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, এ সবই তাঁর উদারতার পরিচয়, তখনকার দিনের লন্ডনের পক্ষে খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা বলতে হবে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গীদের ওপর মাঝে মাঝেই খাপ্পা হতেন। তখন স্বামীজী কলকাতা থেকে সারদানন্দকে আনিয়েছেন, মহেন্দ্রও পড়াশুনোর জন্য সেখানে জুটেছে, গুডউইন নামে একটি ইংরেজ ছোকরাও সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করে, এরা মিস মুলারকে বেশ ভয় পায়।

শ্রীমতী মুলারের মুখের ভাষা কীরকম ছিল তার একটি বর্ণনা আছে। শ্রীমতী মুলারের চেহারা তো ওইরকম, পোশাকও পরতেন উদ্ভট ধরনের। মাঝে মাঝে সাইকেল চড়ার শখ ছিল। একদিন স্টার্ডি ও তাঁর পত্নীকে নিয়ে সাইকেল চালাতে গেলেন গ্রামের রাস্তায়। শ্রীমতী স্টার্ডি ভাল সাইকেল চালাতে জানে না, উলটে পড়ে গেল আছাড় খেয়ে। একদল ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে হাততালি ও টিটকিরি দিতে লাগল। এর পরে মহেন্দ্রনাথের ভাষায়: "ঘণ্টাখানেক পরে মিস মুলার ফিরিয়া আসিয়া স্টার্ডির পত্নীকে বকিতে শুরু করিলেন, 'অলবড্ডে মাগী, বাইসাইকেল চড়তে

জানে না, পথে খানিকটা গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল, কাপড়-চোপড়ে সব ধুলো লাগলো, পাড়ার হতভাগা ছেলেরা সব হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলো।...গাঁয়ের ছোঁড়াগুলি কী পাজি। আমাকে হাততালি দিতে লাগলো, কেউ বা ঢেলা ছুঁড়তে লাগলো, সব ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আমার বাইসাইকেলের পথ আটকে দিয়ে বলতে লাগলো, দ্যাখ দ্যাখ, একটা বুড়ো মাগী মদ্দোর পোশাক পরেছে'...”

মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গেলে পুরো বইগুলিই তুলে দিতে হয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিশেষত্ব আছে। স্বামী বিবেকানন্দর বক্তৃতাসভার বর্ণনা সবাই দেয়, মহেন্দ্রনাথও দিয়েছেন, কিন্তু বক্তৃতা শুরু করার ঠিক আগে স্বামীজী ঠিক কী অবস্থায় থাকতেন, কী কথা বলতেন, সে বর্ণনা শুধু মহেন্দ্রনাথের লেখাতেই পাওয়া যায়। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর রচনায় যত চরিত্র এসেছে, প্রত্যেককেই যেন তিনি প্রথমে একটু দূর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করেছেন, তাদের অবয়ব, হাবভাব।

শ্রীমতী মুলারের কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। স্বামী বিবেকানন্দর শেষ জীবন পর্যন্ত অনেক বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। শ্রীমতী ওলি বুল, শ্রীমতী জোসেফিন ম্যাকলাউড, আর নিবেদিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু শ্রীমতী মুলার, যিনি ইংল্যান্ডে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠার জন্য এত সাহায্য করেছেন, ভারতে এসে থেকেছেন, বেলুড় মঠের জন্য বহু টাকা দিয়েছেন, তাঁর কোনও উল্লেখ আর পরবর্তীকালে পাওয়া যায় না কেন? সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল? ঝগড়াঝাঁটি? বিশদ বিবরণ কোথাও নেই, শুধু নিবেদিতাকে কোনও একটা সময়ে শ্রীমতী মুলারের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করা হয়েছিল।

যাই হোক, লন্ডনে দ্বিতীয়বার শ্রীমতী মুলারের আশ্রয়ে থাকার সময়ে অনেকরকম সাহায্য পেয়েও তাঁর প্রতি স্বামীজী যে বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথের লেখায়। ঘটনাটি এরকম:

শ্রীমতী মুলারের একটা হামবড়া ও সবজান্তা ভাব ছিল, এই ভাব তিনি বেশি ফলাতেন সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের ওপর। ওঁরা কিছু বলতে গেলেই শ্রীমতী মুলার ধমকে দিয়ে বলতেন, তোমরা কিছু জানো না!

একদিন শ্রীমতী মুলার বলতে লাগলেন, আমি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, দেখেছি, রোগা রোগা গরু, রোগা রোগা কুকুর, চারদিকে সবই রোগা। আমরা কিন্তু এমন হতে দিই না। যখন গরু বা ঘোড়া বুড়ো হয়, তখন তাদের জীবনটা একটা বোঝা হয়। তাদের আর বেঁচে থাকবার দরকার কী? তাই আমরা বুড়ো গরু-ঘোড়াকে মেরে ফেলি, তাদের মাংস লোকে খায়। আমরা ইংরেজরা দয়ালু জাতি, আমরা বুড়োদের কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

ইংরেজরা খুব দয়ালু জাতি, এই কথাটা বারবার শুনতে শুনতে সারদানন্দ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি ফস করে বলে ফেললেন, বাপ-মা বুড়োবুড়ি হলেও তো জীবন বড় কষ্টদায়ক হয়। কেন তাদের মেরে ফেলেন না?

শ্রীমতী মুলার বিকট মুখভঙ্গি করে বললেন, অ্যাঁ? কী বললে?

শ্রীমতী মুলারের মা বেঁচে আছেন, তাঁকে তিনি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। সারদানন্দের কথা শুনে তিনি দপদপিয়ে উঠে গেলেন। তারপর আর সারদানন্দ-মহেন্দ্রর সঙ্গে কথাই বলেন না। প্রণাম নিতে চান না, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে মুখ ফিরিয়ে নেন। সারদানন্দ তো খুব ভয় পেয়ে গেলেন, বিবেকানন্দ জানতে পারলে নিশ্চয়ই রাগ করবেন। শ্রীমতী মুলারের মুখে মুখে কথা না বলে চুপ করে শুনে গেলেই হত।

মহেন্দ্র অবশ্য সান্ত্বনা দেয়, যেমন কথা, তেমনই তো উত্তর দিয়েছেন। অত ভয় পাবার কী আছে? না-হয় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!

দিন তিনেক পরে বিবেকানন্দ ঠিক অস্বাভাবিক অবস্থাটা লক্ষ করলেন। তিনি সারদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে পাগলী বুড়ির সঙ্গে কী হয়েছে?' সারদানন্দ কাঁচুমাচু, তখন মহেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন ঘটনাটি।

"স্বামীজী বলিলেন, 'ও খ্যাপতান মাগীর জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। দ্যাখ শরৎ, এ দেশে যে মাগীরা বে করে না সেগুলো বুড়ি হলে দু'রকম হয়। কতকগুলো মাগী ফেটিয়ে যায় (মোটা হয়), সেগুলো ঠাণ্ডা ভালমানুষ থাকে। কতকগুলো মাগী শুঁটকে যায়; সে মাগীরা খিটখিটে হয়। এই খ্যাপতান মাগীর জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। ওরে বাপু, তোরা বুড়ি মাগীর সঙ্গে খুব সাবধানে চলবি। ঘরে ও ঢুকলেই দাঁড়িয়ে উঠবি, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করবি, প্যান্টালুনের পকেটে হাত রাখবিনি। বুড়ি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, তা বাপু তোরা বসিসনি। যে জিনিস চাইবে তা তাড়াতাড়ি ওকে দিস। কোনও রকমে বুড়িকে সন্তুষ্ট করবি। আর পারিনি বাপু, সারাদিন লেকচার করতে হবে, ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আবার বুড়িকেও সন্তুষ্ট করতে হবে...'।"

মহেন্দ্রনাথ এই সব রচনায় নিজেকে কখনও জাহির করেননি, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও প্রসঙ্গ আনেননি, এটা একটা বড় গুণ। এমনকী নিজের নাম না দিয়ে সর্বত্রই বলেছেন, বর্তমান লেখক। নিজেকে তিনি আড়াল করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্মৃতিকথায় এই সব খুঁটিনাটি ও সংলাপ কতদূর সত্য, এতে কি কল্পনার কিছু মিশ্রণ আছে?

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দর বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে মহেন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। তবে ঘটনারই উদ্ধৃতি আছে, রঙ্গ-কৌতুক বা সংলাপ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সব রঙ্গ-কৌতুক-সংলাপের সত্যতা সম্পর্কে কোনও প্রতিবাদও আমার চোখে পড়েনি।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী (তিন খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

আমার মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্যার, ভাল আছেন?

হ্যাঁ, এখন ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

শুক্রবার রাত্তিরে উনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অথচ শুক্রবার সকালেই ওঁর সঙ্গে এই কথা হল। উনি শুধু আমার অগ্রজ সাহিত্যিক নন, আমি সিটি কলেজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলাম কিছুদিনের জন্য, দেখা হলে স্যার বলেই সম্বোধন করতাম। করতাম—এই অতীত ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করতে কীরকম অবিশ্বাস্য লাগছে, সত্যিই আর দেখা হবে না!

পৃথিবীতে ওঁর সুস্থ শেষ দিনটিতে দেখা হয়ে গেল একটা যোগাযোগের ফলে। কয়েকজন মিলে এক জায়গায় কবিতা পাঠের কথা ছিল। আমাকে যখন সকালবেলা ডাকতে আসা হল, তখন নীচে নেমে দেখি, গাড়িতে উনি বসে আছেন। সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সজীব কৌতূহল, শুধু চোখের নীচে সামান্য একটু ক্লান্তির ছাপ—আর কিছু না।

গাড়িতে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের যাত্রা, যেতে যেতে অনেক গল্প, অনেক প্রসঙ্গ। গাড়িতে ছিলেন রবীন্দ্র সংগীতজ্ঞ সন্তোষ সেনগুপ্ত, কবি মণীন্দ্র রায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং খ্যাতনামা শিক্ষক এবং এই দুটি সত্তাই ছিল প্রবল—সুতরাং কথাবার্তা এই দু'দিকেই ছুঁয়ে যেতে লাগল। সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলা, যুব অসন্তোষ, খুনোখুনি—এ সব কথা তো আসবেই। ওঁর কথায় সমালোচনা ছিল, কিন্তু তিক্ততা ছিল না—দেশের যুব শক্তির ওপর অসীম বিশ্বাস—এরা কখনও কখনও বিপথে যায়, আবার এরাই দেশের পরিবর্তন আনে। বললেন, কিছু ছেলে উন্মত্ততা দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পুলিশের গুলি খেয়ে যে অনেক নিরীহ ছাত্র মারা যাচ্ছে, এটা আমি সইতে পারি না। একজনকে তো জানি, ক্লাস করে সদ্য বেরিয়েছে, আচমকা লাগল পুলিশের গুলি, শেষ হয়ে গেল—কী করে মানব এ ব্যাপার!

আবার বললেন, কিছু ছেলে লেখাপড়া বন্ধ করতে চাইছে, পরীক্ষা বাতিল করতে চাইছে—কিন্তু এটাই পুরো ছাত্র সমাজের ছবি নয়। একদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি যে রাস্তায় ব্যারিকেড বানানো হচ্ছে, এক্ষুনি দুমদাম শুরু হবে। ক্লাসে গিয়ে ছেলেমেয়েদের বললাম, দ্যাখো গোলমাল হতে পারে—তোমরা যে-যে ইচ্ছে করো বাড়ি চলে যেতে পারো। আশ্চর্য ব্যাপার, একটি ছাত্র বা ছাত্রীও গেল না। সারাক্ষণ ক্লাসে থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়া শুনল। আমি দেখেছি তো, একালের ছেলেমেয়েদের সাহসও অনেক বেড়ে গেছে।

আমি গাড়ির সামনের সিটে বসে উসখুস করছিলুম। আর থাকতে না পেরে বললুম, স্যার, আমি একটু সিগারেট খাব?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হেসে বললেন, নিশ্চয়ই! তোমার ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেছে অনেকদিন! এখন আর ওসব কি! ছেলেবেলায় আমার একজন মাস্টারমশাই ছিলেন, তাঁর সামনেও আমি সিগারেট খেতাম। প্রথম প্রথম, মাস্টারমশাইকে ঘরে বসিয়ে আমি বারবার উঠে যেতাম বাইরে। বাইরে দাঁড়িয়ে হুসহাস করে সিগারেট টেনে আসতাম। মাস্টারমশাই একদিন বললেন, তুই এত ঘন ঘন বাইরে যাস কেন? তোর কাছে সিগারেট আছে? দে তো আমাকে একটা!... আমার সেই গুরুকে আমি এখনও দারুণ শ্রদ্ধা করি!

পুজোর সময় নৈনিতাল, রানীক্ষেতের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন—সেই কথা উঠল। বললেন, তবে ভ্রমণের আনন্দ আর সে রকম নেই। রিজার্ভেশানের ঝঞ্ঝাট, স্টেশনে গিয়ে বসে থাকা, অসহ্য ভিড়, মানুষের হৃদয়হীনতা, ঘুষ, জুয়াচুরি—এসব দেখলে প্রকৃতির কাছে গিয়েও শান্তি পাওয়া যায় না। বয়েস যখন কম ছিল তখন বেড়াতে গিয়ে এত আনন্দ...আমার সবচেয়ে ভাল লাগে সাঁওতাল পরগনার নানা জায়গা—সুনীল, তুমি গেছ ওদিকে?

কে যেন বললেন, ফিরে এসে আপনার তো শরীর অসুস্থ হয়েছিল?

হ্যাঁ, একটু ফ্লুর মতন হয়েছিল—বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরলে অনেক সময় এরকম হয়, তার ওপর কালী পুজোর মাইকের উৎপাত—এখন ভাল আছি।

স্পষ্ট মনে আছে, ভাল আছি কথাটার ওপর উনি একটু জোর দিয়েছিলেন।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কবিতা পাঠ। উনিই প্রথম পড়লেন, কারণ ওঁকে আবার ফিরে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে হবে। একটি কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক, আর একটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। খুব সংকোচের সঙ্গে বারবার বলছিলেন, আমি তো অনেকদিন কবিতা লিখি না—ছেলেবেলায় লিখতাম অজস্র, কিন্তু এতদিনের ব্যবধানে ভাষা অনেক বদলে গেছে, এখনকার কবিদের সামনে আমার পড়তে লজ্জা হচ্ছে!

কবিতা পাঠ করলেন জড়তাহীন সুললিত কণ্ঠে। ওঁর কণ্ঠস্বর একটু সরু, কিন্তু রেকর্ড হবার পর মাইক্রোফোনে যখন গমগমে আবৃত্তি ভেসে উঠল, তখন উনি হেসে বললেন, বাঃ, বেশ তো!

ওঁকে আগে যেতে হবে, উনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমাকে বললেন, সুনীল, একদিন এসো আমার বাড়িতে, কাছেই তো—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হ্যাঁ যাব—

কী করে জানব, সেটাই শেষ দেখা—আমার আর যাওয়া হবে না! সেইদিনই রাত্রে ওঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে থাকে—ওঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কারনানি হাসপাতালে।

সিটি কলেজে আমি কিছুদিন ওঁর ছাত্র ছিলাম। আই এসসি পড়েছিলাম অন্য কলেজে, তাতে সুবিধে করতে পারিনি—তাই বি এসসি পড়ার বদলে যখন বি এ পড়া ঠিক হল, তখন অন্য অনেকের আপত্তি না শুনে আমি জোর করে ভর্তি

হয়েছিলাম সিটি কলেজে। একমাত্র কারণ, ওখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পড়ান, তাঁকে দেখতে পাব, তাঁর কথা শুনতে পাব। সেই বয়েসে, প্রিয় লেখকের সান্নিধ্যের চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কিছু হতে পারে না। কত নিদ্রাহীন রাত্তিরে যে-লেখকের বই আমার সঙ্গী, সেই লেখক নিজে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, এ কি বিরাট সৌভাগ্য!

ধপধপে ফরসা গায়ের রং, তখন অত্যন্ত রূপবান পুরুষ ছিলেন। ওঁর স্বভাবে কোনও ভারিক্কি ভাব ছিল না, অথচ ক্লাসে কেউ কোনওদিন কোনও বিঘ্ন ঘটায়নি, ছাত্রদের আপন করে নিতে জানতেন, সবাইকে করে নিতেন এক আলোচনার অংশীদার। পড়াশুনোয় কোনও নীরস কঠোরতা ছিল না—সাবলীল আবহাওয়ায় সাহিত্য পাঠ হত। মনে আছে, উনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ পড়াতেন, মুক্তধারা নাটকটির আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আমার মতো ক্লাস-পালানো ছেলেও পারতপক্ষে ওঁর ক্লাস ফাঁকি দেয়নি।

প্রথম প্রথম যখন ওঁর ক্লাসের এক কোণে বসে থাকতাম, তখন মনে হত, উনি জানেন না, ওঁর ক্লাসের একটি ছেলে ওঁর সব লেখা পড়েছে, এমনকী অনেক লেখা দু'বার তিনবার পড়েছে। কথাটা অতিরঞ্জিত নয়—আমার যখন কোনও লেখকের লেখা ভাল লাগে তখন তাঁর সমস্ত লেখা যেখান থেকে হোক ঠিক খুঁজেপেতে পড়ে ফেলি। তখন আমি ওঁর লেখার দারুণ অনুরাগী, উপনিবেশ পড়ে মুগ্ধ হবার পর একে একে পড়ে ফেলেছি সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, বৈতালিক, মহানন্দা, ট্রফি, শিলালিপি। সেটা উনিশ শো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, কোনও পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছে ওঁর গল্প, 'আবাদ', কতবার যে পড়েছিলাম সেই গল্পটা। স্পষ্ট মনে আছে, তখন একটা লঘু দায়িত্বজ্ঞানহীন পত্রিকায় ওঁর শিলালিপি বইটার নিছক বিদ্বেষপ্রসূত বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছিল—তখন 'শিলালিপি' আমার হট ফেভারিট, সেই সমালোচনা পড়ে আমি এমন রেগে গিয়েছিলাম যে, হাতের কাছে পেলে সেই সম্পাদককে হয়তো মেরেই বসতাম।

কিছুদিন ক্লাস চলার পর উনি যখন আমাকে চিনলেন, তখন কিন্তু ওঁকে এইসব কথা কিছুই বলিনি। ওঁর লেখা নিয়ে কোনওদিন ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। বস্তুত, কোনও লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখা বিষয়ে কীভাবে আলোচনা করতে হয়, তা আমি এখনও জানি না। শিলালিপি বইটা বন্ধুবান্ধবদের ধরে ধরে পড়াচ্ছি তখন, কিন্তু সেই বইয়ের লেখকের সামনে সে বিষয়ে একটা কথাও বলতে পারিনি।

অন্যান্য বই নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কয়েকবার গেছি ওঁর পটলডাঙার বাড়িতে। ওই বাড়িতে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি বড় হয়ে কী হবে? লেখক হবে নাকি? লেখক হবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার তখন ছিল না। আমি বলেছিলাম, না, স্যার, আমার ইচ্ছে করে নানা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে। উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তারপর বুঝি ফিরে এসে ভ্রমণ কাহিনী লিখবে? দেখো লেখক হতে হলে কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। লেখকের জীবন বড় কষ্টের।

আমি ওঁর প্রিয় ছাত্রদের অন্তর্গত ছিলাম না। লেখাপড়ায় আমি কোনওদিনই ভাল ছাত্র নই, তা ছাড়া ফোর্থ ইয়ারে উঠে অন্যান্য ব্যাপারে এমন মত্ত হয়ে উঠি যে,

কলেজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই চুকে যায়। এখন অবশ্য আফশোস হয়, কেন আর একটু মন দিয়ে লেখাপড়া করিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির কথা অনেকেরই জানা। বইয়ের রেফারেন্স, বা কবিতার লাইনই যে শুধু মনে থাকত তাই নয়—মানুষের মুখ ও নাম মনে রাখারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলেজ ছাড়ার পাঁচ ছ' বছর বাদে ওঁর সঙ্গে এক জায়গায় দেখা। আমার দৃঢ় ধারণা, উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। মাত্র বছর দেড়েক ওঁর ছাত্র ছিলুম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসেও পড়িনি—আমাকে চিনতে পারার কোনও প্রশ্নই ওঠে না—কিন্তু উনি ঠিক আমাকে দেখেই এক নিমেষও চিন্তা না করে বললেন, কি সুনীল, কেমন আছ? তারপর আমাদের ব্যাচের অন্যান্য ছেলে—ফণিভূষণ আচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল প্রভৃতির কথাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি স্তম্ভিত!

তিন বছর আগে জলপাইগুড়ির বন্যার পর ওঁকে আর এক ভূমিকায় দেখেছিলাম। উত্তরবঙ্গের বন্যার পর কলকাতায় সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে পথ-শোভাযাত্রা করে কিছু সাহায্য ও জামাকাপড় সংগ্রহ করার প্রস্তাব উঠেছিল। শ্যামবাজার থেকে শোভাযাত্রা বেরুবার কথা। গিয়ে দেখি বিশেষ কেউ আসেনি, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী ঠিক উপস্থিত। উত্তরবঙ্গে উনি অনেকদিন কাটিয়েছেন, ওখানকার প্রতি ওঁর ছিল আন্তরিক টান। সেদিন ছিল প্রচণ্ড রোদ—সেই রোদের মধ্যেই ঘণ্টা চারেক পায়ে হেঁটে ঘুরে, সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

'দেশ' পত্রিকায় উনি সুনন্দর জার্নাল লিখছিলেন প্রায় সাত বছর ধরে। দেশের সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে উনি বিশেষ সজাগ ছিলেন, অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল ওঁর মন, তাই এই দীর্ঘকালেও ওঁর কখনও বিষয়বস্তুর অভাব হয়নি। এতদিন ধরে এমন বিচিত্র রচনা অব্যাহত রাখার কৃতিত্ব কতখানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু একটি সংখ্যার সুনন্দর জার্নাল পড়ে রীতিমতন চমকে উঠতে হয়। রচনাটি আগাগোড়া বিষণ্ন হাহাকারের মতন। আজকের বর্বরতা ও রুচিহীনতায় তিনি ব্যথা বোধ করেছেন, তা ছাড়াও লেখাটিতে নিজের মৃত্যুচিন্তা বড় বেশি উপস্থিত। একাধিক জায়গায় নিজের অস্তিত্ব বিলোপের কথা উল্লেখ করলেন কী করে? এক জায়গায় লিখেছেন, "আপাতত এই মুহূর্তে বুক ভাঙা আর্তনাদে আমার গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে: 'আমি জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে—ইত্যাদি ইত্যাদি।' এবং পরের সংখ্যা 'দেশ'-এ যদি সুনন্দর জার্নালের পাতা অদৃশ্য হয়—আশা করি তা হলে আপনারা কেউই বিস্মিত হবেন না।" এবং রচনাটি শেষ করতে গিয়ে আবার লিখেছেন, "অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দর পাতাটি যদি না থাকে, তা হলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।"

মৃত্যুর আগে কি মনের ভেতর তার কোনও বার্তা আসে? জানি না। এটা ভাবতে ভাল লাগে, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অসুস্থ শরীরে অনেক সময় মৃত্যুচিন্তা আসে, হয়তো এটা তারই প্রকাশ। সেই অসুখ থেকে তিনি সেরে উঠেছিলেন, শুক্রবার সকালে বাড়িতে আমাকে বলেছিলেন, ভাল আছি।

কিংবা শরীরে অসুখের প্রকোপ বোধহয় তিনি টের পেয়েছিলেন। মৃত্যুকে অনুভব করেছিলেন অবচেতন ভাবে। কিন্তু তিনি হার মানতে চাননি। মৃত্যুকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গত সংখ্যায় ওই জার্নালের পরেও তিনি আবার লিখেছিলেন, ওইটাই শেষ লেখা নয়। এবং গাড়িতে একটু জোর দিয়ে বলেছিলেন, এখন ভাল আছেন।

তাই রবিবার রাত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি।

অ্যালেন গিন্‌সবার্গের কবিতা এবং কলকাতা

অ্যালেন গিন্‌সবার্গ তার বন্ধু পিটার অরলভ্‌স্কিকে নিয়ে কলকাতায় আসে ১৯৬২ সালে। কোনও আমন্ত্রণে নয়, প্রাণের টানে। এর আগে আমেরিকার এক আসরে পরিচয় হবার পর অ্যালেন গিন্‌সবার্গ বুদ্ধদেব বসুকে বলেছিল, এমনকী আমি পায়ে হেঁটেও ভারতে পৌঁছতে চাই। সত্যি সত্যি পায়ে হেঁটে আসেনি, তবে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে হিচ হাইক করেছিল। সম্বল ছিল, কবিতার বই বিক্রির রয়ালটি। কবিতার বই বিক্রির টাকায় বিশ্বভ্রমণ? আমাদের কানে তো অসম্ভব শোনাবেই, সম্পন্ন দেশগুলিতেও অস্বাভাবিক। কিন্তু ততদিনে অ্যালেনের 'হাউল' এবং 'কাডিস' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, 'হাউল' সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছিল, কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল, এ রকম শুনেছি। এবং অ্যালেনদের জীবনযাত্রা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের অনাড়ম্বর। পায়ে ছেঁড়া জুতো, ধার-করা জামাকাপড় (অ্যালেন এক মৃত বন্ধুর কিছু পোশাক পেয়েছিল), ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং...প্রায় হট্ট মন্দিরে। কলকাতায় অ্যালেন এসে উঠেছিল চাঁদনি চকের পেছনে, অতি সস্তা, নোংরা ও গরিবদের মুসলমান হোটেলে। ঘর ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। তখনও হিপি কালচার শুরু হয়নি, কলকাতায় অত গরিব চেহারার আমেরিকান সাহেব আগে দেখা যায়নি।

হিপি আন্দোলন ছিল যুদ্ধ-বিরোধী, ভিয়েতনামে আমেরিকান আক্রমণ সেই সব আমেরিকান যুবকরা সমর্থন করেনি, পরে এটা একটা হুজুগ ও সাব-কালচারে পরিণত হয়। অ্যালেনদের গোষ্ঠীটা তার পূর্ববর্তী, ওদের বলা হত বিট জেনারেশন, চলতি কথায় বিটনিক, এরা প্রধানত শিল্পী, কবি, গায়ক, সব রকম প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাই এদের লক্ষ্য। অ্যালেন মনে করত, যে কবিতা লিখবে ঠিক করেছে, তার কোনও রকম চাকরি-বাকরি করা উচিত নয়, সে চব্বিশ ঘণ্টাই কবিতার জন্য নিবেদন করবে। লিখে-টিখে যা সামান্য পয়সা পাবে, তা দিয়েই গ্রাসাচ্ছাদন করতে হবে, না কুলোলে কম খাবে, জুতো জামা পরবে না, ট্রাম-বাসে না উঠে হাঁটবে। আমরা যারা সেই সময়কার তরুণ কবি, এই সব কথা শুনে দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, কবিতা লেখাই তো কবির একমাত্র কাজ, সে কেন ইস্কুল মাস্টারি করতে যাবে, কিংবা সংবাদপত্রে হাবিজাবি গদ্য লিখবে।

কিন্তু কবিতা লিখে, সপরিবারে দূরে থাকা, একা একাও বেঁচে থাকা, আমাদের দেশে, উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন।

সেবারে কলকাতায়, বারাণসীতে ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় প্রায় বছরখানেক কাটিয়ে গিয়েছে অ্যালেন ও পিটার। কলকাতায় তার অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে নিমতলা শ্মশানঘাটে প্রায়ই আড্ডা হত। এবং কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। সেই সময় থেকেই অ্যালেনের অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে ঝোঁক চাপে,

সেই জন্য সে দক্ষিণেশ্বরে, তারাপীঠে ঘোরাঘুরি করেছে। এ ছাড়াও বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিল জামশেদপুরে এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে, সেখান থেকে চাইবাসায় ও পাটনায়। ওই দুই স্থানে সমীর রায়চৌধুরী ও মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অ্যালেনের প্রভাবে এবং বিট জেনারেশনের সূত্র ধরে রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় শুরু করে হাংরি জেনারেশন নামে এক আন্দোলন, কিছুদিনের জন্য বাংলা সাহিত্যে তা বেশ হইচই তুলে দিয়েছিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ কয়েকজন প্রথমদিকে যোগ দিয়েছিল ওই আন্দোলনে, তারপর হঠাৎ পুলিশি হামলা শুরু হতে এরা সরে আসে।

অ্যালেন আবার কলকাতায় ফিরে আসে ১৯৭১ সালে। তখন বাংলাদেশ যুদ্ধ চলছে, শরণার্থীদের দুর্দশা সে নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল। আর কখনও তার আসা হয়নি, যদিও আসার ইচ্ছে আছে, স্মৃতির সরণি বেয়ে সে এদেশে আবার ঘুরতে চায়। কিন্তু আগের মতন কষ্ট করে থাকার মতন বয়েস বা স্বাস্থ্য তার নেই, কোনও সংস্থা থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আগামী দু'চার বছরের মধ্যে অ্যালেন গিন্‌সবার্গের পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। তারপর নিশ্চয়ই তাকে আমন্ত্রণ জানাবার ধুম পড়ে যাবে।

কলকাতা ছাড়াও অ্যালেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। নিউ ইয়র্কের গ্রিনিচ ভিলেজে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে আমি বেশ কিছুদিন থেকেছি। আর একবার দেখা হল, যুগোশ্লাভিয়ার এক কবিতা-উৎসবে (তখন যুগোশ্লাভিয়া নামে একটি দেশ ছিল), সেখানে রুশ কবি ভজনেসেনস্কিও ছিল, কয়েকদিন খুব আড্ডা হল। আর একবার আমেরিকায় ভারত-উৎসবে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে ছ'জন ভারতীয় কবিও প্রেরিত হয়েছেন, সেই দলে দৈবাৎ আমাকে যুক্ত করা হয়েছিল। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় কবিদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থাপনার অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছিল অ্যালেন নিজে। সেটা ১৯৮৬ সাল। সেবারে ভারতীয় কবিরা যে যার মাতৃভাষায় কবিতা পাঠ করেছে, ইংরেজি অনুবাদ পড়ে দিয়েছে স্থানীয় কোনও কবি। আমি কবিতা পড়েছি বাংলায়, সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ পড়েছে অ্যালেন। তার মতন একজন প্রখ্যাত কবি আমার মতন একজন অখ্যাত জনের কবিতা পাঠ করেছে প্রকাশ্য সভায়, এতে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছি, মরমে মরে গিয়েছি যাকে বলে। আমার নিষেধ না শুনে অ্যালেন নিজেই আগ্রহ করে পড়তে চেয়েছিল।

অ্যালেনের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে ১৯৯৩ সালে। এর মধ্যে তার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন আর ছেঁড়া জামা পরে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার উপার্জন প্রচুর। বই বিক্রির টাকা তো আছেই, তার কবিতা সে গান গেয়ে ক্যাসেট বার করেছে, তারও বিক্রি অনেক। সে নিজের তোলা ছবির একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছে, বিভিন্ন মানুষের পোর্ট্রেট, প্রতি পৃষ্ঠায় তার নিজের হাতের লেখা মন্তব্য। সে অ্যালবামটিও বেস্ট সেলার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে কবিতা পাঠের জন্য ডাকে, হাজার হাজার ডলার সম্মান দক্ষিণা দেয়। এ ছাড়াও সে ব্রুকলিন কলেজের ভিজিটিং প্রফেসর, তার পড়াবার বিষয়বস্তু বিট জেনারেশনের সাহিত্য, অর্থাৎ তার নিজের ও

বন্ধুবান্ধবদের রচনা। পৃথিবীতে আর কোনও অধ্যাপক এমন চমৎকার বিষয়বস্তু পেয়েছেন কী? অ্যালেন পুরোদস্তুর সুট-টাই পরে পড়াতে যায়। ম্যানহাটনের একটি আকাশচুম্বী হর্ম্যের চল্লিশ তলার কক্ষে আমাকে একদিন সে তার ক্লাসে নিয়ে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা করে ক্লাস, সপ্তাহে দু' দিন। সে জন্যই তাকে যা মাইনে দেওয়া হয়, তা শুনলে আমাদের এখানকার অনেক অধ্যাপকের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আমি সে অঙ্কটা আর উল্লেখ করলাম না।

অ্যালেনের জীবনযাত্রা এখনও আগের মতনই অনাড়ম্বর। উপার্জনের অনেক টাকাই সে বিলিয়ে দেয়। থাকে ১২ নং রাস্তার একটি সাধারণ ফ্ল্যাটে। সম্পূর্ণ মশলা ছাড়া নিরামিষ আহার। সাদা ভাত ও পাতলা ডাল ভালই রাঁধে, আমাদের খাইয়েছিল। তার ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি ছোট ঠাকুরঘর আছে। সেবারে আমাদের সঙ্গে ছিল নবনীতা দেবসেন, সে সেই ঠাকুরঘর দেখে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। অ্যালেন অবশ্য এখন হিন্দু অধ্যাত্মবাদ ছেড়ে বৌদ্ধদর্শন ও তান্ত্রিকতায় আকৃষ্ট। গাঁজা একেবারেই ছোঁয় না, মদ কোনওদিনই খেত না, সিগারেটও ছেড়েছে অতি কষ্টে। সিগারেট ছাড়ার মন্ত্র হিসেবে একটি স্বরচিত গান আমাদের গেয়ে শুনিয়েছিল।

সেবারে অ্যালেনের স্বাস্থ্য ভাল দেখিনি। একটা চোখে থ্রম্বসিস হয়েছে। কিন্তু প্রথম দেখা হওয়া মাত্রই বন্ধুত্বের প্রগাঢ় উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরা কখনও ভোলার নয়। তারপর সেই অসুস্থ শরীরেই পথে পথে ঘোরা, আর কলকাতার বিভিন্ন পরিচিতজনের খবরাখবর নেওয়া।

১৯৮৬ সালের সেই ভারত উৎসবের সময় অ্যালেন আমাকে তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'কালেক্টেড পোয়েম্‌' উপহার দিয়েছিল। আমরা সাধারণত কাউকে বই উপহার দিলে শুধু নামটা লিখে দিই। অ্যালেন আমায় আগেও যত বই পাঠিয়েছে, তাতে নানারকম ছবি এঁকে ও বিচিত্র সব মন্তব্য লিখে দিয়েছে। এই বইতেও ফুল, চাঁদ, তারা এঁকে এক জায়গায় লিখল, 'Happy that we exchange poems about after Quarter Century'.

এই কাব্যসংগ্রহের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৩৭, যদিও এতে আছে তার ১৯৮০ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতাবলি। এমন চমকপ্রদ রকমের সুসম্পাদিত গ্রন্থ আর দেখিনি। পেছন দিকে সংকলিত তথ্যপঞ্জি, যার নাম দেওয়া হয়েছে Appendix, তারই পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০। এ বই যে-কোনও সম্পাদকের আদর্শ হতে পারে। সম্পাদনা কে করেছেন, তাঁর নাম নেই, হয়তো গ্রন্থকার নিজেই, হ্যাঁ, স্বপন মজুমদারও তাঁর কাছে হার মেনে যাবেন।

এই সুবিশাল গ্রন্থটি এ দেশে সুলভ নয়, কলকাতায় অনেকেই দেখেননি, তাই মাঝে মাঝেই ভেবেছি, এই কাব্যসংগ্রহটি নিয়ে কিছু লেখালিখি করলে মন্দ হয় না। কিন্তু আগে এতখানি ব্যক্তিগত কথাবার্তা লিখলাম কেন? তার কারণ, শুধু কবিতা বিষয়ে পাতার পর পাতা লিখতে আমার ইচ্ছে করে না, কেমন যেন একঘেয়ে মনে হয়। কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধের বই পড়তে গিয়ে দেখেছি, একই কথা বারবার বলা হচ্ছে, কিংবা কবিতার যে-সব ব্যাখ্যার দরকার নেই, তাও বিস্তারিত করা হচ্ছে অকারণে।

তা ছাড়া, এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো অ্যালেন গিন্‌সবার্গ ও তার বন্ধুদের কাব্য আন্দোলনের পটভূমিকা জানে না। সামান্য একটু সূত্র ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মানুষটাকেও চেনা দরকার।

পুরো বইয়ের কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সাত কাণ্ড হয়ে যাবে, সে চেষ্টাও আমি করব না। আমি শুধু লিখব অ্যালেন গিন্‌সবার্গের ভারত, বিশেষত কলকাতার পটভূমিকায় লেখা কবিতাগুলি বিষয়ে।

অ্যালেন গিন্‌সবার্গের জন্ম নিউ জার্সিতে, ১৯২৬ সালে, অর্থাৎ সদ্য তাঁর ৭০ বছর পূর্ণ হয়েছে। বাবা লুইস গিন্‌সবার্গও ছিলেন মাঝারি ধরনের কবি। প্রথাগত লিরিক লিখেছেন অনেক। বাবার প্রভাবেই সম্ভবত, অ্যালেন লিরিকের ঘোর শত্রু। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গদ্যে কথা বলার ভঙ্গিতে লেখা। আমেরিকান কবিতায় অ্যালেন গিন্‌সবার্গ নতুন ভাষারীতির প্রবর্তন করেছেন। একথা অনেকে স্বীকার করেন। জন্মসূত্রে ইহুদি, মায়ের নাম নায়োমি। মায়ের উদ্দেশেই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা 'কাডিস' লেখা। এই কবিতায়, অতি সাধারণভাবে, চোখে না দেখা, খবরের কাগজ পড়া ভারতের উল্লেখ আছে।

With your eyes of Russia
With your eyes of no money
With your eyes of false China
With your eyes of Aunt Elanor
With your eyes of starving India
With your eyes pissing in the park
With your eyes of America taking a fall...ইত্যাদি

প্রসঙ্গত বলে দিই, অ্যালেন আমেরিকাকে এত গালাগালি দিয়েছেন, বাবা-মা তুলে গালাগাল দিয়েছেন বলা যায়, কোনও কবি নিজের দেশের এমন নির্মম সমালোচনা করেছেন বলে জানা নেই। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম `The Fall of America, Poems of these States.' তাঁর একটি কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি:

America when will we end the human war?
Go fuck yourself with your atom bomb...
America when will you be angelic?
When will you take off your clothes?
When will you look at yourself through your grave?
When will you be worthy of your million Trotskyites?
America why are your libraries full of tears?
America when will you send your eggs to India...

অ্যালেন চে গুয়েভারাকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন। কিন্তু আমেরিকা এমনই এক মজার দেশ যে এরকম একটি প্রতিবাদী কণ্ঠকেও রোধ করার কোনও ব্যবস্থা

সে-দেশে নেই। এক সময় ছিল, ম্যাকার্থির আমলে ছিল, কিন্তু ষাটের দশকে ব্যক্তিস্বাধীনতা চরম অবস্থায় পৌঁছয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী আমেরিকান সংবাদপত্রই ফাঁস করে দেয়। অ্যালেনের ক্ষেত্রেও বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে, তাঁর তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ফলে প্রথম প্রথম প্রতিষ্ঠান তাঁকে গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর মৌলিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে। এবং কবি যতই অনিচ্ছুক হোন না কেন, প্রতিষ্ঠান এক সময় তাঁকে গ্রাস করবেই। অ্যালেনকে ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ইন্সটিটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্সের সদস্য করে নেওয়া হয়েছে। অ্যালেনের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা ও চিঠিপত্র লেখার জন্য এখন একজন সেক্রেটারি আছে, সেই সেক্রেটারির মাইনে দিয়ে দেন সরকার।

অন্যান্য আরও কিছু কবির মতো অ্যালেনও মনে করেন, তাঁর সমস্ত কবিতাই আসলে একটি নিরবচ্ছিন্ন কবিতা। অথবা কবিতাই আত্মজীবনী। সেই জন্যই এ সংগ্রহের ভূমিকায় অ্যালেন লিখেছেন, 'Herein author has assembled all his poetry books published to date rearranged in straight chronological order to compose an autobiography। সেই জন্যই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে তাঁর জীবনযাত্রারও পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতে পৌঁছে অ্যালেন প্রথম যে-দীর্ঘ কবিতাটি লেখেন, সেটা হিন্দু দেবী কালীর উদ্দেশে একটি স্তোত্র, নাম, 'Stotras to Kali Destroyer of Illusions'. এটা বম্বেতে বসে লেখা। কলকাতায় এসে যে ছোট কবিতা লিখলেন, সেটার নাম 'To P.O.'. এই পি.ও. হচ্ছে অ্যালেনের বন্ধু ও এককালের শয্যাসঙ্গী পিটার অরলভস্কি। পিটার নিজেও একজন কবি (অ্যালেনের সঙ্গে মাঝখানে কয়েকবার দেখা হলেও পিটারকে দ্বিতীয়বার দেখেছি তিরিশ বছর পর। মাঝখানে সে বেশ কিছুদিন মানসিক হাসপাতালে বন্দি হয়ে ছিল। '৯৩ সালে যখন দেখা হল, তখন সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও আগের মতনই কৌতুকপ্রিয়, আমাকে চিনতে পারল ঠিকই, কিন্তু কলকাতার স্মৃতি অনেক ফিকে হয়ে এসেছে)। কলকাতায় সেই '৬২ সালের ৮ জুলাই অ্যালেন পিটারের উদ্দেশে কবিতাটি লিখেছিল, কারণ, সেদিন পিটারের জন্মদিন। কবিতাটি নিছক গদ্য বর্ণনার মতন, কিন্তু তাতেই অ্যালেনের কবিত্বের জোর।

কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এ রকম:

The white washed room, roof
of a third rate Mohameddan hotel,
two beds, blurred fan
whirling over yr brown guiter,
Knapsack open on floor, towel
hanging from chair...

একে তো জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরম, তারপর ওই রকম চাপা, অন্ধকার হোটেলের ঘর। পাখা একটা ঘোরে বটে, কিন্তু তাতে যতটা ঘ্যাড়ঘ্যাড় শব্দ হয়, তার

চেয়ে হাওয়া কম। সুতরাং ভারত সম্পর্কে যতই রোম্যান্টিক মোহ থাকুক, প্রথম প্রথম এই দুই আমেরিকানের পক্ষে গরমের কষ্ট উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কলকাতায় তাই অ্যালেনের দ্বিতীয় কবিতার নাম Heat. এর কিছু অংশ:

Eye like mango flowing orange pus
Ears Durga people vomiting in their sleep
Got huge legs a dozen buses move inside Calcutta
Swallowing mouthful of dead rats...

কলকাতা ছেড়ে দুই বন্ধুতে কিছুদিন বেনারস গিয়ে থাকেন। শহর হিসেবে কলকাতার চেয়ে বেনারস যে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, তা স্বীকার করতেই হবে। কলকাতায় এসে আবর্জনার স্তূপ, ভাঙা রাস্তা, ভিখিরি, বেওয়ারিশ কুকুর, এইসবই বেশি চোখে পড়ে, বেনারসেও এই সবই আছে। কিন্তু তার অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আছে। এই শহরের প্রাচীনত্বই একটা রোমাঞ্চ এনে দেয়। গঙ্গার ঘাটগুলিতে দাঁড়ালেই যেন অনুভব করা যায় ঐতিহাসিক প্রবহমানতা।

কাশীতে গিয়ে অ্যালেনের প্রথম কবিতা দশাশ্বমেধ ঘাটে বৃষ্টির বর্ণনা। তখন ফেব্রুয়ারি মাস, শীতকালের বৃষ্টি। এই পর্যায়ে অ্যালেনের সব কবিতাই নিছক দৃশ্য ও বস্তুর বর্ণনা, যেন সরাসরি গদ্যভাষা, তারই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ বাক্যবন্ধের অদ্ভুত মোচড়। এর একটা উদাহরণ তুলে দিচ্ছি:

Because a dog barked at a madman with dirty
wild black hair who rag round
his midriff and water pot in hand
Stopped in midstreet turned round and gazed up at the balconies, window
Shops and City stagery filled with gleem activity
Shrugged and said Jai Shankar! to the imaginary audience of Me's...

উন্মাদটির বর্ণনা দিতে দিতে তার জয় শংকর বলে চেঁচিয়ে ওঠা, তারপরই 'imaginary audience of Me's' হঠাৎ কবিতাটিকে ঝলসে দেয়।

বেনারসে থাকতে থাকতেই একজনের কাছে অ্যালেনরা কবি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসের মৃত্যুসংবাদ পান। আমেরিকার পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে এই ডবলু সি উইলিয়ামসকেই বিট জেনারেশনের কবিরা বিশেষ মান্য করতেন, একথা আমি অ্যালেনের মুখে অনেকবার শুনেছি। এরপরের কবিতাটি তাই 'Death News', তাতে যেমন রয়েছে স্মৃতি সঞ্চার, তেমনই এসেছে কাশীর গঙ্গানদীর কথা।

পরবর্তী কবিতাটি বারাণসীতে বসেই লেখা, কিন্তু গৃধ্রকূট পর্বত বিষয়েই এর নাম: 'Valture Peak: Gridhakuta Hill'। এরপর বারাণসী থেকে কলকাতা ফেরার পথে দু'জনে পাটনায় থেমেছিলেন, সেই যাত্রায় 'Patna-Benaras Express' নামের কবিতাটি লেখা হয়। দ্বিতীয়বার এসেও অ্যালেন কলকাতায় বেশ কিছুদিন ছিলেন,

কিন্তু কবিতা লেখা হয়েছে একটাই, 'Last Night in Calcutta.'

যতদূর মনে পড়ে, অ্যালেন-পিটারের কলকাতা ত্যাগের আগের রাত্রিটি কাটানো হয়েছিল উৎপলকুমার বসুর বাড়িতে। উৎপল তখন একটি মস্ত বড় ফাঁকা বাড়িতে থাকে, সে বাড়িটি তখন বিক্রির অপেক্ষায়। খুব হইচই-এর পর শেষ রাত্রে যে যেখানে পেরেছে শুয়ে ঘুমিয়েছে। তার কিছুটা বর্ণনা আছে এই কবিতায়:

Pushkin sits of the bookself. Shakespear's
Complete works as well as Blake's unread—
O Spirit of Poetry, no use calling on you
babbling in this emptiness furnished with beds
under the bright oval mirror—perfect
night for sleepers to dissolve in tranquil
blackness, and rest there eight hours
Walking to stained fingers, bitter mouth
and lung gripped by Cigarette hunger...

সব মিলিয়ে অ্যালেনের কলকাতায় রচিত কবিতাগুলি খুব একটা উচ্চাঙ্গের নয়। সেই তুলনায় বেনারসে লেখা কবিতাগুলি অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কলকাতায় আড্ডা হয়েছিল বেশি।

দ্বিতীয়বার একাত্তর সালে এসে অ্যালেন একটিমাত্র কবিতা লিখেছিলেন, 'September on Jessore Road'। এই কবিতাটি খুবই বিখ্যাত ও নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যালেনের সমগ্র কবিতাবলির মধ্যেই এই কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর আঙ্গিকের পরীক্ষাও চমকপ্রদ। দারিদ্র্য, হতাশা, নিপীড়ন, অসহায়তার বর্ণনাই হয়ে উঠেছে মন্ত্রের মতন। অ্যালেনের নিজস্ব সুরে, নিজের গলায় গাওয়া এই কবিতাটির ক্যাসেট এবং সি. ডি. পাওয়া যায়। কবিতাটির মধ্যে এক জায়গায় আমার নাম আছে, সে কথা চাপা গর্বের সঙ্গে আমি আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি। সুতরাং এখন আবার সেই কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে যাবে।

অ্যালেন প্রায় বৎসরকালের ভারত পর্যটনে কবিতা কম লিখেছেন, কিন্তু ডায়েরি রাখতেন। সেই গদ্যরচনা 'ইন্ডিয়ান জার্নালস' নামে বই হিসেবে ছাপা হয়েছিল। সে বইতে কলকাতা ও পশ্চিমবাংলার অনেক রেখাচিত্র আছে, শক্তি, সন্দীপন, তারাপদ রায়, মতি নন্দী প্রমুখর উল্লেখ আছে অনেকবার। কিন্তু উদ্ধৃতি দিতে পারছি না, সেই বইটি অ্যালেন যথাসময়ে আমাকে পাঠালেও এখন আমার কাছে নেই। বছর দশেক আগে একটি নতুন লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ সম্পাদক আমার বাড়িতে বইখানি দেখে কাকুতি-মিনতি করে চেয়ে নিয়ে যায়। ঠিক চারদিন পরে ফেরত দিয়ে যাবে বলেছিল। আমি সরল বিশ্বাসে অনেককেই বই দিয়ে ফেলি। সেই যুবকটি কিন্তু আর ফিরে আসেনি। পত্রিকাটিরও পরবর্তী কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সেই পত্রিকা ও সম্পাদকের নামও আমি ভুলে গেছি। তাকে আর কখনও দেখিনি।

বই মেরে দেওয়া এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়। আমার বাড়িতেও ফেরত

না-দেওয়া অপরের কিছু বই আছে। কিন্তু সেই একটিমাত্র বইয়ের জন্য যুবকটি কেনই বা তার পত্রিকা বন্ধ করে দিল এবং একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা আমার কাছে আজও রহস্যময় মনে হয়।

* কালেকটেড পোয়েমস—অ্যালেন গিনসবার্গ

সমরেশদা

সমরেশ বসু আমাদের ঠিক এক দশক আগের লেখক। অর্থাৎ আমরা যখন সদ্য স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে এসেছি তখন তিনি উদীয়মান তরুণ লেখক। 'পরিচয়' কিংবা 'দেশ' ছাড়াও অনেক ছোটখাটো পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুচ্ছে, যতদূর মনে পড়ে, তাঁর 'অকালবৃষ্টি' নামে একটি দুর্ধর্ষ ছোটগল্প কোনও ছোট পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। আমরা তখন কবিতা নিয়ে মাতামাতি করছি, কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করছি; কবিরা সাধারণত গদ্য রচনা বিশেষ পড়ে না, কিন্তু আমি সব পত্র-পত্রিকায় প্রতিটি রচনা তন্নতন্ন করে পড়তাম এবং সমরেশ বসুর অগ্রগতি লক্ষ করেছি।

দেশ পত্রিকায় কালকূট নামে ধারাবাহিক উপন্যাস 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশের পরই তরুণ লেখক সমরেশ বসু হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তখনকার খুব উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রকাশক সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসের লেখককে, সোনার কলম পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করলেন, তারাশঙ্কর থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত খ্যাতনামা লেখকেরা সমরেশ বসুকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের মতন কফি হাউসের ছেলে ছোকরারা তাঁকে বরণ করে নিয়েছি আরও আগেই।

কোনও লেখকের রচনা পড়ে মুগ্ধতা জাগলে সেই লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও জানতে ইচ্ছে করে। সমরেশ বসু সম্পর্কে তখন নানা ধরনের সত্যি-মিথ্যে গল্প প্রচলিত ছিল। কফি হাউসের আড্ডায় তিনি বিশেষ আসতেন না, কিন্তু কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় তাঁকে দেখা যেত প্রায়ই। দৈর্ঘ্যে কিছুটা খাটো, কিন্তু অত্যন্ত রূপবান পুরুষ। মুখখানি সহাস্য। তাঁর প্রতিদিনের পোশাকই নজরে পড়ার মতন। যদিও তাঁর প্রথম যৌবন বেশ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, সেই সময়েও তাঁর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কলকাতায় তাঁর কোনও বাসস্থান ছিল না, নৈহাটি থেকে ট্রেনে যাতায়াত করতেন, কিন্তু এক একজন মানুষই থাকে এরকম, পোশাকের সুরুচি সম্পর্কে সজাগ। তাঁকে আমি কোনওদিনই ময়লা কিংবা ইস্ত্রি-নষ্ট জামাকাপড় পরতে দেখিনি, সুদৃশ্য পোশাকে তাঁকে মানাতোও খুব।

১৯৬৫ সালে শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিবর'। সঠিক বছরটা আমার মনে থাকবার কারণ, পরের বছরই ওই শারদীয় সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখে আমি অনধিকারীর মতন গদ্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম। 'বিবর' প্রকাশিত হবার পর সন্তোষকুমার ঘোষ দেশ পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে সেই উপন্যাসের অজস্র প্রশংসা করে জানান যে, তাঁর মতে বিবর দশটি শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসের অন্যতম। প্রায় সমসাময়িক কোনও লেখক সম্পর্কে অপর প্রতিষ্ঠিত কোনও লেখকের এরকম

লিখিত উচ্ছ্বাস সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তারপরেই 'বিবর'কে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় ওঠে। পরের বছর প্রজাপতি প্রকাশিত হলে সেই বিতর্ক অন্যদিকে মোড় নেয়। সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিষয়ে আলোচনা-সভা বসে বহু জায়গায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী, এবং অন্যত্র। কেন জানি না, সেইসব সভাতে আমারও ডাক পড়তে লাগল, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়টা জমে ওঠে। যদিও এর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে কয়েকবার, সাগরময় ঘোষের দফতরে, সন্তোষকুমার ঘোষের ঘরের আড্ডায়। একবার সন্তোষকুমার আমাকে প্রায় জোর করেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নৈহাটিতে সমরেশ বসুর বাড়িতে। তাঁর প্রথমা পত্নী গৌরী দেবীর একটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের সেদিন বার্ষিক উৎসব, সাগরময় ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ আরও অনেকে গিয়েছিলেন। প্রায় সারারাত খুব হইচই ও ফূর্তি জমেছিল খুব।

শ্লীল-অশ্লীল আলোচনা-সভাগুলিতে সমরেশ বসু প্রতিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিতেন জোরালো যুক্তি দিয়ে, আমাদের দেশের নির্যাতিত নিরন্ন মানুষদের পোশাক ও মুখের ভাষার উদাহরণ তুলে ধরতেন প্রায়ই। আমি আমার বক্তব্য সেরে দিতাম অনেকটা ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা নিয়ে অশ্লীলতার প্রসঙ্গই ওঠে না। 'বিবর' 'প্রজাপতি'-কে অশ্লীল বলা হলে 'ট্রপিক অফ ক্যানসার'-কে কী আখ্যা দেওয়া হবে? কিন্তু এইসব আলোচনা-সভা এক এক সময় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠত, রাজনীতিতে তখন একটা চরমপন্থী হাওয়া বইছে, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দু' দিকের রাজনীতিই চলে যাচ্ছে চরমপন্থার দিকে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সাহিত্য-সংস্কৃতির নীতিবাগিশতার ব্যাপারে দু' পক্ষই একমত। সমরেশ বসুকে কেউ কেউ শারীরিক আক্রমণেরও ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু তিনি অকুতোভয়, তিনি আবার লিখলেন স্বীকারোক্তি, পাতক।

সেই সভাসমিতি থেকে বেরিয়ে কোথাও কোথাও আমরা বসতাম একসঙ্গে। তাঁর চেনাশুনোর পরিধি অনেক বড় হলেও তিনি আকৃষ্ট হলেন আমাদের আড্ডায়। মাঝে মাঝেই চলে আসতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের আড্ডায় পরনিন্দা-পরচর্চা বিশেষ হয় না, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদের আড্ডায় রাজনৈতিক ভেদাভেদও ছিল না, বড় কাগজের লেখক আর ছোট কাগজের লেখক বলে কোনও তফাত ছিল না, আমি নিজেই তখনও প্রধানত ছোট কাগজেরই লেখক এবং একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক। রাত্রের দিকে আমরা দল মিলে তাঁকে পৌঁছে দিতাম শিয়ালদা স্টেশনে, তিনি লাস্ট ট্রেনে নৈহাটি ফিরতেন।

কিছুদিন পর তিনি বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে ছোট একটি ফ্ল্যাট নিলেন, সেটাই হল কলকাতায় তাঁর প্রথম আস্তানা। দ্বিতীয়া পত্নী ধরিত্রী অর্থাৎ টুনিকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। সেই প্রথম দেখি একজন বড় মাপের লেখকের দৈনন্দিন সাহিত্যচর্চা। প্রত্যেকদিন সকালবেলা নিয়ম করে লিখতে বসতেন, দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও খালি গায়ে বসে লিখে যাচ্ছেন, কোনও কোনও দিন আড্ডার ঝোঁকে দুপুরের দিকে চলে গেছি তাঁর ওখানে, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলতেন, এখন যে ভাই

লিখছি! অর্থাৎ স্পষ্ট চলে যাবার ইঙ্গিত! লেখাটা যেন তাঁর প্রতিদিনের সাধনা। যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে কাজে ফাঁকি দেন, কারণ কাজটা তাঁদের নিজস্ব নয়। অন্য একজনও সে-কাজ করে দিতে পারে, কিন্তু লেখক-শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

অনেকের ধারণা, সাহিত্য রচনা বুঝি একটা প্রেরণার ব্যাপার। যখন তখন লিখতে বসলেই কি লেখা হয়? লেখা যখন মাথায় আসবে তখনই তো লিখতে বসা হবে। কিন্তু প্রেরণা জিনিসটা ভূতের মতন যখন তখন মাথায় এসে ভর করে না। সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে তার নিঃশব্দ বন্দনা করতে হয়। লেখকের কাছে যে-কোনও রচনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল প্রথম লাইনটা। কখনও কখনও পথ চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সেই লাইনটা মাথায় আসতে পারে বটে, আবার অনেক সময় হারিয়েও যায়। সাদা পৃষ্ঠাই সেই লাইনটি খুঁজে পাবার প্রধানতম প্রেরণা। সেই জন্যই, প্রতিদিনই লিখতে না পারলেও বড় লেখকরা নিয়মিত লেখার টেবিলে বসেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখতে বসতেন প্রত্যেকদিন ভোরবেলা। সমরেশ বসুকেই চোখেই সামনে সেরকম একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছি।

তিনি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে, সাহিত্যকেই সম্বল করে কাটিয়ে দেবেন সারা জীবন। কোনও চাকরি বাকরিতে সময় নষ্ট করবেন না। এই সিদ্ধান্ত সঠিক এবং দুঃসাহসিক। গান বাজনা, ছবি আঁকা, সাহিত্যচর্চা এগুলি চব্বিশ ঘণ্টারই কাজ, একজন শিল্পীর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা বা আপাত আলস্যও খুব প্রয়োজনীয়, কিংবা ভ্রমণ কিংবা অন্য কোনও শখের চর্চা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিছক শিল্প সাহিত্যের জন্য নিবেদিত হলে এদেশে জীবিকা অর্জন করা যায় না। চিত্রকরকে নিযুক্ত হতে হয় ওষুধ কোম্পানিতে, কবিকে সংবাদপত্র অফিসে কলম ক্ষইয়ে দিতে হয়, দেবব্রত বিশ্বাসের মতন গায়ককে আমি দেখেছি ইনসিওরেন্স কোম্পানির অফিসে হিসেবপত্তর দেখাশুনোর চাকরিতে। পুরোপুরি সাংসারিক দায়িত্ব নিয়েও শুধু বাংলা লিখে জীবনযাপনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এক সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের চোখে দেখা সময়ে সমরেশ বসু। আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয়, তখনও সমরেশ দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। সেইজন্য তাঁকে লিখতে হয়েছে প্রচুর, স্বনামে এবং কালকূট নামে ছাড়াও ভ্রমর ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন, সব লেখাই যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না, এত লিখলে তা সম্ভবও নয়। আমাদের দেশে সমালোচকরা এমনই অদ্ভুত, একজন লেখকের দশটা লেখার মধ্যে যদি চারটি খুব ভাল হয়, তিনটি মাঝারি আর তিনটি নিরেস, তা হলে সমালোচকরা প্রথম চারটি উপেক্ষা করে শেষের তিনটি নিয়েই হুল্লোড় করেন। সমরেশ এইসব সমালোচকদের কখনও গ্রাহ্য করেননি। তার চেয়েও বড় কথা, সারা বছর যাঁকে এত লিখতে হয়, সেই লেখকও প্রত্যেক বছরই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু লেখার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন।

জীবনযাপনের জন্য এত বেশি লিখতে হলেও তিনি কখনও দাঁতে দাঁত চেপে লেখেননি। তাঁর কমিটমেন্ট ছিল নিজের কাছে, মহাকালের দিকে তিনি অবহেলার

সঙ্গে টুসকি মেরেছেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরে সন্ধেবেলা তিনি অন্য মানুষ। আমি যতদূর জানি, পারতপক্ষে তিনি সন্ধের পর কলম ধরতেন না। শুনেছি সম্পূর্ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদক এবং টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশাইও সূর্যাস্তের পর মানুষের মেধাও ঢলে পড়ে মনে করে সন্ধের পর কিছু লিখতেন না। নৈহাটির কায়স্থ ঔপন্যাসিকটিও এইদিক থেকে ছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্মণদের অনুসারী। সন্ধের পর সমরেশ বসু ছিলেন অন্য মানুষ। সেজেগুজে বেরুতেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য তাঁর প্রাণ আনচান করত, আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, তর্কাতর্কি, গান, কখনও কখনও নাচও। টপ্পা অঙ্গের পুরনো বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন, খুব ফূর্তি হলে দু'একটা লৌকিকনৃত্যেও মেতে উঠতেন। কোনও সন্ধ্যায় উনি চুপচাপ বাড়ি বসে থাকলে ওঁর স্ত্রী টুনি ভয় পেয়ে যেতেন। তা হলে কি মানুষটার অসুখ বিসুখ হল নাকি?

বাংলাদেশ যুদ্ধের বছরে আমরা সবাই উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম। সেই যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা উত্তেজনার আতিশয্যে সংবাদপত্র অফিসে রাত্রি ভোর করেছি। সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও সমরেশ বসুও আসতেন, তাঁর জন্ম পূর্ববাংলা, শৈশব কেটেছে ঢাকা শহরে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তারপর আমরা সদলবলে গেলাম স্বাধীন বাংলাদেশে, সেখানে পেয়েছি সমরেশ বসুর প্রবল যৌবনময় সান্নিধ্য। তখন বাংলা সাহিত্যে কোনও রাজা-বাদশা নেই। সমরেশ বসুকেই মনে হত যুবরাজ। দু' দিকের বাংলা সাহিত্য অনুরাগীদের তিনি পরম প্রিয়। যিনি 'কোথায় পাবো তারে', লিখছেন, তিনিই লিখছেন 'গঙ্গা'; 'মানুষ রতন' কিংবা 'পাড়ি'-এর মতন গল্প তিনি অবহেলায় লিখে ফেলছেন একদিনে।

এর কয়েক বছর পর, আমরা যখন কবিতার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাটিকে সব-মেলানো মাসিক কবিতা-গদ্যের পত্রিকার রূপ দেবার চেষ্টা করছি, তখন তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, আমি এই কাগজে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখব। আমাদের সেই অব্যবসায়িক পত্রিকায় টাকা পয়সা দেবার কোনও প্রশ্ন ছিল না। আর সেই সময়ে সমরেশ বসু প্রত্যেক জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় অতি আরাধনীয় লেখক, অনেকেই তাঁর লেখা সাধ্যসাধনা করেও পায় না, তবু তিনি কৃত্তিবাসে নিজের থেকেই লিখতে চেয়েছিলেন এবং যথাসময়ে ইনস্টলমেন্ট দিতেন।

এই রকম একটা সময়েই তাঁর প্রথম হৃদ্‌রোগ হয়। এমন কিছু গুরুতর আঘাত নয়, তবু কোনও অতি সাবধানী চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সিঁড়ি ভাঙা একেবারেই উচিত নয়। কোনও একতলা বাড়িতে তাঁর থাকা দরকার। ততদিনে তাঁর কলকাতার সংসার বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে উঠে এসেছিল সার্কাস রেঞ্জের দোতলা ফ্ল্যাটে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর তাঁকে সেই দোতলা ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হবে; এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের বোধহয় আপত্তি ছিল। কিন্তু তক্ষুনি একতলার ঘর পাওয়া যাবে কোথায়? কৃত্তিবাস পত্রিকা ও আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী কল্যাণ চৌধুরী তখন যোধপুর পার্কে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন,

বাড়িটা ফাঁকা, ব্যাপারটা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন, তাঁর সেই বাড়ির একতলার একটি ঘরে সমরেশদাকে রাখা হল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যুবরাজ অসুস্থ সেজে সেরকম একটা ফাঁকা বাড়ির একতলার ঘরে থাকতে রাজি হবেন কেন? দু' চারদিনের মধ্যেই তিনি ফিরে গেলেন পার্ক সার্কাসে তাঁর নিজের লেখার টেবিলে।

যাঁর হৃদয় ছড়িয়ে আছে গোটা বাংলা দেশে তথা সারা পৃথিবীতে, তিনি সামান্য হৃদ্‌রোগে কাতর হবেন কেন? এরকমই সবাই ভেবেছিল। অচিরেই দেখা গেল, সমরেশ রোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর লেখায় সামান্য মালিন্যও দেখা গেল না। জীবনযাপনে উদ্দামতা কিছুমাত্র কমল না। শুধু সিগারেট ছেড়ে দেবার প্রচেষ্টায় তিনি প্রথম প্রথম আস্ত সিগারেট দু' টুকরো করে খেতেন, তারপর বিড়ি ধরলেন, তারপর তাও ছেড়ে অন্যের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে এক-দু' টান দিতেন। দার্জিলিঙে আরেকবার অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তিনি ধূমপান একেবারেই ত্যাগ করেন। এইসব সময়েই তিনি লিখে যাচ্ছেন 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'মহাকাশের রথের ঘোড়া' ও 'টানা-পোড়েন'-এর মতন উপন্যাস।

আশির দশকের গোড়ার দিকে আমরা বুধসন্ধ্যা নামে একটি ক্লাবের পত্তন করি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আড্ডা, হাসিঠাট্টা, গল্প-কবিতা পাঠ, পানাহার, প্রকাশ্যে পরচর্চা এবং সামান্য কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন। আমরা নাটক অভিনয়ের চ্যারিটি শো করে কোনও কোনও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। এই সংস্থার সভাপতি সাগরময় ঘোষ, সহ-সভাপতি সুবিনয় রায় এবং সমরেশ বসু সাগ্রহে হলেন কার্যকরী সমিতির সদস্য। আমাদের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। নাটকের অভিনয়ের চেয়েও দীর্ঘকালীন মহড়া অনেক বেশি উপভোগ্য, আমরা মহড়াই দিয়েছিলাম প্রায় এক বছর ধরে, সমরেশ নিয়েছিলেন মন্ত্রীর ভূমিকা, নিজের গরজে নিয়মিত আসতেন, বড় সুন্দর কেটেছিল সেই মহড়ার দিনগুলি। যাই হোক, শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রসদনে দু' রাত্তির অভিনয় হয়েছিল সেই নাটকের। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে সাগরময় ঘোষ যখন মঞ্চে সংলাপ বলছেন সেই সময় অন্তরাল থেকে অত্যুৎসাহী একজন নির্ধারিত সময়ের আগেই আগুন! আগুন! বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সাগরময় ঘোষ তা শুনে সংলাপ বানিয়ে দিলেন, এ কী, এ সময়ে তো আগুন লাগার কথা নয়, কী হল দেখি তো, বলে স্মার্টলি বেরিয়ে এলেন। নাটকের মূল চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীবেশী বুদ্ধদেব গুহ চমৎকার গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন এবং মন্ত্রীবেশী সমরেশ বসু পার্ট ভুলে গিয়ে তিনপাতা ডিঙিয়ে সংলাপ বলে বিপদে ফেলে দিলেন তাঁর সহ-অভিনেতা জয়ন্ত সেনকে। দ্বিতীয় রাতে এসব কিছুই হয়নি, সবই একেবারে নিখুঁত। কিন্তু যাঁরা দু'বারের অনুষ্ঠানই দেখেছিলেন, তাঁদের মতে প্রথম রাতের সব কিছু মিলিয়েই অভিনয় হয়েছিল অনেক বেশি উপভোগ্য।

মঞ্চ-অভিনয়ের সহজাত গুণ ছিল সমরেশ বসুর। তাঁর প্রতিভা যে-কোনও দিকেই বিকশিত হতে পারত। বুধসন্ধ্যার পরবর্তী নাটকগুলিতেও তাঁর অংশ নেবার ইচ্ছে ছিল খুবই, কিন্তু তাঁর শরীর তাঁর মনোবলের সঙ্গে আর তাল দিতে পারছিল না।

আমরা যখন বুধসন্ধ্যার নাটক নিয়ে হইচই করছি, সেই সময়েই তিনি তৈরি হচ্ছেন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের জীবন নিয়ে একটা কিছু লেখার জন্য। প্রথমে ঠিক করেছিলেন জীবনী লিখবেন। রামকিঙ্কর তখনও জীবিত, তাঁর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎকার হচ্ছে সমরেশ বসুর। রামকিঙ্করের জীবিতকালেই লেখাটি প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু তখন স্বয়ং লেখকেরই স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং তিনি বেশ খানিকটা না লিখে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য দেবার সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি লিখে চলেছেন, এরই মধ্যে রচনার নায়কের আকস্মিক মৃত্যু। পি জি হাসপাতালের গেটে রামকিঙ্করের মৃতদেহ যখন বার করা হচ্ছে, তখন সমরেশ বসুকে যেন ভেঙে পড়তে দেখেছি। এ যেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির এক চিরন্তন সম্পর্কের ট্র্যাজেডি। রামকিঙ্করের এরকম সকৌতুক প্রস্থানে সমরেশ যেন প্রচণ্ড অভিমান বোধ করেছিলেন।

তার পরেই ঠিক হয়, তিনি রামকিঙ্করের বস্তুনিষ্ঠ জীবনী রচনার বদলে তাঁর জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করবেন।

'দেশ' পত্রিকায় 'দেখি নাই ফিরে' ছাপা হতে শুরু করে '৮৬ সাল থেকে, তারও বছর দু'-এক আগে তিনি ওই রচনার ছ'খানা ইনস্টলমেন্ট আমাকে পড়তে দেন। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, তিনি সমরেশ বসু, প্রথম থেকেই তাঁর রচনা প্রেসে পাঠানো হয়, আমরা ছাপা হবার পর পড়ি। কিন্তু রামকিঙ্কর নিয়ে লেখার সময় তিনি অসম্ভব খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছিলেন, প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং শারীরিক অনিশ্চয়তার কারণে প্রায়ই বলতেন, প্রত্যেক সপ্তাহে লিখে দেবার সাহস আর আমি করি না। আগে অনেকখানি লিখে নিতে চাই। নতুন বিষয় নিয়ে লিখেছেন বলেই হয়তো তিনি প্রথম কিছুটা অংশ আমাকে পড়িয়ে মতামত চেয়েছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন ক্লাসিকাল স্টাইলে। একেবারে রামকিঙ্কর বেইজের জন্মবৃত্তান্ত থেকে। আমি আশা করেছিলাম, এই রচনা শুরু হবে রামকিঙ্করের যৌবন থেকে, যখন তাঁর শিল্প-জীবনের শুরু। যখন থেকে তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ জাগে। এর আগের অংশ নিছক তথ্যের খাতিরে কোনও এক জায়গায় ফ্ল্যাশব্যাকে বলে নিলেই হল।

নতুন দাঁত ওঠা শিশু যেমন সবকিছু কামড়াতে যায়, তেমনি হঠাৎ কোনও ভাল বই পড়লে আমার কাছাকাছি সকলকে জানাতে ইচ্ছে করে। এরই মধ্যে আমি বিদেশ থেকে একটি বই নিয়ে আসি, যেটি অগুস্ত রদ্যাঁর জীবনী-উপন্যাস, নাম, 'নেকেড কেম আই'। খুবই নাটকীয় ও শিল্প-সমন্বিত সেই রচনা। একদিন আমার বাড়ির সান্ধ্য আড্ডায় আমি সাড়ম্বরে সেই বইটির আলোচনা শুরু করি। তখনও রদ্যাঁর কিছু ব্রোঞ্জ কাস্টিং-এর প্রদর্শনী হয়নি কলকাতায়, অনেকেই রদ্যাঁর শিল্পকীর্তি এবং ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে খুব বেশি অবহিত নন। কিন্তু সমরেশ বসু যেহেতু ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর ভাস্করকে নিয়ে লিখছেন, তিনি রদ্যাঁ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন নিশ্চিত, শুধু ওই জীবনী-উপন্যাসটি দেখেননি। তিনি বইখানি আমার কাছে ধার চেয়েছিলেন। তারপর ওই বই ও সমরেশ বসুর প্রস্তাবিত উপন্যাস নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। অন্য অনেকের সঙ্গেই তিনি এই উপন্যাস নিয়ে আলোচনা

করেছেন এবং আরম্ভের অংশটি বারবার নতুন করে লিখেছেন।

তিনি ব্যস্ত লেখক, 'দেখি নাই ফিরে'-র প্রস্তুতিপর্ব এবং রচনার সময়েও তিনি অন্য অনেক উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের দেশে তো এমনটি হবার উপায় নেই যে একজন বড় লেখক শুধু একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখা নিয়েই কয়েকটি বছর নিমগ্ন থাকবেন, তাঁকে আরও অনেক কিছু লিখতেই হবে। রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে সমরেশ বসু সেই কারণেই দেরি করে লিখতে শুরু করেছেন নিশ্চিত। সেইজন্যই এ-আফশোস কিছুতে যাবার নয় যে, যে উপন্যাসের মালমাশলা সংগ্রহের জন্য তিনি এত পরিশ্রম করলেন, রামকিঙ্করের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে তিনি ছুটে বেরিয়েছেন অসম-মণিপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত বারংবার, যে রচনাটি হতে পারত তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, সেটি তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না।

তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়ে সকালবেলা প্রাতরাশের সঙ্গে তাঁকে ছ'সাত রকম ওষুধ খেতে দেখেছি একসঙ্গে। অত ওষুধ দেখে আমাদের চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম! তখন হৃদ্‌রোগের চেয়েও তাঁর শ্বাসকষ্টই প্রবল। শ্বাসকষ্টের জন্য যাঁকে অতগুলি ট্যাবলেট খেতে হয়, তাঁর পক্ষে তো পাহাড়ি ঠাণ্ডার জায়গায় যাওয়াই উচিত নয়। কিন্তু শরীরে অসুখ রইলেও তিনি অসুস্থ হয়ে থাকতে চাননি কিছুতেই। সব ব্যাপারেই তাঁর অদম্য উৎসাহ। সেবারের সেই দার্জিলিং-এর অনুষ্ঠানটির খানিকটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। বছর তিনেক আগে দার্জিলিং শহরের দেড় শো বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি উৎসব হয়, কলকাতা থেকে একদল সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বাঙালি ও নেপালি লেখক-শিল্পীদের একসঙ্গে অনুষ্ঠান করার কথা। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, দার্জিলিং-এর নেপালি লেখকদের একজনকেও আমরা চিনি না, তাঁরাও আমাদের কারুর সম্পর্কে কিছু জানেন বলে মনে হল না। একই পশ্চিমবাংলার মধ্যে থেকেও পরস্পরের মধ্যে এতখানি দূরত্ব! সেই অনুষ্ঠানে সমরেশ বসু নেপালি ভাষাকে অষ্টম তপসিলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মত প্রকাশ করলেন, পরদিন দার্জিলিং-এর নেপালি ভাষার পত্রিকায় তাঁর সেই বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। এত করেও অবশ্য নেপালিদের মন পাওয়া যায়নি, পরে শুনেছি, দার্জিলিং-এর উৎসবে বাঙালি লেখক-শিল্পীদের আহ্বান করা হয়েছিল বলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান হয়েছে, যদিও সুভাষ ঘিসিং-এর নাম তখন একবারও শোনা যায়নি। তারপর থেকে এ পর্যন্ত দার্জিলিং-এ বাঙালিদের আর কোনও প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হতে পারেনি বোধহয়।

ষাট বছরে পা দিয়ে তিনি প্রথম বিদেশে যান, সোভিয়েত ইউনিয়নে, তাও মাত্র সাত দিনের জন্য, একটা বড় দলের সঙ্গে।' ৮৬ সালে যান ইউরোপ। পশ্চিম জার্মানি, পশ্চিম বার্লিন, পূর্ব বার্লিন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমার গোপনে খুব কষ্ট হত, তাঁর মনের জোর ও শারীরিক অক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখে। তাঁর উৎসাহ প্রচুর, সবকিছুই তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে চান, কিন্তু একটু হাঁটাহাঁটি করলেই তাঁর হাঁপ ধরে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই শ্বাসকষ্ট বাড়ে। ইওরোপের শহরগুলিতে ঠাণ্ডাও এড়ানো

যায় না। না হেঁটেও কিছু দেখা যায় না। যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠত তাঁর দুই ভুরুর মাঝখানে, এক এক সময়ে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি শান্ত গলায় বলতেন, আবার আসতে হবে, শরীরটা একটু সারিয়ে নিই, রামকিঙ্করের ওপর লেখাটা শেষ করে নিই, তারপর আবার আসব, সব ভাল করে দেখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশাবাদী, সম্ভবত শেষ নিশ্বাস ফেলার আগের মুহূর্তেও তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

সমরেশ ছিলেন আসক্ত, রসিক, আবার উদাসীন, সন্ন্যাসীও

বেশ রাতের দিকে আমরা কয়েকজন তাঁকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে গেছি, তখন লাস্ট ট্রেন সদ্য ছেড়ে দিয়েছে। সমরেশ বসু একটা ছুট লাগালেন, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। তারপর ট্রেনটার সমান্তরালভাবে ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়ার আগে একবার আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কাল দেখা হবে।

এই দৃশ্যটাই মনে পড়ছে বারবার। সুপুরুষ। যৌবনবন্ত, তেজস্বী একজন লেখক, যিনি প্রায় প্রতিদিনই মফস্বল থেকে কলকাতা জয় করতে আসেন। তখন থাকতেন নৈহাটিতে। কলকাতায় তাঁকে দেখা যেত কলেজ স্ট্রিটে, কোনও কোনও পত্র-পত্রিকার দফতরে, বিভিন্ন আড্ডায়। পোশাকের শৌখিনতা ছিল তাঁর, ধুতি-পাঞ্জাবি যখন পরতেন, তখন ধুতিটি কোঁচানো, পাঞ্জাবিটি গিলে করা, প্যান্ট-শার্ট বা স্যুট যখন পরতেন, তখন তাও নিখুঁত, বিশিষ্ট। তবে যে কোনও ভিড়ের মধ্যে তাঁকে যে আলাদাভাবে চোখে পড়ত, তার কারণ তাঁর সুন্দর চেহারা বা পোশাকের চাকচিক্য নয়, তাঁর মুখের হাসিটি। আদাব, উরাতিয়া, অকাল বসন্ত, পাড়ি'র মতন গল্প তিনি লিখে চলেছেন অনায়াসে। বি টি রোডের ধারে, শ্রীমতী কাফে'র মতন উপন্যাস, ধারালো ঝকঝকে ভাষা, গভীর জীবনবোধ, কিন্তু তাঁর ব্যবহার দেখলে মনেই হয় না, সাহিত্য রচনার জন্য দাঁতে দাঁত কামড়ে তাঁকে কোনওরকম সাধনা করতে হয়। তাঁর জীবনযাত্রার মতন সব কিছুই সাবলীল। যদিও আমরা জানতাম, অল্প বয়েসে তাঁকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে, এমনকী বস্তিতেও থাকতে হয়েছে এক সময়। ছোটখাটো কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেছেন কোনওক্রমে। কিন্তু আমাদের কাছে সেই সব গল্প বলতেন হাসতে হাসতে, যেন সব কিছুই মজার ব্যাপার।

অন্যান্য রচনার মধ্যে হঠাৎ 'গঙ্গা' উপন্যাসটি লিখে সাড়া জাগিয়ে দিলেন তিনি। সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের লেখা। আমরা শুনেছিলুম, তাঁকে একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে সাতদিনের মধ্যে লেখানো হয়েছিল। এটা সত্যি কি মিথ্যে তা জানি না। কিন্তু সমরেশ বসুর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এই ব্যাপারে ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া যায়, ঝড়ের গতিতে কোনও লেখা শেষ করছেন। সেই লেখাই কালোত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রচণ্ড বোমাটি ফাটান 'বিবর' উপন্যাস লিখে। বাংলা ভাষায় আর কোনও বই নিয়ে এত উত্তেজনা, বিতর্ক, পাড়ায় পাড়ায় মিটিং, মামলা-মোকদ্দমা হয়নি। বিবর-প্রজাপতি পাতক-স্বীকারোক্তি, এই চারখানা উপন্যাসে ঝলসে উঠলেন যেন আর একজন সমরেশ বসু। এও যেন ডস্টয়েভস্কির 'লাঞ্ছিত ও আহত' যৌবনকে প্রতিশোধ নেবার জন্য ফিরে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করার

প্রয়াস। এই উপন্যাস চতুষ্টয়ের সমসাময়িক সামাজিক সত্য চিত্রণের দিকে অনেকেই দৃষ্টি দেয়নি। খামোখা অশ্লীলতার অকিঞ্চিৎকর অভিযোগ তুলে হইচই করেছিলেন। কিন্তু এ সবের মধ্যে অশ্লীলতা কোথায়? বাংলায় ও সব কেউ লেখে না। 'বিবর' উপন্যাসের কাহিনী আমাকে তেমন আকৃষ্ট করেনি, আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম এর ভাষা-ব্যবহারে। যে ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে না যান, তিনি একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য। গ্রাম ও মফস্বল নিয়েই প্রধানত লেখেন যে সমরেশ বসু, তিনি নাগরিক জীবনের হতাশা নিয়ে লিখতে গিয়ে প্রয়োগ করলেন সম্পূর্ণ অন্য ভাষা।

অবশ্য একই কলমে একেবারে আলাদা রকমের ভাষার খেলা তিনি আগেই দেখিয়েছেন কালকূট নামের অনবদ্য লেখাগুলিতে। না জানলে বিশ্বাসই করা শক্ত যে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' ও 'বি টি রোডের ধারে'র লেখক একই ব্যক্তি। কালকূট যেন সংসারে এক সন্ন্যাসী। যখন তখন ভ্রাম্যমাণ। সমরেশ বসু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং আসক্ত, কালকূট রসে-বশে রসিক, উদাসীন। 'কোথায় পাবো তারে' নামের সুদীর্ঘ রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়, তিনি এক একটা গ্রাম্য আখড়ার কথা লিখছেন আর আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে সে জায়গাটা দেখতে গেছি। কোনও কোনও জায়গায় তাঁর বর্ণনার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মেলেনি। ফিরে এসে তা নিয়ে অনুযোগ করলে তিনি বাউলদের ধরনের রহস্যময় হাসি দিয়ে বলেছিলেন, ঠিক সময়টাতে যাওনি গো বাবু; চোখের দেখা আর মনের দেখা মিলাতে হয় গো! কথাটি ঠিক, নদীর মতন, আকাশের মতন, মানুষের মতন, এক একটা বিশেষ স্থানও সব সময় একরকম থাকে না।

লাস্ট ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, কাল দেখা হবে। এই ছবিটাই আবার ফিরে আসছে। একটু একটু করে বয়েস বেড়েছে বটে, কিন্তু মানুষটি যৌবনেরই প্রতিমূর্তি। বছর দশ-এগারো আগে তিনি প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু কাটিয়ে উঠলেন সহজেই। যেন অসুখ বিসুখ তো হবেই। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারটা কী? লেখায় সামান্য ভাটা পড়েনি। সার্কাস রেঞ্জের ফ্ল্যাটটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন শুধু লেখার জন্য। প্রত্যেকদিন সকালবেলা চলে যেতেন সেখানে। দুপুরের খাবার আসত বাড়ি থেকে। একা বসে বসে তিনি লিখে যাচ্ছেন। প্রায়ই গর্ব করে তিনি বলতেন, 'আমি প্রত্যেকদিন ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত লিখি। লেখাটাই আমার কাজ। তিনি সাহেব-ঘেঁষা ছিলেন না। বিদেশেও বেশি যাননি, কিন্তু এই কথাটা অবিকল সার্থক সাহেব লেখকদের মতন। আমাদের দেশে এখনও অনেকে সাহিত্য রচনাটা শৌখিনতা বলে ধরে নেয়। কিংবা পবিত্র কর্তব্য কিংবা আদর্শের বিলাসিতা। কিন্তু সমরেশ বসু ছিলেন পুরোপুরি লেখক। অল্প বয়েসে রাজনীতি করেছেন, জেল খেটেছেন, কিন্তু একবার সাহিত্য জীবনে ঢুকে পড়ার পর তিনি সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাননি। অন্য কোনও জীবিকাও গ্রহণ করেননি। পরিণত বয়েসে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়তো কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখেন, কিন্তু প্রথম দু'তিনটে দশক শুধু বাংলা ভাষায় লিখে সংসার চালানোর চেষ্টা

যে কী দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসের কাজ, তা কে না জানে! এবং তাঁর সংসারটিও নেহাত ছোট ছিল না।

প্রথমবার হৃদ্‌রোগের পর তিনি লেখা তো থামানই নি, বরং 'মহাকালের রথের ঘোড়া' কিংবা 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'র মতন বলিষ্ঠ লেখায় হাত দিয়েছেন। মনের জোরে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন শারীরিক বাধা। মনে পড়ে, বছর দেড়েক আগে আমরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম জার্মানিতে। পশ্চিম বার্লিন থেকে দেওয়াল পেরিয়ে আমরা এসেছি পূর্ব বার্লিনে, সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হেঁটে হেঁটেই দেখতে হয়। আমাদের পক্ষে গাড়ি জোগাড় করার কোনও উপায় ছিল না। সমরেশ বসুর তখন ঠাণ্ডা সহ্য হচ্ছে না। শরীরটা বেশ দুর্বল, তবু সব কিছু দেখার জন্য তাঁর অদম্য উৎসাহ। রাস্তার ধারের বেঞ্চে একটুখানি বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন, তারপরই বলছেন, চলো চলো, আরও অনেক কিছু বাকি।

রামকিঙ্করের জীবনী নিয়ে কী পরিশ্রম যে করেছেন, তা তো পাঁচ সাত বছর ধরেই দেখছি। কোনও তথ্যই বাদ দিতে চান না। রামকিঙ্করের সমসাময়িক যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করার জন্য তিনি শুধু শান্তিনিকেতন নয়, অসম, দিল্লি, বোম্বাই, বরোদায় কতবার যে ছুটেছেন তার ঠিক নেই। জগদ্দল, যুগ যুগ জীয়ে, ত্রিধারার মতন বৃহদাকার উপন্যাস তিনি আগেও লিখেছেন বটে, কিন্তু 'দেখি নাই ফিরে' হবে তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেরও একটি দিকদর্শক গ্রন্থ, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম।

ভাস্কর রামকিঙ্করকে বিষয় হিসেবে বেছে নেবার অনেক কারণ ছিল তো বটেই, তবে প্রধান কারণ বোধহয় ছবি সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা। তিনি নিজেও যে ছবি আঁকতেন, তা বোধহয় অনেকেরই জানা নেই। তাঁর আঁকা গৌরী বসুর ছবি আমি দেখেছি। তিনি গানও গাইতেন চমৎকার। বিশেষত টপ্পা অঙ্গের প্রাচীন বাংলা গান তাঁর গলায় শুনেছি অনেকবার। অভিনয় ক্ষমতা এবং অভিনয়ে উৎসাহ ছিল প্রচুর। আমাদের ক্লাব বুধসন্ধ্যার তিনি শুধু সভাপতি ছিলেন না, অভিনয়ের মহড়া দিয়েছেন নিয়মিত। মুক্তধারায় তিনি মন্ত্রীর অভিনয় করেছেন দু'বার রবীন্দ্রসদনে। একবার অবশ্য একটু পার্ট ভুলে গিয়ে মাথা চুলকেছিলেন। পরের বার সেই পার্ট নিখুঁতভাবে মুখস্থ করেছেন মনোযোগী ছাত্রের মতন। 'প্রাণের প্রহরী' নাটকে এক ডাক্তারের ভূমিকা নেবার কথা ছিল তাঁর। নির্ধারিত অভিনয়ের আগে তিনি আর একবার অসুস্থ হন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি তাতে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্রায়ই বলতেন, আবার ওই নাটকটা স্টেজে করো। ওই ডঃ দেবের ভূমিকা নীরেনদার বদলে আমিই করব। সেই নাটকের এক জায়গায় ডঃ দেবের একবার চড় মারার কথা আমাকে। সমরেশ বসু বলতেন, দাঁড়াও না, স্টেজে ওই সময় সুনীলকে আমি এমন একখানা চড় কষাবো।

সমরেশ বসু আমার কাছে কি শুধু একালের প্রধান লেখক? তিনি আমার গুরু-বন্ধু-দাদা সব মিলিয়ে অনেক কিছু। যখন তখন তাঁর বাড়িতে গেছি। টুনির হাতের রান্না খেয়েছি। উনিও আমার বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন

আড্ডা দিতে। তাঁর উপস্থিতিতে যে-কোনও পরিবেশে সব সময় প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত। আমরা তো প্রকৃতপক্ষে এক পরিবারেরই মানুষ। সেই সমরেশদা এখন নার্সিংহোমে শুয়ে আছেন নিশ্বাস বন্ধ করে। আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনেরা জমায়েত হয়েছে সেখানে। আর আমি খসখস করে লিখে যাচ্ছি? তাও 'দিলেন', 'লিখতেন', 'বলতেন', এইসব অতীত ক্রিয়াপদ দিয়ে। সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে মানুষ কি এরকম হৃদয়হীন হয়ে যায়?

শক্তির সঙ্গে একটি দিন

সকাল সাড়ে দশটা আন্দাজ কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। শান্তিনিকেতনের বাড়িতে আমি তখন কাগজ-কলম খুলে বসেছি, দোতলার ঘরে। কেউ দেখা করতে এলে একতলা থেকে ডাকে কিংবা খবর পাঠায়, এই ডাক দ্বিতীয়বার শুনেই চিনতে পেরেছি শক্তির কণ্ঠস্বর, সে সরাসরি ওপরে উঠে আসছে। ঘরে ঢুকে শক্তি বলল, এ কী, আজই লেখাপড়া শুরু করে দিয়েছ?

কলম বন্ধ করতে করতে আমি বললাম, কী করি বলো, যাবজ্জীবন দণ্ডিত আসামির মতন অবস্থা যে!

শুক্রবার ছিল দোল-উৎসব, শনিবারেও অনেক অতিথি ও বন্ধুসমাগম ছিল, লেখাপড়া করার সময় পাইনি, কিন্তু আমার ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি লেখার চাপ, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে একটি পরিচ্ছেদ জমা দিতে হবেই, সুতরাং যদিও রবিবার আমার না-লেখার দিন, তবু জোর করেই নিজেকে বসাতে হয়েছিল লেখার টেবিলে।

শক্তি এসে পড়লে আর লেখালেখির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

শক্তি বলল, চলো চলো, উঠে পড়ো, আজ তোমার এখানে কেউ নেই দেখছি, নিরিবিলিতে পাওয়া গেছে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কাজের কথা।

আমাদের এখানে সপুত্র মুনমুন-সৌমিত্র মিত্র অতিথি ছিল, তারা কলকাতায় ফিরে গেছে গতকাল। প্রতিবেশী গীতা-পার্থসারথি চৌধুরীরাও চলে গেছে ভোরবেলা। বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে যারা এসেছিল, তারা অনেকেই ফিরেছে। আজ সকালে আমার বাড়িতে কেউ আসেনি, কারুর আসার কথাও নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শক্তি বলল, কাল সন্ধেবেলা বাড়ি ছিলে? কাল খুব তোমার এখানে আসার ইচ্ছে ছিল, শর্বরীর বাড়িতে একটা গানের অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকে টুক করে চলে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু গান অনেকক্ষণ চলল, এত দেরি হয়ে গেল, মীনাক্ষী আসতে চাইল না। আজ ভোরবেলা মীনাক্ষী ফিরে গেল কলকাতায়, তারপর দু' চারটে ছেলেমেয়ে এসেছিল কথা বলতে, এক সময় ওদের থামিয়ে আমি একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে—

একতলার বারান্দাটাই আড্ডার পক্ষে প্রশস্ত। কিছু সবুজ গাছগাছালি দেখা যায়। ডানপাশটায় দিগন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত, একটা ছোট পুকুরে হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করছে, শীত চলে গেলেও হু-হু বাতাসে তেমন আঁচ নেই। পাশাপাশি দুটি বেতের চেয়ারে বসা গেল। শক্তি একটা নস্যি রঙের পাঞ্জাবি পরে এসেছে, আমার গায়ে শুধু গেঞ্জি।

শক্তি বেশ উৎফুল্লভাবে বলল, এত নিরিবিলিতে তোমাকে আর স্বাতীকে পাব ভাবিইনি, এরকম তো পাওয়াই যায় না।

এই ক'দিনে শক্তির সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, ইন্দ্রনাথের বইয়ের দোকানে, রাস্তায়, দোলের উৎসবে, কিন্তু ঠিক আড্ডা হয়নি। এর মধ্যে এক রাতে যোগেন চৌধুরী ও অন্য রাতে সুবোধ রায়ের বাড়িতে গান ও কবিতা পাঠের আসর জমেছিল, সেসব জায়গাতেও আমরা কাছাকাছি বসেছি বটে, কিন্তু ওসবের মধ্যে তো আড্ডা চলে না। তা ছাড়া ওই দু' রাতেই শক্তি মীনাক্ষীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি গেস্ট হাউসে ফিরে গিয়েছিল।

শক্তি চেঁচিয়ে ডাকল, স্বাতী, ও স্বাতী, এখানে এসে বসো—

স্বাতী এসে বলল, চা খাবেন?

শক্তি বলল, না, না, চা-টা নয়, সকালের সব চায়ের কোটা শেষ করে ফেলেছি।

স্বাতী বলল, অন্য কিছু কিন্তু দেওয়া হবে না। মীনাক্ষী চলে গেছে, এখন আমি আপনাকে শাসন করব।

শক্তি বলল, আরে না, না, তুমি বসো না! আজ কাজের কথা বলতে এসেছি। সিরিয়াস কথা।

স্বাতী হেসে ফেলল। শক্তির মুখে কাজের কথায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, আপনি তো এখানকার অধ্যাপক। কেমন লাগছে?

শক্তি জোর দিয়ে বলল, ভাল লাগছে, খুবই ভাল লাগছে। ছেলেমেয়েরা এত ভাল। আমি এখানে বেশ ফুর্তিতে আছি।

আমি বললাম, শুনেছি, তুমি এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতা লেখা শেখাচ্ছ। আরও কিছু পড়াতে হচ্ছে নাকি?

শক্তি বলল, ধেৎ! আবার কী পড়াব? কবিতা পড়া, কবিতা নিয়ে দু' চারটে কথা বলা, এতেই বেশ জমে যায়। আর বেশি কিছু না। আমি কি খুব সিরিয়াস হতে পারি নাকি? হ্যাঁ, সিরিয়াস হচ্ছে শরৎ। সব প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করে এসেছে, বইপত্তর, রোজ সকালে উঠেই কাজে বসে যায়। জানো স্বাতী, শরৎ আর আমি তো পাশাপাশি ঘরে থাকি, তুমি গিয়ে দেখে এসো, শরতের ঘর কেমন সুন্দর গুছনো, সব কিছু ঠিকঠাক, আর আমার ঘর, এলোমেলো, মীনাক্ষী অনেক চেষ্টা করেও গুছোতে পারেনি, কোথায় যে কী থাকে!

স্বাতী বলল, আমি এখানে আসার দিনই পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে আপনার আর শরৎবাবুর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। দু'জনেই ছিলেন না।

শক্তি বলল, হ্যাঁ শুনেছি, পরে খবর পেয়েছি।

আমার দিকে ফিরে বলল, শরৎ খুব বদলে গেছে!

আমি বললাম, আমরা সবাই তো বদলে গেছি। বদলাইনি?

শক্তি বলল, একটু-আধটু, হ্যাঁ, তা তো হবেই। কিন্তু শরৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। অনেক দূরে সরে গেছে।

আমি বললাম, এক একজন এক একদিকে বদলাবে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শক্তি বলল, শরৎ আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এক সময় কত আমোদ-আহ্লাদ হয়েছে, কত জমিয়ে রাখত, ওকে এখনও, মাঝে মাঝে অন্তত, সেইভাবে পেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু শরৎ এখন আড্ডা-হইচই-এর মধ্যে থাকেই না, এড়িয়ে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কী কাজের কথা বলবে বলছিলে?

শক্তি বলল, আরে স্বাতীটা আবার হুট করে কোথায় উঠে চলে গেল? ও মেয়েটা এমন ছটফটে, কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। স্বাতী শুনবে না?

আমি বললাম, স্বাতী পরে শুনবে।

শক্তি বলল, আমি ক'দিন ধরেই ভাবছি, 'কৃত্তিবাস' আবার বার করলে কেমন হয়? বেশ বড় করে, দামামা-জয়ঢাক বাজিয়ে যদি 'কৃত্তিবাস' আবার বেরোয়? শুধু কবিতার কাগজ। তুমি মাঝখানে যে পাঁচমিশেলি মাসিক কৃত্তিবাস করেছিলে, সেরকম না, আগেকার মতন। তুমি আর আমি দু'জনে সম্পাদক, আমি সব ব্যবস্থা করব।

আমি বললাম, 'কৃত্তিবাস' যদি আবার বেরোয়, ভালই তো হয়। তবে তুমি একা সম্পাদক হও, আমি না, আমার সম্পাদক হবার শখ মিটে গেছে, শক্তি। অনেক বছর তো—

শক্তি বলল, না, না, তোমাকেও থাকতে হবে। শক্তি-সুনীল, সুনীল-শক্তি। আমাদের দু'জনের নাম একসঙ্গে থাকলে হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে টানা যাবে। কবিতা নিয়ে আবার একটা উদ্দাম নেত্য শুরু করে দেব।

আমি বললাম, ধেৎ, ওরকম যমজপনার কোনও দরকার নেই। তুমি একাই যথেষ্ট। তুষার কী লিখেছিল মনে আছে?

শক্তি হা-হা করে হেসে উঠল।

অকাল-প্রয়াত কবি তুষার রায়, সরল ও কল্পনা-নিবাসী, ধীমান ও উদাসীন, মৃত্যু-বিলাসী ও রসিকতা-প্রিয় তুষার ছিল আমাদের দু'জনেরই বিশেষ স্নেহভাজন। ছোট্টখাট্টো চেহারা, তুষারকে মনে হত আমাদের চেয়ে অন্তত বছর দশেকের ছোট, যদিও মৃত্যুর পর জানা গিয়েছিল তুষার ছিল ঠিক আমার সমবয়েসি। তুষার মুখে মুখে তাৎক্ষণিক ছড়া বানিয়ে মুগ্ধ করত আমাদের। ময়দানের মুক্ত মেলায় এক পুলিশের প্রতি তুষারের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'পুলিশ, কবিকে দেখে টুপিটা তুই খুলিস!'

শক্তি আর আমার কবিতা একসঙ্গে মিলিয়ে যখন 'যুগলবন্দী' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, তখন তুষার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে বসে ছড়া বানিয়েছিল, 'সুনীল-শক্তি যুগলবন্দী/পয়সা লোটার নতুন ফন্দি।' সে ছড়া শুনে আমরা দু'জনেই হেসেছিলাম খুব। সেই 'যুগলবন্দী'র জন্য আমরা দু' পাঁচ টাকাও পেয়েছিলাম কিনা সন্দেহ!

শক্তি বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি আমার ওপর পুরো ভারটা দিতে চাও—

আমি বললাম, তুমি শরৎকে সঙ্গে নিতে পারো। আমি যখন বিদেশে ছিলাম, তখন শরৎ কিছুদিন 'কৃত্তিবাস' সম্পাদনা করেছে, তা ছাড়া প্রায় আগাগোড়াই 'কৃত্তিবাস' পরিচালনার ব্যাপারে শরৎ অনেকখানি যুক্ত ছিল, ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে—

সিগারেট ধরাবার জন্য একটুখানি সময় নিয়ে শক্তি বলল, শরৎ বোধ হয় আমার

সঙ্গে মিলেমিশে কিছু করতে চাইবে না। বুঝলে না, ঠিক টেম্পারামেন্টের মিল হবে না। শরৎ এমনিতে খুবই ভাল, ও লিখবে, আমি বললে নিশ্চিত সবাই লিখবে, আমি একাই দায়িত্ব নিতে পারব। আমি বিজ্ঞাপন চাইলে কেউ না বলে না। আমি তো বিজ্ঞাপন লাইনের প্রায় সবাইকে চিনি।

শুধু বিজ্ঞাপন লাইন কেন, শক্তির চেনাশুনোর পরিধি বিস্ময়কর। আমি সকলের সঙ্গে সহজ খোলামেলাভাবে মিশতে পারি না, ছেলেবেলার লাজুকতা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি, কারুর সঙ্গে নতুন পরিচয়ের পর আড়ষ্টতা কাটাতে আমার অনেক সময় লাগে, এটা আমার দোষ আমি জানি। শক্তি ঠিক এর বিপরীত। পাঁচ-দশ মিনিট আলাপের পরই সে যে-কারুকে বলতে পারে, তোর বাড়িতে আজকে আমি ভাত খাব! অল্প সময়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার অসাধারণ গুণ আছে ওর চরিত্রে। আর কত লোকের যে নাম মনে রাখতে পারে! আনন্দবাজারে যোগ দেবার পরে বেশ কয়েক বছর আমি সেখানকার কোনও টেলিফোন অপারেটরের নাম জানতাম না। কারণ তাঁদের কখনও চোখে দেখিনি, শুধু গলার আওয়াজ শুনেছি। আর শক্তি ফোন তুলে নম্বর চাইবার আগে অপারেটরের গলা শুনেই বলত, কে, অমুক, কেমন আছ, তোমার ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, আর তোমার মেয়ের জন্ডিস হয়েছিল, এখন ভাল আছে? অর্থাৎ অপারেটরের শুধু নাম নয়, তাঁদের পারিবারিক, এমনকী হাঁড়ির খবর পর্যন্ত শক্তি জানে। সকলের সঙ্গে এমন আপন-আপন ব্যবহারের জন্য শক্তি কবিতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু মানুষের প্রিয়। এমনকী যাদের বাড়িতে অসময়ে উপস্থিত হয়ে শক্তি অনেক উৎপাত করেছে, তারাও শক্তিকে ভালবাসত।

আমি বললাম, বিজ্ঞাপন লাইনে, পুলিশ লাইনে, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের লাইনে তোমাকে কে না চেনে!

শক্তি বলল, আমার হাজার পাঁচেক টাকা মাসে মাসে অন্তত দরকার। রিটায়ার করেছি, বাড়ির খরচ চলে যাবে। কিন্তু আমার নিজস্ব হাতখরচ, এটা সেটা চাই। সৌমিত্রদের 'বিনোদন' নতুন কাগজ, ওদের কাছে তো টাকা চাইতে পারি না। 'কৃত্তিবাস'-এর জন্য ভাল বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, সব খরচ-খরচা মিটিয়ে আমার নিজেরটাও চলে যাবে, কী বলো!

আমি বললাম, তা যেতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়।

শক্তি বলল, অন্য বন্ধুরা, যারা রিটায়ার করেছে, তারা খবরের কাগজে টুকিটাকি গদ্য লিখে কিছু রোজগার করে। সন্দীপন ব্যাটা আগে লিখতেই চাইত না, এখন প্রায়ই তো ওর লেখা দেখি। আমার গদ্য লিখতে ইচ্ছে করে না।

আমি বললাম, আগে তো অনেক লিখেছ। উপন্যাসও কয়েকটা।

শক্তি বলল, হ্যাঁ লিখেছি। এখন আর একদম ইচ্ছে করে না।

শক্তি আনন্দবাজার ও দেশ পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছে, 'অবনী বাড়ি আছো' আর 'দাঁড়াবার জায়গা'। সবসুদ্ধু ওর উপন্যাসের সংখ্যা আট। তার মধ্যে 'হাই সোসাইটি' নামে একটা উপন্যাসের বীভৎস মলাট দেখে আমি পড়িনি। ওটা বোধ হয়

ওর একসময়কার চরম অর্থাভাবে কমার্শিয়াল উপন্যাস লেখার ব্যর্থ চেষ্টা। ওর প্রথম উপন্যাস 'কুয়োতলা'ই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। অল্প বয়েসে পড়ার সেই মুগ্ধতার স্মৃতি আছে। পরে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে দ্বিতীয়বার পড়া হয়নি। ওই উপন্যাসে শক্তি একেবারে দেশি, গ্রাম্য শব্দ চমৎকার ব্যবহার করেছিল, একটা নতুন গদ্য ভাষা হতে পারত, কিন্তু সেদিকে আর গেল না। মাসিক কৃত্তিবাস প্রকাশের সময় একবার শক্তি নিজেই বলেছিল, শারদীয় সংখ্যায় কবিতার বদলে উপন্যাস লিখবে। আধখানা লেখার পর বলেছিল, আর লিখতে ভাল লাগছে না। সেটা সেইরকম অসমাপ্ত অবস্থাতেই ছাপা হয়েছিল।

স্বাতী এই সময় বারান্দায় ফিরে এসে বলল, শক্তি, আপনি দুপুরে এখানেই খেয়ে নেবেন। বোয়াল মাছ খান? সুনীলের খুব প্রিয়। অবশ্য অন্য মাছও আছে।

শক্তি বলল, আমি সব মাছ খাই। বোয়াল চমৎকার। দুপুরবেলা তোমার এখানে খেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে বেশ হত। বিকেলে কবিতা পাঠ আছে, একসঙ্গে যেতাম। কিন্তু না গো, আজ খাব না। আজ ফিরতেই হবে। বাবুই আসবে, গেস্ট হাউসে ও কি একা একা খাবে? মীনাক্ষী চলে গেছে, মেয়ে আসছে। ওরা সর্বক্ষণ এখানে আমাকে কেউ না কেউ পাহারা দেবে। বয়েস হয়েছে তো, এখন আর আমাকে একা রাখতে ওরা ভরসা পায় না।

তারপর দুষ্টুমির ভঙ্গিতে চোখ ছোট করে বলল, তা হলে এবার একটু হয়ে যাক! কী আছে দাও না। আমরা দুই ভাই মিলে একটু চুকচুক করে খাই।

স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বলল, না, না, ওসব হবে না। চা দিতে পারি।

শক্তি বলল, আহা, তুমি তো শোনোনি। এইমাত্র আমরা ঠিক করেছি আবার কৃত্তিবাস বার করব। ফাইনাল হয়ে গেছে। এটা সেলিব্রেট করতে হবে না? সুনীলও খাবে বলেছে।

আমি কৃত্রিম আপত্তিতে বলে উঠলাম, অ্যাই, আমি মোটেই বলিনি, আমি দিনের বেলা খাই না।

মদ্যপান বিষয়ে আমাদের কোনওদিনই লুকোছাপা নেই। খেতে ভাল লাগে, বেশ একটা সাময়িক উত্তেজনা হয়। উঁচু গলায় হাস্য-পরিহাস ও গান-টান গাইতে ইচ্ছে করে, খাব না কেন? এক সময় খুব বাড়াবাড়িই হয়েছে বটে, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কোনওরকম বাছবিচার ছিল না, মৃত্যু-ঝুঁকির রোমাঞ্চও উপভোগ করা গেছে। এখন আর সে-রকমটা নেই। লেখালেখির চাপ খুব বেড়ে যাওয়ায় আমি ঠিক করেছিলাম, দিনের বেলা মদ্য স্পর্শ করব না। নিজেকে এমনই সংযত করেছি যে, কোনও নির্জন ডাকবাংলোতে সম্পূর্ণ একা একা কাটাবার সময়েও আমি সন্ধের পর ঘন ঘন ঘড়ি দেখেছি, বাধা দেবার কেউ নেই, তবু রাত আটটার আগে বোতল খুলিনি। আনন্দবাজারে যোগদানের পর প্রথম প্রথম শক্তি আমাকে দিনের বেলাতেও নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি ও কাকুতি-মিনতি করত, আমি দশবারের মধ্যে অন্তত আটবার ওকে প্রত্যাখ্যান করতে সমর্থ হয়েছি। সম্প্রতি শক্তিও অনেক কমিয়ে দিয়েছে, বছরে দু' তিনদিন ছাড়া তেমন আর পাগলামি করে না। এমনও দেখেছি সম্প্রতি, কোনও

সান্ধ্য আড্ডায় শক্তি আমার আগেই গেলাস উলটে দিয়ে স্বেচ্ছায় বাড়ি ফিরে গেছে। ইদানীং অনেকেই শক্তিকে দেখে মনে করে, এক যাযাবর সন্ন্যাসী ফিরে এসেছে সংসারে।

স্বাতীর সঙ্গে শক্তির প্রায়ই একটা মধুর খুনসুটি চলে। স্বাতী যতই আপত্তি করুক, খুব একটা ব্যক্তিত্ব ওর গলায় ফোটে না। শক্তিও স্বাতীকে নানারকম তোয়াজ করে ও ভুজুং-ভাজুং দিয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক আদায় করে নেয়।

শক্তি আমার দিকে ফিরে বলল, সুনীল, রবিবার কিংবা ছুটির দিনে তো তোমার ওই নিয়মটা খাটে না। আমি জানি না? আজ রবিবার, আমি ঠিক হিসেব করে এসেছি।

নিজের স্ত্রীর কাছে সাধু সাজবার জন্য আমি বললাম, শক্তি যখন এত করে বলছে, দাও একটু। কৃত্তিবাসের ব্যাপারটা তো সেলিব্রেট করা যেতেই পারে। শক্তির সঙ্গে এত নিরিবিলিতেও অনেকদিন বসা হয়নি।

স্বাতী বলল, তা হলে ঠিক দুটো। তার বেশি নয়। তারপর আমি বোতল সরিয়ে নিয়ে যাব।

শক্তি বলল, আড়াই! আধখানা গ্রেস দিও।

ভোদকা ফুরিয়ে গেছে, রামের বোতল এল। শক্তি বেশি খুশি হল, ও রামনিষ্ঠ। কিছুদিন আগে কোনও একটি পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে শক্তি বলেছে, আরও অনেকদিন বাঁচতে চাই, বাঁচব, আরও অনেকদিন রাম খাব।

ঢালাঢালির ভারটা বরাবার শক্তিই নেয়। দু' এক চুমুক দেবার পর হঠাৎ ও বেশ জোর ধমকের ভঙ্গিতে বলল, সুনীল, তুমি এত গদ্য লেখ কেন? আর কত লিখবে? এবার ছাড়ো তো! ওফ্, এত গদ্য, এত গদ্য, এ যে কুলির কাজ!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ছাড়তে তো খুব ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, গদ্য একেবারে ছেড়ে দিয়ে আবার শুধু কবিতাই লিখব! সত্যিই গদ্য লেখা ছেড়ে দেব।

শক্তি বলল, হুঁ, তুমি পারবে? রাশি রাশি গদ্য লেখার পর কেউ আবার কবিতার কাছে ফিরে আসতে পারে?

আমি বললাম, টমাস হার্ডি পেরেছিলেন। 'জুড দ্য অবস্কিওর'-এর পর তিনি আর উপন্যাস লেখেননি, বাকি জীবন শুধু কবিতাই লিখেছেন।

শক্তি বলল, ওসব হার্ডি-ফার্ডি ছাড়ো তো! তুমি পারবে না। তুমি ছাড়তে চাইলেও সম্পাদকরা তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে দিয়ে গদ্য লেখাবেই।

আমি বললাম, অর্থাৎ বলতে চাও, আমি যাবজ্জীবন বন্দি?

শক্তি বলল, আগে আমি অনেককে কী বলতাম জানো? ভাগ্যিস সুনীল গদ্যের দিকে বেশিটা চলে গেছে, ও যদি শুধু কবিতা লিখত, তা হলে ওর সঙ্গে হয়তো আমার রেষারেষি লেগে যেত। এখন আর তা মনে হয় না। এখন কোনও পত্র-পত্রিকায় যখন তোমার কবিতা পড়ি, তোমারটাই পড়ি, তখন খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠি। মনে মনে ভাবি, সুনীল লিখেছে, তা হলে আমাকেও লিখতে হবে। তোমার

কবিতা পড়লে আমার উপকার হয়।

আমি বললাম, সেগুলো এমন কিছু পড়বার মতন হয় না।

শক্তি চুপ করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল দূরের দিকে। আমাদের আড্ডায় সাধারণত সাহিত্য-কবিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় না। শক্তি অনেক লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করে। অন্যরা কেউ সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুললে শক্তি ধমক দেয়। অন্য কারুর মুখের ওপর 'ধ্যার ব্যাটা, তুই কিছু লিখতে পারিস না', এরকম কথা একমাত্র শক্তির পক্ষেই বলা সম্ভব।

শক্তি খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, একটা কথা বলব তোমায়, সত্যি কথা বলব? আজকাল আমার কী যে হয়েছে, কবিতা লিখতেও আলস্য লাগে। মনে হয়, অনেক তো লিখেছি, আর কী হবে? কবিতা লিখতে লিখতে একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এরকম আমার আগে কখনও হয়নি। এখন একটা কবিতা পাঁচ-সাত লাইন লেখার পরই মনে হয়, এই যথেষ্ট হয়েছে, আর লেখার দরকার নেই। অথচ আগে এক একদিনে পাঁচটা সাতটা কবিতা লিখেছি। চাইবাসায় সমীরের ওখানে এক এক দুপুরে পাগলের মতন লিখে গেছি। হিজলিতে মানবের কোয়ার্টারে যখন ছিলাম, সেই যে সেবারে মনে আছে, তুমি ফিরে চলে এলে, মানব সারা দুপুর থাকত না। একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে ফেললাম, 'অবনী বাড়ি আছো', সেটা শেষ করেই 'আমি স্বেচ্ছাচারী', তারপর আরও একটা। অথচ এখন লিখতে ইচ্ছেই করে না। কবিতা লিখতে লিখতে মাঝপথে ঘুম, এরকম আমার জীবনে কখনও হয়নি।

আমি বললাম, এখানে তোমার অনেক সময়, মাঝে মাঝে দেখবে আড্ডা দেবার লোক নেই, তখন লিখতে পারো।

জানলা দিয়ে স্বাতী বলল, শক্তি, শান্তিনিকেতনে এসে দেখছি, আপনার চেহারা আবার ভাল হয়েছে, ভাল দেখাচ্ছে। এখানে বসে বসে অনেক কবিতা লিখে ফেলুন!

শক্তি বলল, হ্যাঁ, এখানে দারুণ ভাল আছি, বুঝলে? এখানে লিখব। আর ওই কবিতার 'কৃত্তিবাস' আবার বার করলে একটা বেশ জোশ আসবে, আবার অনেক মজা হবে। আমার ওইসবও দরকার।

স্বাতী বলল, রোদ বাড়ছে, এবার উঠে পড়ুন। এখানে থেকে যেতে পারলেই ভাল হত।

শক্তি বলল, দাঁড়াও, ওই যে আড়াইয়ের হাফটা এখনও বাকি আছে। থাকার যে উপায় নেই, বাবুই এসে পড়বে দুপুরের ট্রেনে—

স্বাতী বলল, আপনার মেয়েটা কী ভাল হয়েছে। যেমন সুন্দর ব্যবহার, লেখাপড়াতেও এত ভাল!

শক্তি বলল, বাবুই জিওগ্রাফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে জানো তো? ও তো পড়াশুনোতে ভালই, নিজের মনে পড়ে, চিন্তা ছিল তাতারকে নিয়ে। তাতারও হায়ার সেকেন্ডারি ভালভাবে পাস করে গিয়ে আমাদের খুব অবাক করে দিয়েছে। হ্যাঁ গো, আমার ছেলেমেয়ে দুটো ভাল হয়েছে। আগেরবার আমি শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ি

গেছি, তাতার বাজার থেকে চুনো মাছ কিনে এনেছে, জানে যে বাবা চুনো মাছ ভালবাসে, এখানকার গেস্ট হাউসে তো ওসব পাওয়া যায় না, আমি যা যা ভালবাসি, বাড়িতে তাই রান্না করে রেখেছে। তোমাদের ছেলে পুপ্লুও...পুপ্লুকে আমি এত পছন্দ করি...

আমাদের এ পাড়ায় গাড়ি-টাড়ি বিশেষ আসে না। শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাস থেকে অনেক দূরে, বেশির ভাগ সময়ই নির্জন শুনশান, লোকজনও দেখা যায় না প্রায়। হঠাৎ একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কথা থামিয়ে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

এদিক ওদিক ঘুরে-ফিরে গাড়িটা এ বাড়ির গেটের সামনেই থামল।

দেখা গেল, গাড়ি ভর্তি অনেক লোকজন। একজন শুধু নেমে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আছেন?

সেই ব্যক্তিটিকে চিনি, অচিন্ত্য গুপ্ত, একজন প্রকাশক, রশীদের বাড়ির আড্ডায় অনেকবার দেখেছি। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে শক্তি বলল, যাক, আমাকে আর এই রোদ্দুরের মধ্যে হেঁটে গিয়ে সাইকেল রিকশা খুঁজতে হবে না। এদের গাড়িতে ফেরা যাবে।

কাছে এসে অচিন্ত্য বিনীতভাবে বলল, পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে খবর পেলাম শক্তিদা এখানে এসেছেন। শক্তিদা, আমরা টিভি-র জন্য শান্তিনিকেতনের ওপর একটা ডকুমেন্টারি তুলছি, আপনি এখানে পড়াচ্ছেন, আপনারও কয়েকটা শট নেব।

শক্তি উদারভাবে বলল, নিয়ে নাও, এই তো আমি আর সুনীল আছি, আমাদের দু'জনের নিয়ে নাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, ধেৎ! আমার নেবে কেন? শক্তি, তুমি এখানে অধ্যাপক হিসেবে ক্লাস নিতে শুরু করেছ, আমি তো এখনও জয়েন করিনি, এবারে আমি এমনিই বেড়াতে এসেছি।

অচিন্ত্য বলল, হ্যাঁ শক্তিদা, আপনি ক্লাসে পড়াচ্ছেন বা কবিতা পাঠ করছেন, সেই সময়কার ছবি তুলব।

শক্তি বলল, আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু। বিনা পয়সায় আমি আর ছবি-টবি তোলাতে রাজি নই।

টাকার প্রসঙ্গটা একটু আগেও উঠেছিল। হাত-খরচের ব্যাপারটা ওর মাথায় ঘুরছে। আমাকে বলেছিল, এখন কোনও কবি সম্মেলনে ডাকলেই আমি টাকা চাইব। যে-কোনও ফাংশানে গেলেই আমার টাকা চাই। সুনীল, তুমি যেন আবার ব্যাগড়া দিও না।

আমি বলেছিলাম, আমি ব্যাগড়া দিতে যাব কেন! কিছু পেলে তো ভালই।

শক্তি বলেছিল, তোমাকে জানি তো, ভদ্রতা করে বলে বসবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু দিতে হবে না। তুমি চুপ করে থাকবে, যা বলার আমি বলব। দেবে না কেন? গায়ক-টায়কদের টাকা দেয়, আবৃত্তিওয়ালারাও টাকা পায়, কবিরা পাবে না? না দিতে চায় তো যাব না। কেন খামোকা কষ্ট করে গিয়ে কবিতা পড়ব? ওসব আগে

অনেক হয়েছে। এই তো সেদিন হলদিয়া গেলাম, আগেই বলেছি, আমাকে হাজার টাকা দিতে হবে, ওরা দিয়েওছে।

শক্তি আমাকে কয়েক জায়গায় টাকা পাইয়ে দিয়েছে, এ কথাও ঠিক। আমাদের দু'জনের কবিতা পাঠের ক্যাসেট হয়েছে অনেকগুলো। আলাদাভাবেও হয়েছে। ওসব জায়গায় রেকর্ডিং-এর সময় বলে যে, পরে টাকা (রয়ালটিও নয়, সম্মানদক্ষিণা) দেবে, তারপর আর অনেকেরই পাত্তা পাওয়া যায় না, এমনকী ক্যাসেটটাও পাই না। কিন্তু শক্তির সঙ্গে গেলে ও শর্ত করে নেয়, আমার আর সুনীলের টাকাটা আগে দিয়ে দাও, নইলে রেকর্ডিং হবে না।

অচিন্ত্য নিচু গলায় বলল, নিশ্চয়ই সাধ্যমতন দেব।

বেলা হয়ে গেছে, এবার উঠতে হবে। শক্তি হঠাৎ খাবার ঘরে গিয়ে বলল, স্বাতী, তোমার বাড়িতে আজ দুপুরে খাওয়া গেল না, কিন্তু বোয়াল মাছের কথা শুনে লোভ হচ্ছে। শুধু দু' পিস মাছ দাও তো, চট করে খেয়ে যাই।

বিকেলবেলা বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে তিন ভিজিটিং প্রফেসরের কবিতা পাঠের কথা। আমি একটু দেরিতে পৌঁছেছি, ততক্ষণে শরৎ ও শক্তি এসে গেছে। অস্থায়ী উপাচার্য শিশির মুখোপাধ্যায়, রেজিস্ট্রার প্রণবানন্দ যশ, বাংলা বিভাগীয় প্রধান অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা সবাই উপস্থিত। ছোট, ঘরোয়া আসর, ছাত্র-ছাত্রী বা বাইরের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কফি-জলপানের পর শক্তি জিজ্ঞেস করল, শরৎ, তুমি আগে পড়বে? শরৎ বলল, শক্তি, তুমিই শুরু করো।

সঙ্গে সঙ্গে শক্তি একটা বইয়ের মাঝখান খুলে যে কবিতা প্রথম চোখে পড়ল, সেটাই পড়তে লাগল। শক্তির পাঠ শুনতে শুনতে আমার বিস্ময়ও বাড়তে লাগল ক্রমেই। একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছে, এত ভরাট গলায়, এত বিশুদ্ধ স্বরে, এমন নিবিষ্টভাবে আমি বহুদিন শক্তিকে কবিতা পড়তে দেখিনি। ইদানীং ও কবিতা পাঠ সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন হয়ে গিয়েছিল, কোথাও দুটো-তিনটের বেশি পড়তেই চাইত না। কয়েক বছর আগে গৌহাটিতে একটা বড় আসরে শক্তি এমনই অনাচার করেছিল যে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়তেই পারেনি, হাত থেকে খসে পড়েছিল বই। সেদিন শক্তিকে আমি খুব বকুনি দিয়েছিলাম।

আজ এই ছোট ঘরে শক্তি যেন দশ বছর আগেকার বয়েসে ফিরে গেছে, গলায় সেই জোর ও তন্ময়তা। লক্ষ করলাম, দু' একজন অধ্যাপিকার ঠোঁট নড়ছে, অর্থাৎ শক্তির ওই সব কবিতা ওঁদের মুখস্থ। শক্তি কিন্তু খুব চেনা ও জনপ্রিয় কবিতাগুলো পড়ছে না। শক্তির 'অবনী বাড়ি আছো' শুনলে আমার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে, কেননা আমি অন্তত হাজারবার শুনতে বাধ্য হয়েছি, যেমন আমার 'কেউ কথা রাখেনি' শুনলেই শক্তি বলে, ধেৎ, আর পারি না, শুনতে শুনতে কান পচে গেছে।

শক্তি পড়েই চলেছে, অন্তত কুড়িটা কবিতা শেষ হবার পর ওর বন্ধু সত্য সাঁই পাশ থেকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে মৃদু স্বরে বলল, শক্তি, এবার অন্যদের সুযোগ দাও।

যেন একটা ঘোর ভেঙে গেল, শক্তি মুখ তুলে বলল, ও, আচ্ছা, শেষ করছি! 'আনন্দভৈরবী'টা পড়ি?

আমি আপত্তি জানালাম। শক্তিই পড়ুক না, ওর পড়তে ভাল লাগছে, আজ শক্তিরই দিন হোক, আমার এবং শরতের পাঠ না হলেই বা ক্ষতি কী? শক্তির এত সুন্দর পাঠ শুনতে শুনতে আমারও নেশা লেগে যাচ্ছিল। আমাদের প্রত্যেকের কবিতা অবশ্যই আলাদা, কিন্তু একটা যেন যৌথ প্রয়াসেরও ব্যাপার আছে। শক্তির এই সব কবিতা রচনার ইতিহাস জানি, অনেক কবিতা ছাপার আগে শুনেছি কিংবা প্রুফ দেখেছি। কৃত্তিবাসের আমলে আমরা যে-কেউ একটা বিশেষ ভাল কবিতা লিখলে সবাই গর্বিত বোধ করতাম।

আজ শক্তিরই একক আসর হলে ঠিক হত, তা অবশ্য হল না, আমাদের দু'জনকেও পড়তে হল। কফি পানের পর অন্যদের অনুরোধে শুরু হল আর একপ্রস্থ কবিতা পাঠ, শক্তি এবার পড়ল চতুর্দশপদী সংগ্রহ থেকে প্লাতেরো সিরিজ। কিন্তু আগেকার সেই তন্ময়তা আর ফিরে এল না।

সভা ভঙ্গ হতেই শক্তি আমাকে বলল, চলো, একবার গেস্ট হাউসে যাই, বাবুই দুপুরে আসেনি। যদি এর মধ্যে এসে পড়ে?

আমি বললাম, এর পরের ট্রেন বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার, পৌঁছবে সওয়া আটটায়। এখন তো সাতটা বাজে।

শক্তি ব্যস্ত হয়ে বলল, বলা যায় না, যদি লোকাল ট্রেন-ফ্রেন ধরে চলে আসে। একবার দেখে আসি।

হেঁটে যাব না রিকশায় যাব এই নিয়ে আলোচনা করছি, শিশির মুখোপাধ্যায় বললেন, আমার গাড়িটা দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শক্তি বলল, ভালই হল। আমার এখন আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শিশির, তোমার গাড়িটা আমরা কিছুক্ষণ রেখে দেব, খানিক বাদে আমাদের বুলবুলের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

শরৎকুমারকে তখন দেখা গেল না, সে তখন বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখুনি গেস্ট হাউসে ফেরার তাড়া নেই।

বলাই বাহুল্য, বাবুই এখনও এসে পৌঁছয়নি। মীনাক্ষী নিশ্চয়ই ঘরটা গুছিয়ে রেখেছিল, শক্তি এর মধ্যেই যথেষ্ট এলোমেলো করে ফেলতে পেরেছে। ভালই দেখাচ্ছে।

শক্তি বলল, আমার হিসিও পেয়ে গিয়েছিল। ওদের ওখানে সিগারেট-ফিগারেট খাওয়া যায় না। বাথরুম আছে কিনা কে জানে! এখানে কিছুক্ষণ বসে যাই।

আমি বললাম, শক্তি, তুমি শিশির মুখোপাধ্যায়কে তুমি তুমি বলেছিলে। আগের ভাইস চ্যান্সেলার সব্যসাচী ভট্টাচার্যকেও তুমি বলতে, মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তুমি বলে নাম ধরে ডাকো। এই তো কিছুদিন আগেও ভাবতাম, মন্ত্রী, ভাইস চ্যান্সেলার এঁরা সব বিশাল বিশাল লোক, ধরা-ছোঁয়া যায় না, এখন এঁদের নাম ধরে ডাকা, তুমি বলা, আমরা কোথায় পৌঁছলাম! একেবারে বুড়ো হয়ে গেলাম নাকি!

শক্তি অট্টহাস্য করে বলল, আরে শিশির তো বিটুর বন্ধু, আমার অনেকদিনের চেনা। আর বুদ্ধকেও বহুৎ দিন ধরে চিনি, আমাকে শক্তিদা বলে, ওকে নাম ধরে ডাকব না? তুমি মানতে চাও না, কিন্তু আমরা বুড়ো হচ্ছি তো বটেই! একদিন ট্রামে উঠতে যাচ্ছি, আমার মাথার পাকা চুল দেখে একজন আমায় দাদু বলে ডাকল! তোমার অবশ্য চুল অতটা পাকেনি, শুধু জুলপি-পাকা! দাঁড়াও না, আরও তো অনেক বছর বাঁচব, ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টারকেও একদিন কাঁধ চাপড়ে তুমি তুমি করব!

এ সৌভাগ্য অবশ্য আমার হবে না। খুব পরিচিতের সঙ্গেও আমি আপনি থেকে তুমিতে নামতে পারি না। শক্তির সঙ্গে শীর্ষেন্দু-দিব্যেন্দুদের তুই-তুই সম্পর্ক। আমার অনেক সমসাময়িক বন্ধুকেই আমি এখনও আপনি বলি, এটা একটা লজ্জার বিষয়! বয়োজ্যেষ্ঠদেরও চট করে দাদা বলতে পারি না। শক্তি অনেক মেয়েকে মা মা বলে। অপর্ণা সেনকেও 'আয় মা' বলে ডাকে। আমার মুখ দিয়ে মা, মাসি-পিসি, বোনটি ধরনের সম্বোধন জীবনে বেরুবে না।

শক্তি বলল, রাম খাবে? আমার কাছে একটা ছোট বোতল আছে, তাও অর্ধেকটা।

আমি বললাম, না, শক্তি, এখন আর আমি রাম খাব না।

শক্তি তবু বলল, এসো না। একটু একটু করে—

আমি প্রবলভাবে মাথা নাড়লাম।

শক্তি আর পেড়াপিড়ি করল না। কিন্তু অস্থিরভাবে বলল, তা হলে এখন কী করি? বুলবুলের বাড়িতে যাওয়ার তো দেরি আছে।

তারপরেই গান ধরল:

ভেবেছিলেম ঘরে রবো, কোথাও যাবো না
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি...
মারিলো মরি আমায়...

এটা শক্তির প্রিয় গান। পুরোটা গাইল না। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, এই গেস্ট হাউসটা এমনিতে খারাপ না, চলে যাচ্ছে, কিন্তু একটা জিনিস দ্যাখো, ঘরের সঙ্গে কোনও বারান্দা নেই। শুধু একটা ঘর। সারাক্ষণ মানুষ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে? রাত্তিরে এসে ঘুমোনো যায়, কিন্তু অন্য সময়, একটা বারান্দা থাকলে দিব্যি বাইরেটা দেখতে দেখতে সময় কাটানো যেত। দোতলার ওপর এতগুলো ঘর বানিয়েছে, অথচ দ্যাখো একটাও বাইরের দিকের বারান্দা নেই।

অভিযোগটা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হল। রতন কুঠির সামনে টানা বারান্দা রয়েছে। সেখানে চেয়ার টেনে বসে দিব্যি আড্ডা দেওয়া যায়। এখানেও প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে একটা করে ছোট বারান্দা অনায়াসেই রাখা যেত। পয়সার অভাব, না কল্পনাশক্তির অভাব?

শক্তি বলল, বেশিক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে থাকলে আমার দমবন্ধ লাগে, ওইজন্যই আমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। কেউ কেউ অবশ্য সারাদিন ঘরে বসে পড়াশুনো করে। আমার ভাল লাগে না।

আমি বললাম, শক্তি, তুমি আজ কী দারুণ কবিতা পড়লে। একেবারে ইনস্পায়ার্ড যাকে বলে। তারপর আমার আর পড়তেই ইচ্ছে করছিল না।

শক্তি মুখ নিচু করে বলল, এক একসময় মনে হয় কী জানো, এই যে এত লিখেছি, তা কি হয়েছে কিছু? এই পদ্যগুলো টিকবে? আবার এক একদিন, যেমন আজকে, পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, মন্দ লিখিনি। কী করে যে লিখেছি নিজেই জানি না, যেন ম্যাজিকের মতন এক একটা শব্দ এসেছে, উন্মাদের মতন লিখে গেছি, আজ নিজের পদ্যগুলোই আমার কাছে নতুন, অচেনা মনে হচ্ছিল, সেইজন্যই পড়ে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা সুনীল, বলো তো, এই যে এখনকার ছেলেরা লিখছে, জয়, জয়দেব। আমরা কি ওদের মতন আর লিখতে পারছি?

আমি বললাম, এখনকার ছেলেরা এবং মেয়েরাও কয়েকজন বেশ ভাল লিখছে। নতুন রকম লিখছে, কিন্তু আমরা ওদের মতন লিখতে যাব কেন? তুমি তোমার মতন লিখবে, আমি আমার মতন লিখব। আমি সাহিত্যজগতে কোনও প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করি না। অল্পবয়েসি কারুর কোনও কবিতা পড়ে যদি মুগ্ধ হই, তখন আমার নিজেরও লেখার ইচ্ছে হয়, অনেক সময় ইচ্ছেটাই হয়, কিন্তু লিখি না, কিংবা লিখলেও সেই লেখার সময় অন্য কারুর কথা তো মনে থাকে না।

শক্তি বলল, তুমি তো গ্যাজারাং গ্যাজারাং করে দিস্তে দিস্তে গদ্য লিখেই চলেছ, অন্যদের লেখা পড়ো কখন?

আমি বললাম, না শক্তি, ও কথা বলো না। তোমায় চেয়ে এখনও আমি ঢের বেশি কবিতা পড়ি, অনেক কিছুই পড়ি, তুমি তো পড়তেই চাও না।

শক্তি হাসতে হাসতে বলল, ওই যে তুমি বললে, আমি আমার মতন, তুমি তোমার মতন। চলো, চলো, এবার উঠে পড়ি।

আমি বললাম, এখনও তো দেরি আছে।

শক্তি আর মানল না, উঠে দাঁড়াল।

আজ রাতে বুলবুলের বাড়িতে চাঁদের আলোয় পিকনিক, সেখানে আমাদের দু'জনেরই নেমন্তন্ন আছে। সমরেশ বসুর বড় মেয়ে বুলবুলকে চিনি প্রায় বাচ্চা বয়েস থেকে, বড্ড ভাল গান গায়। বুলবুল আজ তার বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের নাচ-গানের আয়োজন করেছে, সেইসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া।

গাড়িতে উঠে, পূর্বপল্লী ছাড়াবার পর শক্তি বলল, বাতাসে একটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছ? কী ফুল বলো তো?

একটা ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক চেনা যাচ্ছে না। এই সময় শিমুল আর পলাশই বেশি ফোটে। গাঢ় লাল রঙের ফুলে গন্ধ থাকে না। একটা বাড়িতে বাতাবিলেবু গাছে ফুল ফুটতে দেখেছি, বেশ মিষ্টি গন্ধ। বললাম, বাতাবি ফুল?

শক্তি ঘাড় নেড়ে বলল, নাঃ নাঃ! মহুয়া ফুলের মতন মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, শান্তিনিকেতনে মহুয়া ফুল কোথায় পাবে? এখানে আমি মহুয়া গাছ দেখিনি। অন্য কোনও ফুল হবে।

শক্তি বলল, ক'দিন আগে রামপুরহাট গিয়েছিলাম, বুঝলে। গাড়িতে করে ফেরার সময় রাস্তায় এক জায়গায় মহুয়া ফুলের গন্ধ পেতেই আমি চেঁচিয়ে অর্ডার দিলাম, থামো, থামো, এখানে থামো। ঠিক মহুয়া ফুলের গাছ আছে, কাছেই একটা মহুয়ার দোকান। ফার্স্ট ক্লাস মহুয়া খেলাম। তুমি কতদিন মহুয়া খাওনি?

আমি বললাম, তা অনেকদিন খাইনি বটে। অন্তত বছর পাঁচেক তো হবেই। শেষবার সেই ঝাড়গ্রামে—

শক্তি বলল, মনে আছে, হেসাডিতে, ওফ্, মহুয়ার শ্রাদ্ধ করেছি—

কিছুক্ষণ চলল হেসাডির গল্প ও সন্দীপনের নানান বীরত্ব কাহিনী।

বুলবুলের বাড়ির কাছে গাড়ি থেকে নামবার পর ড্রাইভারটি বিনীতভাবে বললেন, স্যার, উনি ঠিকই বলেছেন, গাড়ির মধ্যে কিছু মহুয়ার ফুল রেখেছি, উনি সেই গন্ধ পেয়েছেন।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, শান্তিনিকেতনে মহুয়া গাছ আছে নাকি?

ড্রাইভার বললেন, হ্যাঁ, আছে কয়েকটা।

শক্তি সগর্বে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে, দেখলে, আমার ভুল হয় না। তুমি কিস্যু গন্ধ চেনো না। কোথায় বাতাবির ফুল, কোথায় মহুয়া।

বুলবুলের বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল, তখনও কিছু শুরু হয়নি, উদ্যোগ-আয়োজন কিছু বাকি আছে। বুলবুল বলল, আপনারা বরং বুলাদার বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসুন, আমি ডেকে পাঠাব।

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হেঁটে যেতে হবে। অবশ্য বুলাদার বাড়ি বেশি দূর নয়, একটি ছেলেকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেওয়া হল।

একটুখানি গিয়েই শক্তি বলল, ধোৎ! আজকাল আর হাঁটতে একদম ভাল লাগে না।

দোতলার ওপর অপেক্ষা করছিলেন বুলাদা আর মন্টুদা। এই দু'জনকেই ডাকনামে সবাই চেনে। পোশাকি নাম অনেকে জানেই না। বুলাদার গায়ের রং ফরসা, মাথার চুল সাদা, দেখলে মনে হয় টুকটুকে পাকা ফলের মতন বুড়ো, আসলে অত্যন্ত তারুণ্যময় মানুষ। আর মন্টুদার বয়েস সত্তরের কাছাকাছি হলেও শান্তিনিকেতনের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। দু'জনেই ভাল গান গাইতে পারেন, যে কোনও আড্ডার আসর জমিয়ে দেন।

দোতলায় উঠে এসে শক্তি বলল, এইটুকু হেঁটেই হাঁপিয়ে গেলাম কেন? বুকে যেন চাপ লাগছে।

বুলাদা বললেন, গ্যাস হয়েছে নাকি? অ্যান্টাসিড খাবে?

শক্তি বলল, নাঃ, আমার ওসব কিছু হয় না। হার্ট-ফার্ট সব ভাল আছে। এখন ঠিক হয়ে গেছি।

বুলাদা তবু কয়েকটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট এনে দিলেন, শক্তি খেল না, পকেটে রেখে দিল।

বুলাদা এবং মন্টুদা দু'জনেই শক্তিকে খুব ভালবাসেন। মন্টুদা বললেন, শক্তি

একটা টিভি টিম তোমাকে নিয়ে শুটিং করবে নাকি শুনলুম। তুমি শান্তিনিকেতনে যতদিন থাকবে, আমাকে তোমার লোকাল গার্জেন করে দাও। টাকা-পয়সার ব্যাপার-স্যাপার সব আমি সামলাব। তুমি তো আপনভোলা, ওসব পারবে না।

বুলাদা বললেন, আমি হব মণ্টুর অ্যাসিস্ট্যান্ট—

শক্তি খুব হাসতে লাগল। একটু পরে বারান্দার সেই আড্ডায় এসে যোগ দিলেন বুলাদার স্ত্রী এবং স্বাতী। মাঝে মাঝে গান ও হাস্যপরিহাস। বুলবুলের দূত এসে বারবার তাড়া দিচ্ছে, তবু আমাদের আড্ডা ভাঙে না।

বুলবুলের বাড়িতে যখন ফিরে এলাম, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের নাচগানের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে। সামনে শতরঞ্চি পাতা, পেছনে আমাদের জন্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে। আকাশে বসন্তের চাঁদ ঠিকঠাক আলো দিচ্ছে। এই সময়কার বাতাস বড় মধুময়।

শক্তি চেয়ারে বসল না। ও নাচ-টাচ বিশেষ পছন্দ করে না কোনওদিনই। ওর নেশা রবীন্দ্রসংগীতে। সুকণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত ও মন্ত্রমুগ্ধের মতন শোনে। বাঙালিদের নাচে আমারও অবশ্য আগ্রহ নেই, এবং ইদানীং বহুশ্রুত রবীন্দ্রসংগীতগুলিতেও আর রস পাই না। যে-সব গান খুব কম গাওয়া হয়, কিংবা রাগ-নির্ভর, বরং সেগুলি ভাল লাগে। তবে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা যাই-ই করুক, তাদের মুখে যে তীব্রতা ফুটে ওঠে, সেটা দেখে মুগ্ধ হই।

একটি অচেনা যুবকের সঙ্গে শক্তি কথা বলে চলেছে, একসময় ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে? শক্তি বলল, এই ছেলেটি ডাক্তার। দারুণ ছেলে, ওর সঙ্গে আলোচনা করছি, ভাবছি এখানে থাকতে থাকতে একবার সব চেক-আপ করিয়ে নেব। এখানে তো অনেক সময় পাওয়া যাবে। বুলবুল কখন গাইবে?

বুলবুলের একটা বড় গুণ, আজ গাইতে পারব না, গলা ভাল নেই, এই ধরনের কথা কখনও বলে না। আমরা অনুরোধ করলেই গায়। আরও গান হল, তারপর খোলা আকাশের নীচে পাত পেড়ে খেতে বসা হল। এক-একদিন শক্তি রাত্তিরের দিকে কিছু খেতে চায় না, এক-একদিন বেশ চেটেপুটে খায়। আজ ছাত্র-ছাত্রীদের রান্নায় বেশ ভাল স্বাদ হয়েছে, শক্তি বেশ মন দিয়ে খেল সব পদ।

রাত হয়েছে বেশ, ছেলেমেয়েরা বিদায় নিচ্ছে দ্রুত।

বুলাদার বাড়ি কাছেই, মণ্টুদার সাইকেল আছে। স্বাতী একটি চেনা রিকশাওয়ালাকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আমরা সেটাতেই ফিরব। শক্তি যাবে কী করে? এখান থেকে পূর্বপল্লী যথেষ্ট দূর, এ সময় রিকশা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক হল যে, আমাদের রিকশা শক্তিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, ততক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করব।

এই সময় একজন ভদ্রমহিলা, এখানকার কোনও ছাত্রীর মা, আমাকে এসে বললেন, আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, বাঃ, এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। আমাদের পৌঁছে দিতে

হবে না, আমাদের সঙ্গে রিকশা আছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে পূর্বপল্লীতে নামিয়ে দেবেন একটু?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। আমরা ওইদিকেই যাব।

শক্তি আমার দিকে ফিরে বলল, আজ দেখা যাচ্ছে আমার গাড়ির ভাগ্য খুব ভাল।

তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি আর স্বাতী কাল সকালেই ফিরে যাবে?

আমি বললাম, ফিরতেই হবে, উপায় নেই।

শক্তি বলল, দিন সাতেক বাদে আমিও একবার কলকাতায় যাচ্ছি। তখন কৃত্তিবাসের ব্যাপারটা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলতে হবে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, এই পঁচিশে বৈশাখ থেকেই—। সুনীল, দেখো, আমি এমন কাগজ করব যে, আবার একটা তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে।

মারুতি ভ্যানে উঠে শক্তি জানলা দিয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়ল।

শক্তির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

এরপর চতুর্থ দিন সকাল ছ'টার একটু পরে, তখনও আমার ঘুম ভাঙেনি, স্বাতীই টেলিফোনের শব্দে জেগে উঠে দুঃসংবাদটি আগে শোনে। স্বাতীর অবিশ্বাস ও প্রায় দমবন্ধ করা গলার আওয়াজ শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসি।

আমার ধারণা, আমি কঠিন ধরনের মানুষ। সবরকম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সবকিছু সহ্য করতে পারি। কিন্তু শক্তি আর নেই শুনেই আমার মাথাটা ঘুরতে থাকে, হয়তো একটুক্ষণের জন্য আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল।

সে যাই হোক। অনেকদিন পর ওই উনিশে মার্চ শক্তির সঙ্গে আমি প্রায় সারা দিন কাটিয়েছি, সেই স্মৃতিটাই আমি হুবহু রেখে দিতে চাই।

টিলার ওপর থেকে শক্তিকে ডানা মেলে উড়তে দেখেছি

এই তো কিছুক্ষণ আগে শক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে বিকেল পৌনে চারটেয় ফিরে এল শক্তি, শক্তির সঙ্গে দেখা হল না। ট্রেন থেকে নিজে নামল না শক্তি, তাকে নামানো হল, সে আর শক্তি নয়, শক্তির শরীর।

এক পলকের বেশি তার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। শক্তি আর নেই? এই সব ব্যাপারে আমি খুব দুর্বল। ভোর ছ'টায় যখন টেলিফোনে খবরটা প্রথম শুনি, তখন আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, এ যেন আমারই মৃত্যু-শেলের মতন। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কথা হত, আমি আগে চলে গেলে শক্তি আমার অবিচুয়ারি দু'চার ছত্র লিখতে বাধ্য হবে, আর ও চলে গেলে আমি। শক্তি হাসতে হাসতে বলত, আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশি দিন বাঁচব, বুঝলে! মনে মনে আমি জানতাম, সেটাই স্বাভাবিক, আমারই আগে যাওয়ার কথা। হঠাৎ শক্তি এ কী ভেল্‌কি দেখাল?

শক্তি সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে, কিন্তু আজই? সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে এ রকম দায়িত্ব কখনও কখনও নিতেই হয়। ভাবছি কী লিখব, কোথা থেকে শুরু করব, মাঝে মাঝে চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। প্রায় বেয়াল্লিশ বছর আগে, ধুতির ওপরে শার্ট পরা সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ বয়েসে পরিচয়, তারপর থেকে সুখে-দুঃখে একসঙ্গে বহু ঘোরাঘুরিই তো হল। তার কতটা লেখা যায়? এই তো সে-দিন, মাত্র তিন দিন আগে শান্তিনিকেতনেই ওর সঙ্গে কাটালাম সকাল থেকে সারা দিন, মধ্য রাত্র পর্যন্ত। স্বাস্থ্য বেশ চমৎকার, অনেক ব্যাপারে টগবগে উৎসাহ, প্রথমেই আমাকে বলল, তোমার সঙ্গে বিশেষ কাজের কথা আছে। শক্তির সঙ্গে কাজের কথা? আমার কৌতুক উড়িয়ে নিয়ে সে বলল, এসো, আমরা আবার 'কৃত্তিবাস' বার করি। এখন একটাও ভাল কবিতা-পত্রিকা নেই।

এই 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সূত্রেই শক্তির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে উদীয়মান কবি ও গল্পকারদের আলাদা আলাদা টেবিল। এক-একটা টেবিল আবার এক-একটি লিটল ম্যাগাজিনের কার্যালয়ও বটে। শক্তি তখন বসত গদ্য লেখকদের টেবিলে, স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার এই ছদ্মনামে টুকিটাকি গদ্য লিখে, 'কুয়োতলা' নামে একটি উপন্যাসও মকশো করেছে, কবিতার ধারেকাছে নেই। ক্রমশ দেখা গেল, কবিরাই দলে ভারী, তাদের উদ্দীপনা বেশি। একদিন গুটিগুটি পায়ে শক্তি এসে বসল আমাদের টেবিলে। গাল ভর্তি দাড়ি, সিগারেটের বদলে বিড়ি খায়, সেটাই ছিল শৌখিনতা। কিন্তু কৃত্তিবাসের দলে যোগ দিতে গেলে তো যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। ঠিক প্রথম কবিতাটিতে নয়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কবিতাতেই শক্তি চমকপ্রদ

প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। অচিরে বোঝা গেল, শক্তি বাংলা কবিতায় একটি বড় আসন দখল করতে এসেছে।

সেই 'কৃত্তিবাস' আবার এতকাল বাদে প্রকাশিত হবে শক্তির সম্পাদনায়, এ প্রস্তাবে আমিও উত্তেজিত। এই উপলক্ষে সেলিব্রেট করা যায়।

সদ্য ষাট পেরিয়েছে শক্তি, এর অনেক আগেই তার মৃত্যু ঘটে যেতে পারত। অনেকবার নিজের জীবন নিয়ে দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে শক্তি। একটা বয়েস পর্যন্ত মৃত্যু নিয়ে বেশ ছেলেখেলা করা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি বয়েস পর্যন্ত শক্তি সেই খেলা খেলেছে। রাত্তিরবেলা অন্ধকার গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে সে, লাফ দিয়ে আগুন পার হয়েছে, লুটোপুটি খেয়েছে ধুলোয়। কবিতা তার জীবন যাপনের অঙ্গ। গানের গলা বেশ ভাল, শক্তির অন্যতম প্রিয় গান, 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান'। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভালবেসেছে, ভয় পেয়েছে, স্নেহ দিয়েছে, আবার কখনও কখনও সে দারুণ অসংসারী, তার বুকের মধ্যে ছটফট করত একটা ঈগল পাখি। হ্যাঁ, টিলার ওপর থেকে আমি ডানা মেলে উড়তে দেখেছি শক্তিকে, ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে গেছে, আবার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে রক্তাক্তও হয়েছে। এক বন্ধুকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিতে গিয়ে শক্তি নিজেও ট্রেনে চেপে বসল একবার, তারপর নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল। কয়েক মাস পরে আমি আর সন্দীপন ওকে খুঁজতে গেলাম চাইবাসায়। এখন মনে হয় যেন গল্পের মতন। শক্তির এ ধরনের আচরণকে অনেকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে বকুনি দিয়েছে। কিন্তু ওই কয়েক মাসে শক্তি যে কবিতাগুলি লিখেছে, তা যে-কোনও সাহিত্যে অমর হয়ে থাকার যোগ্য। সাবধানী, একঘেয়ে সংসারী, নিরাপদ, নির্বিঘ্নজীবন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্য নয়, মানুষ তো জীবনে বিভিন্ন রকম পরিপূর্ণতা খোঁজে, কবিতার মধ্যে ডুবে থাকাই শক্তির পরিপূর্ণতা।

পরিণত বয়েসে বিদেশ ঘুরে এসে শক্তি প্রায়ই বলত, এখন আমার খুব বাঁচতে ইচ্ছে হয়। যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব? এই কিন্তুটা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলতে শুরু করেছিল, না, এখন যাব না, কিছুতেই যাব না। যখন সে এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখনই হঠাৎ এ কী হয়ে গেল আজ ভোরে?

ভেবেছিলাম কিছুই লিখতে পারব না, তবু এই তো অনেকটা লেখা হয়ে গেল। মাঝে মাঝে অতীত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ফেলেছি? শক্তি এখনও শুয়ে আছে বরফ ঘরে, কিন্তু সে শক্তি নয়, শক্তি-হীন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেহ...

শক্তি নেই?

শক্তির কবিতা

আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে শক্তি বলেছে যে, কবিতা লেখার ব্যাপারে ও আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়! শক্তির আমাকে ভয় পাবার তো কোনও কারণ নেই। একমাত্র আমাকেই বা কেন? এ কথাটা ও ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে। ওর মধ্যে এক এক সময়, নানা ধরনের ঝোঁক জুড়ে বসে—আমার সম্বন্ধে ওই কথাটিও এক ধরনের ঝোঁক মাত্র।

তা ছাড়া, কবিতা লেখাটা তো প্রতিযোগিতা নয়। এখানে কেউ ফার্স্ট হয় না, সেকেন্ড হয় না। একজন কবি সারাজীবন লেখার পরে তার মূল্যায়ন হয়। জীবিত অবস্থায় কোনও কবি কারও থেকে বড় নয়, ছোট নয়। প্রত্যেকেই আলাদা। একসময় শক্তি ও আমাকে 'কৃত্তিবাস-গোষ্ঠী'র বলে চিহ্নিত করা হয়। আসলে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সেইসব হইহই দিনগুলো, কবিতা পাঠ, একসঙ্গে ঘোরাফেরা এসবের জন্যই গোষ্ঠী কথাটি চলে এসেছে। কিন্তু কবিতা লেখার ক্ষেত্রে শক্তি ও আমি সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের দু'জনের স্বভাবেও অনেক অমিল, তবু কোথাও একটা নিবিড় যোগসূত্রও আছে বোধহয়।

শক্তি যেভাবে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করে, সেরকমভাবে আর কেউ পারে না। একেবারে ম্যাজিকের মতো শব্দ ব্যবহার। শক্তিকে বলা উচিত শব্দের প্রভু। আমার কবিতা অনেক সময়েই বিষয় নির্ভর, শক্তির কবিতা প্রধানত ধ্বনি নির্ভর। প্রত্যেকটি শব্দ অন্য একটি শব্দের পাশে তার চরিত্র বদলে ফেলে, ধ্বনিত এই মায়া জগতে শক্তি নিমজ্জিত। এই জন্যই ওর কবিতা আমার খুব প্রিয়।

প্রত্যেক কবির কাছেই কোনও বিশেষ শব্দ বা বিষয় প্রিয় হয়ে ওঠে। শক্তির কবিতায় পাথর শব্দটি প্রচুর এসেছে। আসছেও। তবু ওর কবিতায় শব্দটি কখনও পৌনঃপুনিকতা-দুষ্ট নয়। পাথরকেও নানাভাবে কবিতায় ব্যবহার করেছে। এরকম আরও কিছু কিছু বিশেষ শব্দকে ও ইচ্ছেমতন ঘোরায় ফেরায়।

মনে আছে, 'সুবর্ণরেখার জন্ম' নামে শক্তি একটি কবিতা লিখে আমাকে পড়িয়েছিল—একেবারে আমাদের প্রথম লেখালেখির সময়ে, কবিতাটি ভাল লাগে, কৃত্তিবাসে ছাপাই। একেবারে গোড়ার দিকে শক্তি গল্প উপন্যাস লিখত, তারপর আসে কবিতার জগতে। ওর প্রথম দিকের কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব ছিল অল্প বিস্তর। ওর 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি' পড়ে আমি ওকে সে কথা বলেছিলুম। অবশ্য সে সময় জীবনানন্দ আমাদের অনেককেই আচ্ছন্ন করেছিলেন। ক্রমে শক্তি একেবারে নিজস্ব স্টাইল ও নিজস্ব শব্দে কবিতাকে নিবিড় করে ধরে ফেলে।

শক্তির কবিতায় আর একটা আশ্চর্য গুণ হল বক্তব্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে

শক্তি কাব্যসুষমা নির্মাণের ব্যাপারেই বেশি নিমগ্ন, তবু শক্তির কবিতায় নরম সরম কাব্য কাব্য ভাব নেই, ওর প্রত্যেকটি কবিতাই জোরাল। প্রতিটি লাইনে ঝকঝকে ধার। কোনও কবিতাতেই বাহুল্য নেই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান বাঁধ। স্বভাব কবির মতন শক্তি লিখতেও পারে অজস্র, আমাদের অল্প বয়েসে শক্তি এক একদিনে পাঁচ-সাতটা কবিতা লিখেছে, কিন্তু ওর কোনও কবিতাই দুর্বল নয়, শব্দ ব্যবহারে কোথাও ভুল নেই। এতগুলো বছর ধরে শক্তি ওর জীবনটাকেই মিশিয়ে দিয়েছে কবিতার মধ্যে।

ওর জীবন যাপনের অতর্কিত অভ্যাসের মতোই কবিতার মধ্যে নতুন বাক্যবন্ধের আকস্মিক ব্যবহার পাঠক হিসেবে আমাকেও চমকে দেয়। শক্তির বেশ কয়েকটি কবিতা পড়ে আমার মনে হয়েছে, আহা, আমি যদি এরকম লিখতে পারতুম!

খেলাচ্ছলে দিনগুলি

শক্তির প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে আমরা অনেকেই ফিরে যাই আমাদের প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। নানা দুরন্তপনার কথাই বেশি মনে পড়ে। শক্তি আপাদমস্তক কবি, কিন্তু তার কবিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় না, তার জীবনের রোমহর্ষক ঘটনাবলীর কথাই এসে পড়ে অনবরত। অবশ্য কবিতা সম্পর্কে ভাল লাগা—মন্দ লাগা ছাড়া আর কীই বা বেশি বলা যায়। সমসাময়িক বা সমবয়েসি কবি-লেখকদের পারস্পরিক রচনার বিশ্লেষণ করার রেওয়াজ নেই। অল্প বয়েসে আমরা নিজেদের সকলের লেখা যেমন মন দিয়ে পড়তাম, বিনা দ্বিধায় পরিষ্কার মতামত জানাতে দ্বিধা করতাম না, এখন আর তা সম্ভব নয়। সহজে অন্যের রচনার বিষয়ে মুখ খুলি না। কেউ কেউ অন্য কারুর লেখা পড়েই দেখে না। জীবন এই ভাবেই বদলায়।

বুদ্ধদেব বসু এক জায়গায় বলেছিলেন যে, সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়েসে ছুটির দুপুর কাটাবার জন্য অলস ভাবে যে কিছু কিছু কবিতা লিখেছি, পরবর্তী কালে পণ্ডিত-গবেষকরা যে সেই সব কবিতা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তা কে জানত! শক্তিও মাঝে মাঝেই বলত, ভাগ্যিস কবিতা লিখেছিলুম, তাই তো এত কাণ্ড হল। মন-মন কাজে এমনিই তো কবিতা লিখতে শুরু করেছিলুম, ভবিষ্যতে কী হবে, কিছুই তো ভাবিনি!

সত্যিই তাই, শুরু হয়েছিল প্রায় খেলাচ্ছলে। অনেকে যখন বলে, কবিতা লিখতে হয় বুকের রক্ত দিয়ে, কিংবা কবিতা লিখে সমাজটা বদলে দিতে হবে কিংবা কবিতা লিখে যেন সাত পুরুষকে ধন্য করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমার গোপনে হাসি পায়। আমরা তো সে রকম কিছুই ভাবিনি। আমরা শুরু করেছিলাম, প্রায় বলতে গেলে, বন্ধুত্বের টানে। অন্তরালে কোনও কোনও নারী ছিল হয়তো, কিন্তু প্রথম দিকে তা খুবই গোপন। এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধুতি আর শার্ট পরা কুড়ি-বাইশ বছরের শক্তি, মুখে দাড়ি, ঘন ঘন বিড়ি খায়, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে অন্য একটা দলের সঙ্গে বসে থাকে, কীসব গদ্য-টদ্য লেখে। আমরা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশের পর শক্তির টেবিল বদলাল, একদিন লাজুক মুখে একটা চতুর্দশপদী লিখে এনে শোনাল।

আরও দেখতে পাচ্ছি দেশবন্ধু পার্কের আড্ডা, খুবই পবিত্র ও সুকুমার দশ-বারোটি ছোকরা, নেশা বলতে শুধু সিগারেট টানা, আর কোনও কোনওদিন অন্ধকার গাঢ় হলে জামা-কাপড় খুলে, উদোম হয়ে ওই পার্কের পুকুরে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে নেওয়া। কারুরই বাড়িতে আলাদা কোনও বৈঠকখানা ছিল না, তাই দেশবন্ধু পার্কের আড্ডায় বিকেলের আলো ম্লান হবার আগে কেউ কেউ পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ বার করে একটা-দুটো কবিতা পড়ে শোনাত। যেদিন আমার কবিতা

নেই, সেদিন অন্যদের কবিতা শুনতে শুনতে মনে হত, আজই বাড়ি ফিরে রাত্রে কিছু একটা লিখে ফেলতেই হবে। একজনের কবিতা আর একজনকে প্রেরণা দেয়, যদিও দু' জনের কাব্যভাষা একেবারে আলাদা।

ঘরোয়া আড্ডায় কবিতা পড়ার সময় শক্তি বরাবরই লাজুক ছিল। আমরা সবাই তাই। যা লিখছি তা সত্যিকারের কবিতা হয়ে উঠছে কিনা তা নিয়ে সংশয়। এখন যখন মাঝে মাঝে শুনি, কেউ কেউ নিজের মুখেই বলে, আমি একটা দারুণ কবিতা লিখেছি, কিংবা আমার এই লেখাটা একেবারে নতুন ধরনের, তখন অবাক হই। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ এই ধরনের কথা বললে তাকে নির্ঘাত গণ-চাঁটি খেতে হত। শক্তি একই দিনে দু-তিনটে কবিতা লিখে আনত। ও প্রথমে কেন গদ্যের দিকে গিয়েছিল জানি না, শক্তির ভেতরে অনেক কবিতা জমে ছিল, কাব্য-আঙ্গিকও তৈরি হয়ে গিয়েছিল আগেই, সে জন্য শক্তিকে হাত মকশো করতে হয়নি, অনর্গল চমৎকার কবিতা লিখে গেছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের প্রথম দিকে অনেক দুর্বল কবিতা আছে, কিন্তু শক্তির সে রকম দুর্বল কবিতা একটাও নেই।

কবিতা লেখার সঙ্গে পাঠক-আকর্ষণ করার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। একজন নতুন কবির রচনা অন্যান্য কবিদের কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। খেলাচ্ছলে শুরু করা এই যে আমাদের কবিতা, কৃত্তিবাস এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় তার দাপাদাপি দেখে অগ্রবর্তী কবিরা বেশ যেন বিচলিত বোধ করেছিলেন। তাতে আমরা বেশ মজা পেয়েছিলাম। শক্তি সেই মজাটাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যায়। স্যাকসবি ফারমার না ওই ধরনের কী যেন একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিল শক্তি, ধার করা প্যান্ট-কোট পরে অফিস যাওয়া-আসা শুরু করেছিল সবেমাত্র, একদিন সে সেই পোশাক খুলে ফেলে বলল, দূর ছাই। আমাদের মধ্যে শক্তিই প্রথম বা একমাত্র যে পোশাক খুলেছে। ঠিকই করে ফেলল, কবিতাই লিখবে শুধু, আর কিছু না।

এত বড় ঝুঁকি আর কেউ নেয়নি, এ এক সাংঘাতিক জুয়া খেলা। নিজের জীবনটাকেই শক্তি বাজি ফেলল। যদি দৈবাৎ কোনও দুর্ঘটনায় ওর কলম শুকিয়ে যেত, তা হলে ওর স্থান হত কোথায়? আত্মকেন্দ্রিকতার চরমে পৌঁছতে হয়েছিল ওকে, মা-ভাই-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু-পরিজনের কথাও কখনও কখনও মুছে ফেলতে হয়েছিল মন থেকে। এ জন্য শক্তিকে অনেক উঞ্ছবৃত্তিও করতে হয়েছে, কিন্তু সব পরাজয়ের প্রতিশোধ খুঁজেছে কবিতায়। পাহাড়ের ভয়ংকর খাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে শক্তি, যে কোনও মুহূর্তে মরণ-ঝাঁপ দিতে পারত, কিন্তু সে উঁচু দিকেই গেছে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে বটে, তবু নেমে আসেনি, সেইখানেই তার জয়। পেছনে ফেরার রাস্তাই সে ভুলে গিয়েছিল।

'কমলা-কাঞ্চনে ভরা মোঙ্গল বাজার
স্বপ্নের ভিতরে, পথে অসংখ্য হোঁচট খায় চাঁদ
রাত্রিবেলা
পেছনে যাবার রাস্তা নেই...'

শক্তিকে আমি কখনও ঈর্ষা করিনি। ঈর্ষা প্রবৃত্তিটাই বোধহয় আমার মধ্যে খুব কম। সে জন্যও অনেকে রাগ করে। একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া, খ্যাতি-ফ্যাতির মতন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঈর্ষা করা আমার মতে ছোটলোকি ব্যাপার। নারী-ঘটিত কারণে শক্তির সঙ্গে আমার কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, শক্তির আবার ওই প্রবৃত্তিটা কম। শক্তির কবিতার স্টাইল আমার প্রথম থেকেই খুব পছন্দ, যদিও আমি নিজে সে রকম লিখি না। 'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম', এ রকম লাইন আমি লিখেছি, কিন্তু নিজের কাছে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি, অন্য দিকে চলে গেছি। ওই লাইনটি বরং শক্তির ক্ষেত্রে সত্য। ভয়ংকর খাদের কিনারা ধরে হেঁটে যাওয়া, আমিও দু-একবার গেছি অবশ্য, কিন্তু শক্তির মতন অত দীর্ঘদিন ধরে আমার সাধ্য ছিল না। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শক্তি মাঝে মাঝে দুম করে যে স্বর্গীয় পাগলামি নিয়ে আসে, তা আমার আয়ত্তের বাইরে। শক্তি এমন কিছু কিছু জিনিস পারে, যা আমি পারি না। অবশ্য, আমিও এমন দুটো-একটা ব্যাপার পারি, যা শক্তি পারবে না।

বেশ কয়েকটা বছর একসঙ্গে চলার পর আমি বুঝে গিয়েছিলাম, শক্তির পাশাপাশি আমি অনবরত পাহাড়ে চড়তে পারব না, আমাকে কিছুদিন মরুভূমির ভেতর দিয়ে যেতে হবে, রাশি রাশি বালি সরিয়ে খুঁজতে হবে জল। আমি সরে গেছি, নিজের কাছে এই হার মানা স্বীকার করে নিয়েছি, সুতরাং ঈর্ষার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অনেকেই একসঙ্গে শক্তি-সুনীল বা সুনীল-শক্তি নাম দুটি উচ্চারণ করে, শুধু শক্তি আর আমার কবিতা নিয়ে এক সময়ে বেরিয়েছিল 'যুগলবন্দী', পরে বেরিয়েছে 'সুন্দর রহস্যময়'। কিন্তু গদ্যের জগতে আমাকে এত দাপাদাপি করতে হয়েছে যে, কবিতার কাছে আমি সম্পূর্ণ হৃদয় সমর্পণ করতে পারিনি, আর শক্তি গদ্য থেকে একেবারেই সরে গিয়ে কবিতাকেই করেছে হৃদয়েশ্বরী। দূর থেকে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি শক্তির বিপজ্জনক আরোহণ, শক্তি পেরে যাচ্ছে দেখে আমার শিহরন হয়েছে।

মাঝে মাঝে মরণ ঝাঁপ দেবার জন্য ভয় দেখিয়ে শক্তির খলখল হাসি, ওঃ তা কি ভোলা যায় কখনও? যেন সে আমার দিকেই তাকিয়ে হেসেছে। আমি হাত তুলে ব্যাকুল ভাবে বলেছি, না, না, ঝাঁপিয়ো না শক্তি, অন্যদিকে ফেরো। তোমার না পারাটা আমারও ব্যর্থতা।

শক্তির প্রতি ভালবাসা আমার বরাবরই আছে। মনে হয়, শক্তিও তা জানে। শুধু একটাই ভুল হয়ে গেল। শক্তি বরাবরই বলত, ও আমার থেকে বেশি দিন বাঁচবে, আমিও তা মেনে নিয়েছিলাম। সেটা কি শুধু কবিতায় বেঁচে থাকা, শারীরিক ভাবেও নয়? এটা একেবারেই ঠিক হল না।

যদি

দে গরুর গা ধুইয়ে।

আমি একেবারে সর্বাঙ্গে চমকে উঠলাম। প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে কবি গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে স্বাভাবিক চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'এ কী—এত মালা-টালা দিয়ে এমন জবরজং করে সাজিয়েছ কেন আমায়? কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমায় বলি দেবে নাকি? এত বেলা হল, চা-টাও দেয়নি, খিদে পেয়ে গেছে। কালী কুল দে মা, নুন দিয়ে খাই। ওরে, চা-টা দিবি নাকি?'

আমার তখন আনন্দবিস্ময়ে চূড়ান্ত অবস্থা।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এইমাত্র জ্ঞান ফিরে সুস্থ হয়ে উঠলেন, আমারই চোখের সামনে। তাঁর চোখে-মুখে আগেকার সেই বিখ্যাত তেজ ও উজ্জ্বলতা। সারা দেশের লোককে এ সুসংবাদ আমিই প্রথম জানাব, এই আনন্দে আমারই তখন উন্মাদ হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কবির জ্ঞান ফিরে আসবার পর প্রথম ইন্টারভিউ ছাপাবার কৃতিত্বও আমার।

কবি এখন হাসিমুখে গলা থেকে ফুলের মালাগুলো খুলে ফেলেছেন এবং গুন্‌গুন করে গান করছেন—'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল'—সেই ভরাট প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর। আমি পকেট থেকে খাতা-পেন্সিল বার করছিলুম, তিনি আমাকে এই প্রথম লক্ষ করে ধমকে বললেন, 'এই ছোঁড়া, তুমি এখানে কী করছ? অ্যাঁ?'

আমি থতমত খেয়ে বললুম, 'কিছু না, মানে, আপনার একটা অটোগ্রাফ নিতে এসেছি, আর যদি দু' লাইন কবিতা লিখে দেন।'

'এখন হবে না, যাও ভাগো। অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেল, আবার কবিতা...হবে না, অটোগ্রাফ নেবে তো মেয়েরা, তোমার দরকার কী হে? এখন সময় নেই।'

আমি তবু চুপ করে বসে রইলুম। নজরুল আপন মনেই বললেন, 'ইস, এত দেরি হয়ে গেল! নেপেনকে নিয়ে পণ্ডিচেরি যাবার কথা ছিল, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করব—'

আমি ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। চেন নাকি?'

'আজ্ঞে চিনি। কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। শ্রীঅরবিন্দও—'

'অ্যাঁ, নৃপেন বেঁচে নেই? কী বলো? কবে মরল? আমি তখন কোথায় ছিলাম?'

কবির গলায় অসহায় আর্তনাদ ফুটে উঠল। মানুষকে দুঃখের খবর শোনাবার

অভ্যেস আমারও নেই। আমিও খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। তবু মৃদুস্বরে বললুম, 'আপনি একটানা অনেকদিন ঘুমিয়ে ছিলেন। অনেকদিন। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—'

'হয়েছে? গেছে সাহেব ব্যাটারা? কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙেছে? সত্যি? তা হলে তো ফুর্তি করতে হয় একটু আজ। পণ্ডিচেরি থাক, তা হলে আজ অচিন্ত্য আর প্রেমেনকে ডেকে একবার ঢাকা ঘুরে আসি। ওখানে বুদ্ধদেব আছে—'

আমি বললাম, 'বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়েছেন বহুদিন। তা ছাড়া পাকিস্তান—'

'পাকিস্তান? ইকবালের সেই পাকিস্তান? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। জিন্না-গান্ধীজীর ঝগড়া আজও মেটেনি?'

'ঝগড়া মিটেছে কিনা জানি না, তবে ওঁরা কেউই আর ইহলোকে নেই।'

'নেই? তবে পাকিস্তান কীজন্য?'

'পাকিস্তান ওঁরা বেঁচে থাকতেই হয়ে গেছে। পূর্বে বাংলা পশ্চিমে পাঞ্জাব আর সিন্ধু নিয়ে পাকিস্তান হয়েছে অনেকদিন আগে। গত বছর ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধও হয়ে গেল।'

'যুদ্ধ হয়ে গেল মানে? পূর্ব-বাংলার সঙ্গে পশ্চিম-বাংলা যুদ্ধ করবে? চালাকি পেয়েছ? তুমি কে হে ছোকরা? সত্যি করে বলো তো, ব্রিটিশের স্পাই নও তো?'

আমি বিষণ্ণ হেসে বললুম, 'পূর্ব-বাংলার সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি যুদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু এটা এখন একটা আলাদা দেশ। ওখানকার সঙ্গে এখানকার যাতায়াত বন্ধ। এখানকার বই ওরা পড়তে পায় না, ওদের বইও আমরা পাই না।'

'এরা আর ওরা? তুমি এখান থেকে ভাগো তো। যত সব মিথ্যে কথা শোনাতে এসেছ। আমি আজকের ট্রেনেই ঢাকা যাব, দেখি কে আমায় আটকায়! আমি, জসীমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, প্রেমেন, শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, ওখান থেকে অজিত, পরিমল, মোহিতলালকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব, দেখি কে কী করে। তুমি এখন সরে পড়।' আমি বললুম, 'আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ করছেন, কিন্তু কথাগুলো সত্যি। আপনি যে ট্রেনে চাপবেন, সে-রকম সরাসরি কোনও ট্রেনই চলে না আজকাল আর। ওদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ সত্যিই একেবারে বন্ধ। আর যাঁদের নাম করছেন, তাঁরা অনেকেই দেশ বদলেছেন। অবশ্য আপনি যদি যেতে চান, তা হলে দুই সরকারের মধ্যে লেখালেখি করে আপনার জন্য একটা কোনও বন্দোবস্ত...।'

কবি এবার খানিকটা হতাশ চোখে তাকালেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতদিন সত্যিই ঘুমিয়ে ছিলুম। তুমি শুধু আমায় খারাপ খবর শোনাচ্ছ। ভাল খবর কিছু নেই?'

আমি চিন্তিতভাবে বললুম, 'ভাল খবর? হ্যাঁ, মানে, এই তো দুর্গাপুরে বিরাট ইস্পাত কারখানা হয়েছে, কলকাতায় অনেক বড় বড় বাড়ি উঠেছে—'

তাকিয়ে দেখি কবি আবার অবসন্নভাবে হেলান দিয়ে কীসব বিড়বিড় করতে-করতে হাত দিয়ে ফুলগুলো ছিঁড়ছেন।